নবজীবন।

পঞ্চম ভাগ।

শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র সরকার কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

[illegible]ই বৎসরের লেখকগণের নাম।

শ্রীযুক্ত অ[illegible]ত্ত।
,, ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
,, উমেশচ[illegible]।
,, কু[illegible] দে।
,, [illegible] রায়।
,, [illegible] মজুমদার।
৺ কানাইলাল [illegible]ত্র।
শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন দ[illegible]।
,, গগণচন্দ্র হোম।
৺ গঙ্গাচরণ সরকার।
শ্রীযুক্ত গিরিজাপ্রসন্ন রায় চৌধুরী।
,, গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
,, গোবিন্দচন্দ্র দাস।
,, গোবিন্দমোহন রায় বিদ্যাবিনোদ।
,, চন্দ্রমোহন সেন।
,, ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়।
,, তারকনাথ বিশ্বাস।
,, তারাকুমার কবিরত্ন।
,, দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায়।
,, দুর্গাচরণ রক্ষিত।
,, দেবকণ্ঠ বাকচি।
,, নবীনচন্দ্র সেন।

শ্রীযুক্ত নিমাইচাঁদ শীল।
,, পঞ্চানন তর্করত্ন।
,, বামদেব দত্ত।
,, বিষ্ণুপদ চট্টোপাধ্যায়।
,, বীরেশ্বর পাঁড়ে।
ভোলানাথ বড়াল।
,, [illegible]ন্দনাথ মিত্র।
,, [illegible]নীকান্ত গুপ্ত।
,, রজনীকান্ত রায়।
,, রাধাজীবন রায়।
,, রামানন্দ শর্ম্মা।
,, শরচ্চন্দ্র গোষ্ঠীপতি।
,, শরচ্চন্দ্র কাব্যরত্ন।
,, শশিভূষণ মিত্র।
,, শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়।
,, শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য।
,, হরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায়।
,, হারাণচন্দ্র রক্ষিত।
,, হৃষীকেশ শাস্ত্রী।
* * * ঘটক।
* * * :
ও সম্পাদক।

কলিকাতা,
৯২ নং, বহুবাজার ষ্ট্রীট, "বরাট" প্রেসে শ্রীকিশোরিমোহন সেন দ্বারা মুদ্রিত
ও শ্রীঅঘোর নাথ বরাট কর্ত্তৃক "বরাট" প্রেস হইতে প্রকাশিত।
১২৯১।
মূল্য ৩৲ তিন টাকা।

সূচিপত্র।

গদ্য।

বষয়	পৃষ্ঠা।

পদ্য।

বিষয়	পৃষ্ঠা।

——000——

নবজীবন।

৫ম ভাগ। আসাঢ় ১২৯৬ সাল। ১০ম সংখ্যা।

পাতঞ্জল যোগ-সূত্র।

স্বস্বামিশক্ত্যোঃ স্বরূপোপলব্ধিহেতুঃ সংযোগঃ ॥ ২৩।

পদচ্ছেদঃ। স্ব-স্বামি-শক্ত্যোঃ স্ব-রূপ-উপলব্ধি-হেতুঃ সংযোগঃ।

পদার্থঃ। স্ব-শক্তিঃ দৃশ্যস্য স্বভাবঃ, স্বামিশক্তিঃ দ্রষ্টুঃ স্বরূপং, তয়োঃ স্বরূপস্যজ্ঞানং, তস্য হেতুঃ কারণং যঃ সএব সংযোগঃ।

অন্বয়ঃ। যঃ স্ব-স্বামি শক্ত্যোঃ স্বরূপোপলব্ধিহেতুঃ স এব সংযোগঃ। কথ্যত ইতি শেষঃ।

ভাবার্থঃ। স্বং দৃশ্যং তস্য শক্তি জড়ত্বেন যোগ্যত্বং, স্বামী পুরুষ স্তস্য শক্তিশ্চেতনত্বেন দ্রষ্টৃত্ব-যোগ্যতা, তযোঃ স্ব-স্বামি-স্বরূপযোঃ, শক্ত্যো-র্বিবিধশব্দাদ্যকার দৃশ্যবুদ্ধিস্বরূপস্য উপলব্ধি-র্ভোগঃ স্বামিস্বরূপোপলব্ধি-রপবর্গঃ, তদ্ধেতুঃ সংযোগঃ স্ব-স্বামিভাবাখ্যঃ সম্বন্ধঃ সএব দ্রষ্টৃ দৃশ্য-ভাবো ভোক্তৃ ভোগ্যভাব ইত্যাখ্যায়তে। যস্যাভাবে দৃগ্‌দৃশ্যযোঃ স্বরূ-পোপলব্ধির্ন ভবতি, সদ্ভাবে সা ভবতি স সংযোগঃ। এতদুক্তং ভবতি স্ব-শক্তিঃ দৃশ্যং প্রাকৃতং বস্তুজাতং ভোগ্যত্বাৎ, স্বামিশক্তিঃ দ্রষ্টা পুরুষঃ ভোক্তৃযোগ্যত্বাৎ, তয়োঃ স্বরূপোপলব্ধৌ স্বরূপ জ্ঞানে যেহেতুঃ সংযোগ-বিশেষঃ সএব দ্রষ্টৃ দৃশ্যয়োঃ সংযোগোঽত্র হেয়হেতুঃ। নহি তয়ো নিত্যয়োর্ব্যাপকযোশ্চ স্বস্বরূপাদতিরিক্তঃ কশ্চিৎ সংযোগোঽস্তি, যদেব

ভোগ্যস্য ভোগ্যত্বং ভোক্তুশ্চ ভোক্তৃত্বমনাদিসিদ্ধং সএব সংযোগঃ। স চ সংযোগোবুদ্ধি স্বারকঃ, দৃশ্যবুদ্ধিসত্ত্বোপাধিরূপাঃ সর্ব্বে ধর্ম্মা ইতি দৃশ্য বত্যা বুদ্ধ্যা সংযোগ এবাহত্র সংযোগ বিশেষঃ। তথাহি—"আত্মেন্দ্রিয় মনোযুক্ত" ভোক্তত্যাহুর্মনীষিণঃ।" ইত্যাদি শ্রুত্যাদিভ্যো লিঙ্গ দেহাত্মসযোগাদেবাত্মনো বিষয়দর্শনাহবগমাত্।

অনুবাদ। স্ব অর্থাৎ দৃশ্য, স্বামী অর্থাৎ দ্রষ্টা [illegible] বিধ শক্তির স্বরূপ জ্ঞানের প্রতি সংযোগই কারণ।

সমালোচন। স্ব শব্দের মুখ্য অর্থ আত্মীয় অর্থাৎ অধিকৃত বা ভোগ্য বস্তু। এখানে স্ব শব্দের অর্থ প্রাকৃত বস্তু সমূহ; কারণ প্রকৃ[illegible]ইতে উৎপন্ন সমুদয় বস্তুই পুরুষের ভোগ্য বলিয়া, নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। স্বা[illegible]ব্দের মুখ্য অর্থ অধিকারী বা ভোক্তা। এখানে স্বামী শব্দের অর্থ [illegible]ন্য, যাহা সাংখ্য শাস্ত্রে পুরুষ বলিয়া প্রসিদ্ধ, কারণ সাংখ্যমতে একমাত্র চৈতন্যই সমুদয় প্রাকৃত বস্তুর ভোক্তা। ইহাদের শক্তি বলিতে স্বরূপ; পূর্ব্বে বলা হই-য়াছে। এক্ষণে তাহাদের জ্ঞান কিরূপে হয়, তাহাই বলা হইতেছে। প্রাকৃত বস্তু সমূহের জ্ঞানের নাম ভোগ এবং পুরুষ জ্ঞান হইতেই মোক্ষ হয়। এই উভয়ের স্বরূপ জ্ঞানের প্রতি বুদ্ধি ও পুরুষের পরস্পর সংযোগই কারণ, প্রাকৃত বস্তু মাত্র জড় রূপ উহারা আপনাকে আপনি প্রকাশ করিতে অক্ষম এবং চৈতন্যরূপী পুরুষও স্বভাবত উদাসীন তাঁহারও আত্মস্বরূপ জ্ঞানের নিমিত্ত প্রবৃত্তি নাই। বুদ্ধি ও পুরুষের সংযোগ বশতই উভয়ের জ্ঞান হইয়া থাকে, যে পর্য্যন্ত এই উভয়ের সংযোগ না হয়, সে পর্য্যন্ত চৈতন্য সর্ব্ব জ্ঞান সমর্থ হইয়াও প্রবৃত্তি না থাকায় কিছু দর্শন করেন না। কাযেই তাঁহার দ্রষ্টৃত্ব এবং প্রাকৃত বস্তুর দৃশ্যত্ব কিছুই থাকে না। বুদ্ধি ও পুরুষের সংযোগে যে আমাদের সমুদয় জ্ঞান হইতেছে, ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

তস্য হেতুরবিদ্যা॥ ২৪।

পদচ্ছেদঃ। তস্য, হেতুঃ, অবিদ্যা।

পদার্থঃ। তস্য পূর্ব্বোক্তস্য সংযোগস্য হেতুঃ কারণং, অবিদ্যা পূর্ব্ব মুক্তা আত্মা-দাবনাত্মাদিবুদ্ধিরূপা।

অন্বয়ঃ। অবিদ্যা (এব) তস্য হেতুঃ (অস্তি কথ্যতে বা ইতি শেষঃ)।

ভাবার্থঃ। যা পূর্ব্বং বিপর্য্যয়াত্মিকা মোহরূপা অবিদ্যা উক্তা সা এব ভ্রান্তিবাসনা তস্য দ্রষ্টৃদৃশ্যজ্ঞানহেতুভূতস্য বুদ্ধিপুরুষসংযোগস্য হেতুঃ কারণং। তথাপি অহমিতি দৃগদৃশ্যয়োরভেদ ভ্রান্তিঃ তদ্বাসনাধ্যবসিতং চিত্তং প্রলয়ে লীনং প্রধানভাবমুপগতং সর্গকালে পুরুষং প্রতি স্বত্বেনৈব জায়তে, তেন সংযে[illegible]বেকিনো বন্ধো বিবেকিনো মোক্ষশ্চ ভবতি। অনয়া হ্যনাদিবাসন[illegible] চিত্তবর্ত্তিন্যা অবিদ্যয়া সমংততোমুবিদ্ধং পুরুষং পশুং স্বকর্ম্মোপ[illegible]তং দুঃখমুপাত্তং ত্যজন্তং ত্যক্ত মুপাদধানং হাতব্যে এবাস্ম অহঙ্কারমমকা[illegible]পাতিনং, জাতং বাহ্যাধ্যাত্মিচ কাভয়নিমিত্তা স্ত্রিপর্ব্বাণ স্তাপা অনুপ্[illegible]।

[illegible]দ। অবিদ্যাই পূর্ব্বকথিত সংযোগের কারণ।

সমালোচন। পূর্ব্বে যে সমুদয় প্রাকৃত বস্তু এবং চৈতন্য বলা হইয়াছে, এই উভয়ের জ্ঞানের কারণ বুদ্ধি ও পুরুষের সংযোগ সেই সংযোগের প্রতি আবার অবিদ্যা কারণ। অবিদ্যা হইতেই সেইরূপ সংযোগ উৎপন্ন হয়। অবিদ্যা শব্দের অর্থ বিপর্য্যয় জ্ঞান বা মিথ্যা জ্ঞান যাহা যাহা নয় তাহাকে তাহা বলিয়া ভ্রান্তি, যাহা আত্মা নয় তাহাকে আত্মা বলিয়া বিবেচনা হয়,—এইরূপ ভ্রম। মনুষ্য যে পর্য্যন্ত মুক্ত না হয়, সে পর্য্যন্ত এই অবিদ্যা নিবন্ধন বন্ধন তাহার উপর আধিপত্য করে। প্রলয়-কালে ঐ অবিদ্যাজনিত বাসনা বা এক প্রকার সংস্কার প্রধানে লীন হইয়া থাকে। পুনরায় সৃষ্টিকালে প্রকৃতি সেই সংস্কাররূপে লীন অবিদ্যার প্রভাবে পূর্ব্বসর্গে যে পুরুষের যেরূপ বুদ্ধি ছিল, সেই পুরুষের সেইরূপ বুদ্ধির সহিত যোগ করিয়া দেন। এইরূপ যতকাল অবিদ্যার কার্য্য শেষ না হয়, ততকাল পুরুষের মুক্তি হয় না। যে পর্য্যন্ত মুক্তি না হয় সে পর্য্যন্ত ইহ সংসারে জীব মাত্রেই বারম্বার গতায়াত করে। এবং প্রত্যেক নূতন জন্মে পূর্ব্ব জন্মের সংস্কার অনুসারেই বুদ্ধি আসিয়া পুরুষের সহিত মিলিত হয়। এই নিমিত্ত আমরা কাহাকে সৎ, শান্ত, ধর্ম্মিষ্ঠ, বিদ্যানুরক্ত ইত্যাদি নানা সদ্‌গুণে সুভূষিত দেখিতে পাই, আর কাহাকে বা ঠিক তাহার বিপরীত দেখিতে পাই। কেহ বা জন্মাবধিই হিরণ্যকশিপু, বৃদ্ধকাল অবধি সম্পূর্ণ অজ্ঞানে আচ্ছন্ন,

মহাগর্ব্বে গর্ব্বিত, ইচ্ছাপূর্ব্বক জগতের ঈশ্বরের সহিত বিবদমান, আর কেহ বা জন্মাবধিই প্রহ্লাদ, ভূমিষ্ঠ হইয়া অবধি হরি গানে উন্মত্ত। পূর্ব্ব জন্মের বুদ্ধি সংযোগই এইরূপ বিচিত্রতার কারণ। তাহা না হইলে প্রতি সর্গে সমুদয় মনুষ্যের একরূপই বুদ্ধি হইত, সকলেই হিরণ্যকশিপু বা প্রহ্লাদ হইত। প্রহ্লাদ, হিরণ্যকশিপু ইত্যাদি বহুবিধ লোকের উৎপত্তি হইত না, এই নিমিত্ত মহা কবি মাঘ বলিয়াছেন,

"সতী চ যোষিৎ প্রকৃতিশ্চ নিশ্চলা
পুমাংস মভ্যেতি ভবান্তরেষ্বপি।"

আমাদের দেশে সাধ্বী স্ত্রীর সতীত্ব সম্বন্ধে লোকের [illegible]র ভাব অতি চমৎকার। কেবল ইহ জন্মে পতির প্রতি অনুরক্ত হইয়া অপ[illegible]ষের প্রসঙ্গ পরিত্যাগ করিলেই সতী হয় না। যে জন্ম জন্মান্তরেও এক [illegible]সঙ্গ ত্যাগ না করে, সেই সতী। এই নিমিত্ত রাম কর্ত্তৃক নির্ব্বাসিতা সীতা বাল্মীকির আশ্রমে যখন গঙ্গাস্রোতে পতিত হন, তখন এই বলিয়া পতিত হইলেন যে সেই রামচন্দ্রই যেন আবার আমার পুনর্জ্জন্মে পতি হয়েন। এই সংস্কার বশেই মহাকবি মাঘ বলিতেছেন যেমন সতী স্ত্রী প্রতি জন্মেই আপনার নির্দ্দিষ্ট পতিকে প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ লোকের স্বভাব বা বুদ্ধিবৃত্তিও জন্মান্তরে পূর্ব্বে যে পুরুষের ছিল, সেই পুরুষকেই প্রাপ্ত হয়।

তদ ভাবাৎ সংযোগাভাবো হানং তদ্দৃশেঃ কৈবল্যম্ ॥ ২৫।

পদচ্ছেদঃ। তৎ-অভাবাৎ, সংযোগ-অভাবঃ, হানং, তৎ, দৃশেঃ, কৈবল্যম্।

পদার্থঃ। তস্যা অবিদ্যায়া অভাবঃ, উন্মূলনং তস্মাৎ, সংযোগস্য উক্তরূপস্য অভাবঃ, স এব হানং বন্ধাভাবরূপং তৎ হানং দৃশেঃ পুরুষস্য কৈবল্যং কেবলস্য ভাবঃ, মোক্ষ ইতি যাবৎ।

অন্বয়ঃ। তদ ভাবাৎ যঃ সংযোগাভাবঃ (তদেব) হানং (ইত্যুচ্যতে), তচ্চ দৃশেঃ কৈবল্যং (ইত্যুচ্যতে)।

ভাবার্থঃ। দ্রষ্টৃ দৃশ্য স্বরূপ জ্ঞানরূপেণ তত্ত্বজ্ঞানেন অবিদ্যায়া বিনাশাৎ উন্মূলনাদিতি যাবত্, তৎকার্যস্য, বুদ্ধিপুরুষসংযোগস্য নিবৃত্তির্ভবতি,

তয়াচ সংযোগনিবৃত্ত্যা দৃগ্দৃশ্যয়োঃ, স্ব স্বামিভাবোজ্ঞাতৃজ্ঞেয়ভাবো নিবর্ত্ততে জ্ঞাতৃজ্ঞেয় ভাবোহি বন্ধঃ,ততশ্চ জ্ঞাতৃজ্ঞেয় ভাবনিবৃত্তিরেব বন্ধাভাবঃ হানং ইত্যুচ্যতে এতদেব নিত্যমুক্তায়া দৃশেঃ পুরুষস্য কৈবল্যং স্ব স্বরূপ তাধিগমঃ মোক্ষ ইতি যাবৎ।

অনুবাদ। সেই অবিদ্যার উন্মূলন হইলে বুদ্ধির সহিত পুরুষের সংযোগেরও [illegible] হয়। বুদ্ধি পুরুষের সংযোগের অভাবই বন্ধনাভাব এবং সেই বন্ধ[illegible]াবই কৈবল্য বা মোক্ষ।

সমালোচন। অবিদ্যাই এই সংসারের মূল। অবিদ্যাবশেই বিশুদ্ধচৈতন্য স্বরূপ পুরুষের অহঙ্কার "আমি আমার" ইত্যাদি ভ্রম হয়। যত দিন পর্য্যন্ত এই ভ্রমের নিবৃত্তি না হয়, তত দিন অবধি পুরুষ এই সংসার বন্ধনে আবদ্ধ [illegible]কেন, আপনার স্বাভাবিক বিশুদ্ধ স্বরূপ লাভ করিতে সমর্থ হন না। এই অবিদ্যার নিবৃত্তি এক জন্মে হয় না। যে পর্য্যন্ত তত্ত্বজ্ঞান না হয়, সে পর্য্যন্ত অবিদ্যার নিবৃত্তি হয় না। তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইলে অবিদ্যার নিবৃত্তি হয়, অবিদ্যার নিবৃত্তি হইলে বন্ধনেরও আত্যন্তিক নিবৃত্তি হয়, আর কখনও বন্ধন হয় না। বন্ধনের নিবৃত্তি হইলে পুরুষ আপনার স্বাভাবিক নির্ম্মল চৈতন্য স্বরূপ প্রাপ্ত হন। তখন "আমি, আমার" এরূপ বুদ্ধি থাকে না পুরুষের বিশুদ্ধ চৈতন্য ভাবই কেবল অবস্থিত হয়। কৈবল্য শব্দের অর্থ কেবল ভাব, অমিশ্রভাব বিশুদ্ধ চৈতন্যরূপতা। ইহার নামই মোক্ষ।

বন্ধনাভাব কাহাকে বলে তাহা বলা হইল। কি উপায়ে সেই বন্ধনা ভাব হয় তাহা বলিবার নিমিত্ত সূত্রকার পরসূত্রের অবতারণা করিয়াছেন।

বিবেকখ্যাতি রবিপ্লবা হানোপায়ঃ॥ ২৬।

পদচ্ছেদঃ। বিবেক খ্যাতিঃ, অ-বিপ্লবা, হান-উপায়ঃ।

পদার্থঃ। অন্যে প্রাকৃতা গুণাঃ, অন্যশ্চ পুরুষঃ, ইত্যেবং রূপস্য বিবেকস্য তত্ত্বজ্ঞানস্য খ্যাতিঃ প্রখ্যা, ন বিদ্যতে বিপ্লবোবিচ্ছেদাইন্তরায়ো বা যস্যাঃ সা অবিপ্লবা ইতি, হানস্য দুঃখ মূলক বন্ধনাভাবস্য উপায়ঃ কারণং সাধন মিতি যাবৎ।

অন্বয়ঃ। অবিপ্লবা বিবেক খ্যাতিঃ হানস্য উপায়ো ভবতীতি শেষঃ।

ভাবার্থঃ। দৃগ্দৃশ্যয়ো-র্ভেদো বিবেক স্তস্য খ্যাতির্জ্ঞানং, অথবা দৃগ্দৃশ্যয়ো র্ভেদ জ্ঞানং বিবেকঃ তস্য খ্যাতিঃ প্রকাশঃ। প্লবতে মিথ্যা-জ্ঞান সংস্কার বশাৎ চ্যবতে, মিথ্যা জ্ঞানেনাঽন্তরাঽন্তরাঽভিভূয়তে ইতি বিপ্লবায়া ন তথা ভবতি সা অবিপ্লবা। যদাতু নির্ম্মলো বিবেকখ্যাতি প্রবাহো মিথ্যা জ্ঞানাঽকলুষিতো ভবতি তদা সা বিবেক-খ্যাতিরবিপ্লবো-চ্যতে, ইদ মুক্তং ভবতি আদৌ খল্বাগমাত্ সামান্য[illegible]বেকখ্যাতিরু দেতি সা নাঽ বিদ্যাং হন্তি পরোক্ষত্বাৎ, যদা সা ম[illegible]াপিতা সতী সর্ব্বতো বিরক্তেন পুরুষাভিমুখেন চিত্তেনাভ্যস্যতে, তদাধ্যান-প্রকর্ষ-পর্য্যন্ত জা চিৎপ্রতিবিম্বিতা সাক্ষাৎকার রূপা বাসনা মিথ্যা জ্ঞানং নিহত্যাবিপ্লবা সতী পরবৈরাগ্য পূর্ব্বকনিরোধে চ সংস্কার শেষস্য-কৃত-কৃতস্য প্রা[illegible]বসানে আত্যন্তিক নিবৃত্তি দ্বারা ভাবি দুঃখ হানস্য মোক্ষস্য উপায় ইত্যর্থঃ।

অনুবাদ। অবিচ্ছিন্ন বিবেক খ্যাতিই বন্ধনাভাব বা মোক্ষের উপায়।

সমালোচন। বন্ধনের অভাবই মোক্ষ ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। ঐ বন্ধনের কারণ অবিদ্যা, অবিদ্যা উন্মূলিত হইলে বন্ধনও উন্মূলিত হয়; একমাত্র তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা অবিদ্যা উন্মূলিত হয়। এ সকল কথাও পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। সেই তত্ত্বজ্ঞান কিরূপ হইলে এককালে চিরদিনের নিমিত্ত অবিদ্যাকে উন্মূলিত করে সুতরাং স্থায়ী বন্ধনাভাব উৎপাদন করে, এক্ষণে তাহাই বলা হইতেছে। তত্ত্বজ্ঞান বা বিবেক খ্যাতি বলিতে প্রকৃতি এবং তদুৎপন্ন বস্তু সমূহের সহিত পুরুষের ভেদজ্ঞান। প্রাকৃত বস্তুমাত্রই সত্ত্ব, রজঃ, ও তমোগুণাত্মক সুতরাং সুখ, দুঃখ ও মোহস্বভাব; পুরুষ স্বভাবত বিশুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ। তিনি স্বভাবত নির্লিপ্ত, নির্গুণ এবং ক্রিয়াহীন। প্রকৃত বস্তুমাত্রই পরিণামী; প্রতিক্ষণেই রূপান্তর প্রাপ্ত হয়, পুরুষ অপরিণামী; শত-সহস্র যুগ যুগান্তেও একই রূপে অবস্থান করে। এইরূপ বোধের নাম তত্ত্ব-জ্ঞান বা বিবেক খ্যাতি। এই বোধ আমাদের শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন বা শ্রবণ দ্বারা কিছু কালের জন্য হয় বটে, কেবল শাস্ত্র অধ্যয়ন কেন ইচ্ছার ব্যাঘাত বা প্রিয় বস্তুর বিনাশাদি দর্শনেও আমাদের মনে সংসারের অসা-রতা এবং সাংসারিক বস্তুমাত্রেরই দুঃখদায়িতা বোধ হয়; উহাকে সচরাচর লোকে শ্মশানবৈরাগ্য বলে; কিন্তু প্রবল অবিদ্যা প্রভাবে উহা অতি

অল্পক্ষণের মধ্যেই অন্তর্হিত হয়। বর্ষাকালে ঘোরঘনঘটাচ্ছন্ন নভোমণ্ডলে ক্ষণপ্রভার প্রকাশ যেমন ক্ষণস্থায়ী, ঘোর অবিদ্যাদ্বারা অভিভূত সাংসারিক ব্যক্তির হৃদয়ে তত্ত্ব জ্ঞানের প্রকাশ ও সেইরূপ ক্ষণস্থায়ী। এই জন্য সূত্রকার বলিতেছেন, অবিপ্লবা বিবেক খ্যাতিই বন্ধনাভাবের উপায়। বিপ্লব শব্দের অর্থ মিথ্যাজ্ঞান বা অবিদ্যা যখন ঐ বিবেকখ্যা[illegible] অবিদ্যার সম্পর্ক শূন্য হয় তখনই উহা বন্ধনকে উন্মূলিত কর[illegible]শাস্ত্রাদি হইতে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া দীর্ঘকাল, নিরন্তর শ্রদ্ধার সহিত উহার অনুশীলন করিতে করিতে উহা যখন হৃদয়ে দৃঢ়তাপ্রাপ্ত হইয়া পুরুষের প্রাকৃত বস্তু হইতে ভিন্নতার এবং বিশুদ্ধ চৈতন্য রূপতার সাক্ষাৎকার লাভ করে, তখনই উহাদ্বারা চির বদ্ধমূল সংস্কার সমূহের সহিত [illegible]মিথ্যাজ্ঞান বা অবিদ্যার উন্মূলন হয়। তখনই "আমি বা আমার" জ্ঞান অন্তর্হিত হয়। অর্থাৎ তখনই জানিতে পারা যায়, এই যে চিরদিন আমি আমার বলিয়া জ্ঞান করিয়া আসিতেছিলাম উহা সম্পূর্ণ ভ্রমমূলক। বস্তুগত্যা "আমি" বলিয়া কোন একটা পদার্থ নাই আর "আমিই" যদি না থাকি, তবে "আমারও" কিছুই নাই। কেবল জড় ও চৈতন্যের একবার অনির্ব্বচনীয় সন্নিকর্ষ বশতই "আমি" ও "আমার" এইরূপ জ্ঞান হইয়াছিল। যখন জড় ও চৈতন্য পরস্পর নিঃসম্পর্ক, সম্পূর্ণ বিভিন্ন, একের সহিত অন্যের কিছুমাত্র সম্বন্ধ নাই, একের বিনাশে বা বৃদ্ধিতে অপরের কিছুমাত্র ক্ষয় বা বৃদ্ধি নাই ইহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা গেল তখন সকল ভুরই ভেঙ্গে গেল। সংসার বন্ধন ছুটিয়া গেল। চৈতন্য জড় হইতে পৃথক্‌ভাবে অবস্থান করিতে লাগিল। জড় হইতে চৈতন্যের পৃথকভাবে অবস্থিতির নামই মোক্ষ। এবং ঐ রূপ পৃথকভাবের একমাত্র উপায় সুদৃঢ় তত্ত্বজ্ঞান। কারণ যে পর্য্যন্ত তত্ত্বজ্ঞান দৃঢ়তা লাভ না করে, সে পর্য্যন্ত মিথ্যাজ্ঞান প্রবল থাকে, তত্ত্বজ্ঞান দৃঢ় হইলে মিথ্যাজ্ঞান বিলুপ্ত হয় এবং সেই সঙ্গে মিথ্যাজ্ঞানসম্ভূত সংসারবন্ধনও বিনষ্ট হয়।

তস্য সপ্তধা প্রান্ত ভূমিঃ প্রজ্ঞা। ২৭।

পদচ্ছেদঃ। তস্য, সপ্তধা, প্রান্ত-ভূমিঃ, প্রজ্ঞা।

পদার্থঃ। তস্য প্রত্যুদিতখ্যাতেঃ জীবিনঃ, সপ্তধা সপ্ত প্রকারা,প্রান্তভূমি প্রকৃষ্টোঽন্তো যাসাংতাঃ প্রান্তাঃ প্রান্তা ভূময়োঽবস্থা যস্যাঃ সা প্রান্তভূমিঃ, প্রজ্ঞা বিবেকখ্যাতিঃ।*

অন্বয়ঃ। তস্য প্রান্তভূমিঃ প্রজ্ঞা সপ্তধা ভবতীতি শেষঃ।

ভাবার্থঃ। প্রত্যুৎপন্ন বিবেকজ্ঞানস্য অবিদ্যা কার্য্য পাপাদিরূপচিত্তাচ্ছাদকানাং মলানাং অপগমাৎ নাশাৎ হেতোর্বি[illegible]খ্যাতিভিন্নানাং প্রত্যয়ানাং অনুৎপত্তৌ সত্যাং পরবৈরাগ্যজান্নিরোধ[illegible]থান দশায়াং প্রজ্ঞা জ্ঞানং বিবেক খ্যাতি রিতিযাবৎ সপ্ত প্রকারাভবতি। তদ্‌যথা—

(১) জ্ঞাতং মে জ্ঞেয়ং ন জ্ঞাতব্যং কিঞ্চিদস্তি। (২) ক্ষীণা মে হেয় হেতবঃ ক্লেশাঃ ন পুনর্মে কিঞ্চিতৎ ক্ষেতব্য মস্তি। (৩) অধি[illegible]তং ময়া নিরোধসমাধিনা হানং। (৪) অধিগতো ময়া বিবেক খ্যাতিরূপো[illegible]হানো পায়ঃ এষা চতুষ্টয়ী কার্য্য বিমুক্তিরূপা। (৫) চরিতার্থা মে বুদ্ধিঃ। (৬) গুণাশ্চ মে কৃতাধিকারাঃ গিরিশিখরনিপতিতা ইব দ্রাবাণো ন পুনঃ স্থিতিং যাস্যন্তি, স্বকারণে প্রলয়াঽভিমুখানাং মোহাভিধান মূল কারণাভাবান্নিষ্প্রয়োজনতা চামীষাং কুতঃ প্ররোহঃ? (৭) স্বাত্মীভূতশ্চ মে সমাধি স্তস্মিন্ সতিস্বরূপ প্রতিষ্ঠোঽহ মিতি। ঈদৃশী ত্রিঃ প্রকারা চিত্ত বিমুক্তি রূপা।

অনুবাদ। পূর্ব্বোক্তরূপ বিপ্লবশূন্য অর্থাৎ নিরবচ্ছিন্ন বিবেক খ্যাতি উৎপন্ন হইলে সাত প্রকার জ্ঞান হইয়া থাকে।

সমালোচন। পূর্ব্ব সূত্রে বলা হইল যে বিবেক খ্যাতি নিরবচ্ছিন্ন হইলে মিথ্যা জ্ঞান বা ভ্রান্তির দগ্ধবীজের ন্যায় কার্য্যকারিণী শক্তি নষ্ট হওয়ায় আর তাহার কোন প্রকার কার্য্য দৃষ্ট হয় না। মিথ্যা জ্ঞানের কার্য্য বিলোপই মোক্ষের পথ ও বন্ধনাভাবের উপায়। এক্ষণে সেই বিবেক খ্যাতি উৎপন্ন হইলে মনের অবস্থা কিরূপ হয় অর্থাৎ সেই বিবেক খ্যাতির স্বরূপ কি তাহাই বলা হইতেছে। ভাষ্যকার বলেন সূত্রে যে 'তস্য' আছে ইহা

* আসিয়াটিকসোসাইটির মুদ্রিত ভোজবৃত্তির সহিত পাতঞ্জল সূত্রে "তস্য সপ্তধা প্রান্তভূমৌ প্রজ্ঞা" এই রূপ পাঠ আছে। ভোজরাজ তাহার অর্থ এইরূপ করিয়াছেন। 'তস্য উৎপন্ন বিবেক জ্ঞানস্য জ্ঞাতব্য বিবেক রূপা প্রজ্ঞা প্রান্ত ভূমৌ সকল সাবলম্বন সমাধি পর্য্যন্তং সপ্তপ্রকারা ভবতি।'

দ্বারা যাহার অবিপ্লব বিবেক খ্যাতির উদয় হইয়াছে এইরূপ ব্যক্তিকে বুঝিতে হইবে, নতুবা সূত্রের অর্থ হয় না।

যে ব্যক্তির বিবেক খ্যাতি নিরবচ্ছিন্ন অর্থাৎ মিথ্যাজ্ঞানের সম্পর্ক শূন্য হওয়ায় ধারাবাহিকরূপে দৃঢ় হইয়াছে অর্থাৎ যে ব্যক্তি প্রাকৃত বস্তুর স্বরূপ কি ও শক্তি কত দূর এবং পুরুষের স্বরূপ কি, আর সামর্থ্যই বা কি, ইহা ভালরূপে বুঝিয়াছে, [illegible]ক্তি জড় ও চৈতন্যের পৃথক্ নিশ্চয় করিয়া তাহাদিগকে আর মিশ্রিত না করিয়া পরস্পরের অমিশ্র ভাবের দৃঢ়রূপে ধারণা করিতে সক্ষম হইয়াছে, এইরূপ ব্যক্তির চিত্তের আবরক মিথ্যা জ্ঞানের অপগম অর্থাৎ উন্মূলন হয়। যে পর্য্যন্ত মনুষ্য জড় ও চৈতন্য এই উভয়ের তত্ত্ব না বুঝে, [illegible]ই পর্য্যন্ত ঐ উভয়কে অভিন্ন ভাবিয়া জড়ে চৈতন্যের আরোপ করিয়া "আমি অমুক, আমার নিজের গৌরব, আমার কুলের গৌরব, আমার দেশের গৌরব, আমার জাতির গৌরব—রক্ষা করিবার নিমিত্ত এই সকল কার্য্য আমার অবশ্য কর্ত্তব্য, আমার নিজের সুখ, আমার সন্তান সন্ততির সুখ, আমার পরিবারবর্গের সুখের জন্য ছলে, বলে, কৌশলে যেরূপে হউক কিছু ধন উপার্জ্জন না করিলে নয়। আমার অবর্ত্তমানে আমার স্ত্রী পুত্র যে দ্বারে দ্বারে উদরান্নের জন্য লালায়িত হইবে, ইহা বড়ই অসহ্য অতএব কেবল উপার্জ্জন করিলে কি হইবে কিছু কিছু সঞ্চয়েরও আবশ্যক, এইরূপ নানা প্রকার চিন্তার তরঙ্গে আকুলিত হইয়া সর্ব্বদা অস্থিরভাবে ছুটোছুটি করিয়া কালযাপন করে ক্ষণকালের জন্য স্থিরতা লাভ করিতে সমর্থ হয় না। কিন্তু জড় ও চৈতন্য পরস্পর সম্পূর্ণ বিভিন্ন পরস্পরের কিছুমাত্র সম্পর্ক নাই জল ও তৈলাদি স্নেহ পদার্থ যেমন ঘটনাক্রমে একত্রিত হইলেও যেমন পরস্পর মিশ খায় না পরস্পর পার্থক্য রক্ষা করে জড় ও চৈতন্যও সেইরূপ। এই, তত্ত্বজ্ঞান যখন মনে দৃঢ়রূপে বদ্ধমূল হয়, তখন আর উভয়ের অভেদরূপ মিথ্যা-জ্ঞান থাকে না। সুতরাং সেই মিথ্যাজ্ঞান নিবন্ধন "আমি" "আমার" প্রভৃতি যে অসংখ্য জ্ঞান তরঙ্গ উত্থিত হইয়াছিল সে সকল এককালে নিবৃত্ত হয় তখন একমাত্র বিবেক খ্যাতি বা তত্ত্বজ্ঞান চিত্তকে অধিকার করে। ঐ তত্ত্বজ্ঞান অবস্থাভেদে সাত প্রকার হয়। যথা (১) আমি যাহা জানিবার তাহা জানিয়াছি আর আমার জানিবার কিছুই নাই। (২) এই তত্ত্বজ্ঞান

লাভ করায় আমার দুঃখের হেতু অবিদ্যা আদি ক্লেশসকল ক্ষীণ হইয়াছে আর তাহারা আমার উপর প্রভুত্ব করিতে পারিবে না, যখন তাহাদের পরিত্যাগ করিয়াছি তখন আর আমার পরিত্যাগ করিবার কিছু নাই। (৩) অবিদ্যাদি ক্লেশের উন্মূলন করায় আমি বন্ধনাভাবও প্রাপ্ত হইয়াছি, কারণ এই ক্লেশেরাই বন্ধনের কারণ; যখন ইহাদের আর কার্য্যকারিণী শক্তি নাই তখন পুনরায় আমার বন্ধন হইবারও সম্ভাবনা নাই। (৪) [illegible] বন্ধনাভাব বা মোক্ষের উপায় তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছি। এই চা[illegible]র অবস্থাপন্ন বিবেক খ্যাতি বা তত্ত্বজ্ঞান হইতে জীবের কার্য্য হইতে বিমুক্তি লাভ হয়। কোন কর্ত্তব্যে প্রবৃত্তি না হওয়ায় কর্ম্মজন্য বন্ধন হইবার সম্ভাবনা থাকে না; ইহাকেই জীবন্মুক্তি বলা যায়। (৫) আমার বুদ্ধি চরিতার্থ হইয়াছে, আপনার কর্ত্তব্য শেষ করিয়াছে, ভোগ এবং অপবর্গ উভয়ই প্রাপ্ত হ[illegible]য়াছে। (৬) বুদ্ধির গুণ বা ধর্ম্ম সাংসারিক সুখ, দুঃখ, মোহ আদি ইহারাও আপনার আপনার কার্য্য শেষ করিয়া স্বীয় কারণ সত্ত্ব, রজস্তমোময় প্রকৃতিতে লীন হইয়াছে; যেমন পর্ব্বতের শিখরদেশ হইতে প্রচ্যুত উপলখণ্ড পুনর্ব্বার স্বস্থানে থাকিতে সমর্থ হয় না, সেইরূপ ঐ গুণসকল আপন আপন কার্য্য করিয়া হীন শক্তি হইয়াছে আর উহারা পুনরায় কার্য্য করিতে সক্ষম হইবে না, আর যে উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য ইহাদের সৃষ্টি হইয়াছিল সেই উদ্দেশ্যের যখন সিদ্ধি হইল অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানরূপ পুরুষার্থ লাভ হইল তখন প্রয়োজন না থাকায় ইহাদের পুনরুদ্ভবেরও সম্ভাবনা নাই। (৭) এক্ষণে সমাধি আমার আয়ত্ত হইয়াছে আমি মনে করিলেই চিত্তকে সম্পূর্ণ স্থির করিয়া বিশুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপে অবস্থান করিতে পারি। এই শেষোক্ত তিন অবস্থাকে চিত্ত বিমুক্তি বলে। ইহারা ক্রমে ক্রমে চিত্তকে বৃত্তিশূন্য করিয়া একেবারে অসম্প্রজ্ঞাত অবস্থায় লইয়া যায়। চিত্ত নির্ব্বাত নিষ্কম্প প্রদীপের মত স্থিরভাব ধারণ করে এবং চৈতন্য আপনার স্বাভাবিক নির্ম্মল জ্যোতিঃস্বরূপে অবস্থান করে। সে অবস্থা অতি চমৎকার; অতি গভীর ভাব-পূর্ণ, কল্পনার অতীত, স্মরণ করিলেও লোমাঞ্চ হয়। জড় আপনার জড়ত্ব বুঝিতে পারিয়া যেন ভয়ঙ্কর আত্মগ্লানিতে নিস্তব্ধ হইয়া আপনার স্বাভাবিক ধর্ম্ম স্থিরতা অবলম্বন করিয়া গম্ভীরভাবে অবস্থান করিতেছে এবং চৈতন্যও আপনার স্বাভাবিক নির্ম্মল

জ্যোতিঃ স্বরূপতা জানিতে পারিয়া পুনরায় আবার জড় সম্পর্কে মলিন হইবার ভয়ে যেন উহা হইতে পৃথক্ হইয়া ঔদাসীন্যাবলম্বন করিয়াছে; দম্পতির প্রণয় মানের অবস্থা যদি কাহারও প্রত্যক্ষ থাকে তিনিই সেই অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির গূঢ় রহস্যের কিঞ্চিৎ ছায়া অনুভব করিতে পারিবেন।

কলিকাতার বাল্য-দৃশ্য।

কলিকাতা সম্বন্ধীয় যাহা কিছু প্রাচীন, যতদূর সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছি, তাহা আমরা পাঠকদিগকে জ্ঞাত করিয়াছি। এক্ষণে, যে সময়ে মোগল সাম্রাজ্যান্তর্গত বাঙ্গালার মুসলমান বাণিজ্য কেন্দ্র হুগলী নগর হইতে অন্তরিত হইয়া সুতানুটী, হিজলী, উলুবেড়িয়া প্রভৃতি স্থান সমূহে পর্য্যায়ক্রমে বাণিজ্যাগার (কুঠি) সংক্রান্ত উপনিবেশ সংস্থাপনে অকৃতকার্য্য হয়, অবশেষে, ঘটনাচক্রে জব চার্ণক ইংরেজের পূর্ব্ব-ভারত-বণিক-সমিতি সংক্রান্ত যাবতীয় কর্ম্মচারী ও দ্রব্যাদি সহকারে পুনর্ব্বার ১৬৯০ খ্রীষ্টাব্দে সুতানুটী গ্রামে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া উক্ত সমিতির উপনিবেশ ও বাণিজ্য-কুঠি সংস্থাপন করিতে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, সেই সময়ে কিম্বা তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্ব বা পরবর্ত্তী সময়ে কলিকাতার সাধারণ দৃশ্য কিরূপ ছিল, পাঠকদিগের কৌতূহল পরিতৃপ্তির জন্য, তাহারই একটি চিত্র অঙ্কিত করাই বর্ত্তমান প্রবন্ধের প্রধান উদ্দেশ্য। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ যে সময়ের চিত্র অঙ্কিত করিতে আমরা প্রবৃত্ত হইতেছি, সে সময়ের কলিকাতা সম্বন্ধে লিখিত বিষয় কোন পুস্তক বা দলিলে এরূপ অল্প ও অসম্পূর্ণ ভাবে লিখিত আছে যে, কয়েকটি সাধারণ বিষয় ব্যতীত কিছু অধিক অবগত হওয়া অতীব সুকঠিন। সে যাহাই হউক, এবম্প্রকার অসুবিধা থাকিলে ও যাহাতে বিবিধ সূত্র হইতে চয়ন করিয়া অদ্যকার এই সম্পূর্ণ বিকশিত মহানগরীর ন্যূনাধিক দুই শতাব্দী পূর্ব্বের চিত্র পাঠকদিগের সম্মুখে উপস্থিত করিতে সমর্থ হই, সেই বিষয়ে আমরা সাধ্যমত চেষ্টার ত্রুটি করিব না।

ইঙ্গরেজগণের কলিকাতায় প্রথম আগমনকালে অথবা প্রায় দুই শতাব্দী কাল (১) পূর্ব্বে আধুনিক কলিকাতা যে পরিমাণ স্থান অধিকার করিয়াছিল, তাহা সামান্য মাত্র। নিম্ন বঙ্গের যে সকল পল্লীগ্রামে অদ্যাপিও ইঙ্গরেজী সভ্যতার কোন প্রকার সংস্পর্শ মাত্র উপনীত হয় নাই, অধিক কি, যে সকল স্থানে একটি মাত্র ইষ্টকালয় পর্য্যন্ত পরিলক্ষিত হয় না, কেবলমাত্র প্রশস্ত ধান্যক্ষেত্রের প্রান্তে কয়েকখানি তৃণাচ্ছাদিত মৃণ্ময় কুটীর সমষ্টি মাত্র পরিদৃশ্যমান হইয়া থাকে, প্রাচীন কতিকাতার বাল্য-দৃশ্য [illegible] ইরূপ ছিল। পাঠকগণ যাঁহারা এ শ্রেণীর পল্লীগ্রামের দৃশ্য দেখিয়াছেন, তাঁহারা সহজেই কথিত সময়ের কলিকাতার দৃশ্য হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবেন। উপরোক্ত বর্ণিত গ্রাম্যদৃশ্য হইতে তাৎকালিক কলিকাতার দুই একটী বিষয়ে মাত্র প্রভেদ পরিলক্ষিত হইত। আধুনিক কলিকাতা যে সমগ্র স্থান [illegible]কার করিয়াছে, উহার স্থানে স্থানে ধান্যক্ষেত্র, কোথাও বা জলাভূমি এবং মধ্যে মধ্যে বন জঙ্গল ও বাঁশঝাড় পরিলক্ষিত হইত। অকিকন্তু ঐ সকলের মধ্যে মধ্যে চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত বিন্দু সদৃশ তৃণপত্রাচ্ছাদিত মৃণ্ময় কুটীর সমষ্টির কয়েকখানি মাত্র পল্লিগ্রাম ছিল। ঈদৃশ অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নগণ্য পল্লীগ্রামের মধ্যে দুই তিনখানি গ্রামই সর্ব্বাপেক্ষা বর্দ্ধিষ্ণু ছিল। সময়ান্তরে ঐ গ্রামগুলির প্রত্যেকের পৃথক পৃথক ইতিহাস পাঠকদিগের জ্ঞাত করিতে চেষ্টা করিব।

আমরা নিম্নে যে কয়েকটি বিষয়ের বর্ণনা করিতেছি, তৎপাঠে পাঠকগণ কলিকাতার বাল্যাবস্থার দৃশ্য সহজেই হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবেন। ক্ষিতীশ-বংশাবলি চরিতে (২) এইরূপ মর্ম্মে লিখিত আছে;—

রাজা কৃষ্ণচন্দ্র নবাব আলিবর্দ্দি খাঁর অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন। উক্ত

(১) "Our earliest connection with these places, according to Orme, was in 1686, when Job Charnock withdrew the English Foctory from Hugli to Sootanooty; but it was not till August 1690 that he succeeded in establishing a firm footing in that village" *Vide report of the Census of the Town of Calcutta taken on the 6th April 1576—by H. Beverley Esq.,* C. S. *p.* 31.

(২) কার্ত্তিকের চন্দ্র রায় প্রণীত ক্ষিতীশ-বংশাবলী চরিত—১০৩ হইতে ১০৬ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত দেখ।

রাজার নিকট তাঁহার পিতৃপিতামহের সময়ের দেয় রাজস্বের মধ্যে দশ লক্ষ টাকা নবাবের প্রাপ্য ছিল। কৃষ্ণচন্দ্র ঐ টাকা রেহাই পাইবার জন্য নবাবের নিকট পুনঃ পুন আবেদন করিয়াছিলেন। কিন্তু কোনরূপেই সফল-প্রযত্ন হইতে পারেন নাই। একদা নবাব জলপথে কলিকাতাভিমুখে যাত্রা করিলেন। ভাগীরথীর তীরস্থ অন্যান্য গ্রাম অতিক্রম করিয়া নবাবের তরণী কলিকাতার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। ঐ নগর সে সময়ে একখানি সামান্য গ্রাম ছিল। কেবল ইহার উত্তরাংশে গঙ্গার ধারে কতকগুলি লোকের বসতি ছিল। পূর্ব্ব ও দক্ষিণাংশ এককালে বাদা বনে আচ্ছন্ন ছিল। তৎকালে মুরশিদাবাদ ও কলিকাতার মধ্যে ভাগীরথীর পূর্ব্ব তটস্থ কোন গ্রাম বা নগরের নিকট এতাদৃশ বন ছিল না। একারণ সুচতুর কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহার জমীদারীর দুরবস্থা নবাবের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিবার নিমিত্ত ঐ প্রদেশ দেখাইতে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। আলিবর্দ্দি রাজার প্রগাঢ় নির্ব্বন্ধ উল্লঙ্ঘনে অসমর্থ হইয়া জমীদারীর অবস্থা সন্দর্শনার্থে নির্গত হইলেন। জন স্থান অতিক্রম করিয়া যতদূর গমন করিলেন, কেবলই অরণ্যময় দর্শন করিতে লাগিলেন। এই সময়ে রাজার শিক্ষানুসারে নবাবের সঙ্গিগণ 'এখানে ব্যাঘ্রাদি হিংস্রক জন্তুর ভয় আছে' প্রভৃতি নানা প্রকার ভীতিপ্রদায়ক বাক্য পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন।

রাজা সজল নয়নে ও কাতর বচনে নিবেদন করিলেন, "ধর্ম্মাবতার! যদি সৌভাগ্যক্রমে কৃপা-পরবশ হইয়া বিশেষ ক্লেশ স্বীকারপূর্ব্বক এতদূর আসিয়াছেন, তবে আর কিছু দূর গমন করুন, তাহা হইলে সেবকের অভীষ্টসিদ্ধির আর কোন সন্দেহ থাকিবে না।" নবাব উত্তর করিলেন, "কৃষ্ণচন্দ্র, আর অধিক যাইবার প্রয়োজন নাই, অদ্য হইতে তোমাকে তোমার পিতৃদায় হইতে মুক্ত করা গেল।"

পূর্ব্বেই আমরা বলিয়াছি যে, পাঠকদিগের মনে কলিকাতার বাল্যাবস্থার দৃশ্যের একটি ধারণা করিয়া দেওয়া আমাদিগের এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উদ্দেশ্য; উপরে যে বর্ণনা দেওয়া গিয়াছে, উহা ব্যতীত আরও যে কয়েকটি বিবরণ নিম্নে সন্নিবেশিত হইতেছে, তাহাতে পাঠকগণ সহজেই একটি সাধারণ সংস্কার করিয়া লইতে সক্ষম হইবেন।

ব্লকম্যান সাহেব বলেন যে, ১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দে—এক্ষণে যে স্থলে চাঁদপাল ঘাট সন্নিবেশিত—উহার দক্ষিণ দিকে সমস্ত অরণ্যময় ছিল। (৩) হ্যামিল্‌টন সাহেব বলেন যে, "১৭১৭ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতার দৃশ্য আধুনিক দৃশ্য হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন ছিল। ইহার স্থানে স্থানে একত্রে দশ বারখানি করিয়া তৃণাচ্ছাদিত মৃণ্ময় কুটীর মাত্র দৃষ্ট হইত। উহাতে কৃষকগণ বাস করিত; এবং ঐ সকল কুটীরের চতুর্দ্দিকে খানা ও ডোবায় পরিপূর্ণ ছিল। (৪) বেলেঘাটা এবং কলিকাতার মধ্যে প্রায় এক ক্রোশ পথ ব্যবধান নিবিড় জঙ্গল; ঐ জঙ্গলে ব্যাঘ্র এবং অন্যান্য হিংস্রক জন্তুর আবাস-স্থল ছিল। (৫) ভারতবর্ষে ইংরেজ ও ফরাসিদিগের মধ্যে শত্রুতা বশত সময়ে সময়ে বিলক্ষণ বাকবিতণ্ডা চলিত, উহা ভারতেতিহাস পাঠকদিগের অবিদিত নাই। অনেক স্থলে এই বিষয় সম্বন্ধে লিপিবদ্ধ আছে, তন্মধ্যে এক স্থলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ডিউপ্লে ইংরেজ-দিগকে ভীতি প্রদর্শন করিয়া কহিয়াছিলেন যে, "ইংরেজদিগের উপ-নিবেশ কলিকাতা ও মান্দ্রাজ নগরদ্বয়কে পুনর্ব্বার উহাদিগের পূর্ব্বের ন্যায় মৎস্যজীবিগণের বাসোপযোগী নদীতীরস্থ সামান্য গ্রামে পরিণত করিব।" (৬) লং সাহেব বলেন যে, "মহান্ পিটর কর্ত্তৃক সেণ্টপিটার্সবর্গ মহানগরীর ভিত্তিমূল প্রোথিত করিবার সময় উক্ত স্থানের যেরূপ অবস্থা ছিল, সার্দ্ধশত শতাব্দী পূর্ব্বে কলিকাতা সেইরূপ কুজ্ঝটিকাপূর্ণ এবং কুম্ভীর ও বন্য-বরাহের

---

(৩) "In 1707 a forest existed to the south of Chandpal ghat." *Vide Lecture on Calcutta During The Last Century —by H. Blockman M. A.*

(৪) In 1717 Calcutta exhibited a very different appearance .....the house, which were scattered about in clusters of ten or twelve each and the inhabitants chiefly husbandmen.....the houses were surround by puddles of water". *Vide Hamiltons East-India Gazetteer, vol. I, p.* 316.

(৫) Vide W. Newman & Co's. Hand Book of Calcutta, p. 8.

(৬) "Duplex was known often to say that he would reduce the English Settlement of Calcutta or Madras to their original state of fishing towns." *Vide Orm's History of Industan*, vol. I. P. 378.

আবাসভূমি ছিল,,। (৭) মেকলে সাহেব বলেন যে, "যে স্থানে এক্ষণে ইন্দ্রপুরীতুল্য চৌরঙ্গীর প্রাসাদমালায় সুশোভিত, ঐ স্থানে পূর্ব্বে অতি দীন-ভাবাপন্ন কতকগুলি তৃণাচ্ছাদিত কুটীর মাত্র ছিল; এবং শষ্পাবৃত বিস্তৃত প্রান্তরে—ঘোড়দৌড়ের মাঠে—সূর্য্যাস্তে যথায় এক্ষণে বিবিধ বর্ণের সুসজ্জিত শকটে পরিপূর্ণ থাকে, উহা তৎকালে কেবল জলচর পক্ষী, কুম্ভীর ও বন্যবরাহদিগের একমাত্র বাসস্থানের মধ্যে পরিগণিত ছিল।" অধিক কি, লং সাহেব এক স্থলে তাৎকালিক কলি-কাতাকে "জলাময়ী নগরী" নামে অভিহিত করিয়াছেন। উপরে আমরা যে বর্ণনা সমূহ সন্নিবেশিত করিলাম, উহা দ্বারা পাঠকবৃন্দ সহজেই কলিকাতায় বাল্যাবস্থার একটী সাধারণ সংস্কার করিয়া লইতে সক্ষম হইবেন। পরিশেষে আমরা কলিকাতার উপরোক্ত সময়ের দৃশ্য সম্বন্ধে আর একটী বিষয়ের উল্লেখ করিয়া এই প্রবন্ধের শেষ করিব।

পূর্ব্বোক্ত সময়ে কলিকাতার মধ্য দিয়া একটি খাড়ী (Creek) প্রবাহিত ছিল, এক্ষণে কলিকাতার কায়ার পরিবর্ত্তনের সহিত উহা বিলুপ্ত হইয়াছে। এই খাড়িটি অধুনা যে স্থান চাঁদপাল ঘাট নামে পরিচিত, ঐ স্থানে ভাগীরথী হইতে আরম্ভ করিয়া ধর্ম্মতলা রাস্তার ঠিক উত্তর দিয়া গোলদীঘির (Wellington Square) এবং ডিঙ্গাভাঙ্গা (Creek Row) হইয়া বেলিয়া-ঘাটার নিকট যে লবণ হ্রদ (Salt Lake) আছে, উহার সহিত মিলিত হইয়াছিল।

শ্রীঅঘোরনাথ দত্ত।

---

(৭) "A hundred and fifty years ago, Calcutta was like St. Petersburgh, when Peter the great laid his master hand on it—the new Orleans of the East—a place of mists, aligators and of wild boars." *Vide Selectious from the Calcutta Review —Article—Calcutta in the Olden Times—its Localities. P. 169 by Reverend James Long.*

(৮) Vide W. Newman & Co's. "*Hand Book to Calcutta*" P. 39. and "*Selection from the Calcutto Review, vol. VI.* Article—" Calcutta in the Olden Times—its Localities," p. 181—by Revo J. Long.

আমাদিগের জাতীয় চরিত্র।

২।

তাহার পর, সত্যপ্রিয়তা। যে জাতি যতই উন্নত হয়, যে জাতির লোক যত পরিমাণে মনুষ্যত্ব লাভ করে, সেই জাতি সেই পরিমাণে সত্যপ্রিয় বা সত্যপালনে তৎপর হয়। অশিক্ষিত বন্য বর্ব্বর জাতিগুলি 'মিথ্যার' মূল্য জানে না বলিয়া, সত্যপালন করে বটে, কিন্তু তাহাদিগকে আমরা সেই সত্যপালন জন্য যত না প্রশংসা করিতে পারি, শিক্ষিত সভ্যজাতি মিথ্যার মূল্য জানিয়া, সেই মিথ্যার বলে ক্ষণিক বিশেষ উপকার পাওয়া যায় জানিয়া, যদি সেই মিথ্যার বক্ষে পদাঘাত করিয়া সত্যের সম্মান রক্ষা করিতে যত্নবান্ হয়, তাহা হইলে আমরা সেই জাতিকেই অধিক প্রশংসা করিতে পারি। আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ সত্যপ্রিয় ছিলেন কি না, সত্য পালন জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিতেন কি না, এখন তাহাই, দেখিতে হইবে।

ঋগ্বেদের সপ্তম অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, ১০ম মণ্ডল, ৩৭ সূক্তে লিখিত আছে, 'সেই যে সত্যবাক্য আকাশ এবং দিবা যাহাকে অবলম্বন করিয়া বর্ত্তমান আছে, বিশ্বভুবন এবং প্রাণীবর্গ যাঁহার আশ্রিত, যাঁহার প্রভাবে প্রতিদিন জল প্রবাহিত হইতেছে এবং সূর্য্যদেব উদয় হইতেছেন, সেই সত্যবাক্য যেন আমাকে সকল বিষয়ে রক্ষা করেন।' সত্যটা কি? বেদের এই কথায় তাহা জানিতে বাকী রহিল কি

শতপথ ব্রাহ্মণে লিখিত আছে, "মনুষ্য মিথ্যা কথা কহিলেই অপবিত্র হয়।"

মহাভারতের রাজধর্ম্মে সত্যের নিম্নলিখিত ত্রয়োদশটী আকার নির্দ্দেশ হইয়াছে,—শম, দম, অমাৎসর্য্য, ক্ষমা, হ্রী, তিতিক্ষা, অনসূয়তা, ত্যাগ, ধ্যান, ধৃতি, দয়া এবং অহিংসা।

কূর্ম্ম পুরাণের চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে দেখা যায়, "সত্যেন লোকং জয়তি সত্যন্তু পরমং তপঃ, যথাভূত প্রসাদস্তু সত্যমাহুর্মনীষিণঃ।"

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের জন্মখণ্ডে ৯৫ অধ্যায়ে বিবৃত আছে, "নহি সত্যাং পরোধর্ম্মো নানৃতাৎ পাতকং পরং।"

বরাহ পুরাণের কথা—"সমগ্র জগতের মূল সত্য, সমস্তই সত্যে প্রতিষ্ঠিত।"

সত্য সম্বন্ধে আর্য্যশাস্ত্র সমূহে অনেক কথা আছে, আমি এখানে কেবল দুই চারিটী কথা উদ্ধৃত করিলাম মাত্র। যে জাতি সত্যের এমন ব্যাখ্যা করিয়াছেন, কে বলিবে, সে জাতি সত্যপ্রিয় ছিলেন না?

এখন দেখিতে হইবে, আর্য্যগণ সত্যপাশে বদ্ধ হইয়া, তাহা পালন করিতেন কি না? কাহারও নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া সেই প্রতিজ্ঞা পূরণ করিতেন কি না?

ব্রহ্ম পুরাণের উক্তি—"কৃত্বা শপথ রূপঞ্চ সত্যং হন্তি ন পালয়েৎ। স কৃতঘ্ন কাল সূত্রে বসেদেব চতুর্দ্দশং।"

কঠোপনিষদ অতি প্রাচীন গ্রন্থ। তাহাতে লিখিত আছে, একদা এক ব্রাহ্মণ যজ্ঞকালে সর্ব্বস্ব উৎসর্গ করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। তাঁহার পুত্রটী নিকটেই দাঁড়াইয়া ছিলেন। তিনি পিতাকে ভৎর্সনা করিয়া কহিলেন, 'আপনি এখনও আপনার প্রতিজ্ঞা পূরণ করিতেছেন না কেন? আমি যখন জীবিত রহিয়াছি,—আমি যখন আপনার সর্ব্বস্বের মধ্যে একটি, তখন আমাকে এই যজ্ঞে উৎসর্গ না করিলে, আপনার প্রতিজ্ঞাপালন কিরূপে হইল?' এই কথায় পিতা রাগিয়া উঠিলেন বটে, কিন্তু প্রতিজ্ঞা পালন জন্য আপনার অনিচ্ছায় সেই পুত্রটীকে উৎসর্গ করিতে বাধ্য হইলেন! তাহার পর পুত্রটী যখন যমলোকে উপনীত হইলেন, যম তখন তাঁহার প্রতি তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "তোমাকে আমি তিনটী বর দিতে পারি; তুমি কি কি বর চাও বল? পুত্র বলিলেন, "প্রথম বর—আমি পুনর্জীবন পাই, দ্বিতীয় বর—আমি কতকগুলি যজ্ঞানুষ্ঠান বিধি শিখিতে চাই, এবং তৃতীয় বর—মৃত্যুর পর মানুষের কি গতি হয়, তাহা জানিতে চাই, আপনি আমাকে এই তিনটী বরই দিউন।" যম প্রথম দুইটী বর দিয়া, তৃতীয় বর দান করিতে ইতস্তত করিতে লাগিলেন, কিন্তু তিনিও নাকি বরদান করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলেন, সুতরাং অগত্যাই সেই প্রতিজ্ঞা পূরণ করিতে বাধ্য হইলেন।

রামায়ণে যে শত শত প্রতিজ্ঞা পালনের কথা ও সত্যপালনের কথা আছে, তাহা কে না জানেন? দশরথ কেবলমাত্র প্রতিজ্ঞাপালন জন্য

প্রাণোপম পুত্রকে বনবাস দেন এবং কেবল মাত্র পিতৃ সত্যপালন জন্য রামচন্দ্র রাজসুখ ত্যাগ করিয়া বনবাসী হন, ইহা বালকেও জানে। কিন্তু আমি বলি, এই প্রতিজ্ঞা পালন করাইতে কেকয়ী বোধ হয় সর্ব্বাপেক্ষা প্রশংসার পাত্রী। কেকয়ীর উপর আমাদিগের একটা বিজাতীয় ঘৃণা আছে, বটে, যে, কৈকেয়ী সপত্নীপুত্রকে বনে প্রেরণ করেন। কিন্তু তিনি দশরথের সেই আর্ত্তনাদে সেই মৃত্যু যন্ত্রণা দেখিয়াও যখন প্রতিজ্ঞা পালন করাইবার জন্য জিদ্‌ করিয়াছিলেন, তখন অপরে যাহা বলে বলুক, আমি বলি, পতিকে সত্যপালন করাইবার জন্যই—পতি যাহাতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ পাপে পাপী না হয়েন, সেই জন্যই তিনি বীরাঙ্গনার ন্যায়—প্রকৃত ক্ষত্রিয় রমণীর ন্যায় সে অবস্থায় সেরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন। অপরের কথায়—মন্থরার পরামর্শে কৈকেয়ী যে, রামের বনবাস জন্য দশরথকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিয়া লইয়াছিলেন, পরিণাম না বুঝিয়া ক্ষণিক চৈতন্যহীন অবস্থায় পতিকে যে সত্যপাশে বদ্ধ করিয়া লইয়াছিলেন, তজ্জন্য তিনি অবশ্যই নিন্দার পাত্রী। কিন্তু প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করাইবার পর কৈকেয়ী অবশ্যই বুঝিয়াছিলেন, ক্ষত্রিয় রাজার পক্ষে প্রতিজ্ঞা পালন না করা মহাপাপ—মহা কলঙ্ক, সুতরাং যাহাতে জগতে পতির কলঙ্ক না হয়, সেই জন্যই তিনি নিজে কলঙ্কিনী হইতে প্রস্তুত ছিলেন। রামের প্রতি তাঁহার বিজাতীয় বিরাগ থাকিলে, তিনি কখনই রামকে চতুর্দ্দশ বর্ষের পর অযোধ্যার সিংহাসনে বসিতে দিতেন না। ভরত মাতুলালয় হইতে আসিলে, কৈকেয়ী কি বলেন নাই যে, "মহারাজ "প্রতিজ্ঞাপালন" জন্য রামকে বনে পাঠাইয়াছেন এবং রাম "পিতৃসত্য পালন" জন্য বনে গিয়াছেন"। আমরা এই "প্রতিজ্ঞা পালন" শব্দটার প্রতি লক্ষ্য রাখি না।

তাহার পর রাবণের প্রতিজ্ঞা। রাবণের উপর আমাদিগের একটা বিষম জাতিক্রোধ আজিও আছে। কিন্তু আমি বলি, রাবণের সহস্র দোষ থাকিলেও সত্যপালন জন্য বিশেষ প্রশংসার পাত্র। ভগিনী সূর্পনখার কাতর ক্রন্দনে রাবণ ক্রুদ্ধভাবে রামের স্ত্রীকে হরণ করিয়া আনিতে যে, প্রতিশ্রুত হন এবং পরে প্রাণ থাকিতে সীতাকে প্রত্যর্পণ করিবেন না বলিয়া যে, প্রতিজ্ঞা করেন, তিনি আমরণ সেই প্রতিজ্ঞা পালন করিয়া গিয়াছেন।

সোণার লঙ্কা ছারখার হইয়া গিয়াছে, তাঁহার চক্ষের উপর শত শত পুত্র পৌত্র রণশয্যায় শয়ন করিয়াছে, তথাপি তিনি প্রতিজ্ঞা পালনে ক্ষান্ত হন নাই। কেবলমাত্র কুপ্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া সীতাকে হরণ করাই যদি তাঁহার উদ্দেশ্য হইত, তাহা হইলে অবলা সীতা কখনই ত্রিভুবন বিজয়ী রাবণ রাজার হস্ত হইতে সতীত্ব রক্ষা করিতে পারিতেন না। সেই জন্যই বলি যে, রাবণ ধনে প্রাণে হত হইয়াও সত্যপালন করিয়া গিয়াছেন— সীতাকে প্রত্যর্পণ করেন নাই।

তাহার পর মহাভারতে অগণিত প্রতিজ্ঞা পালনের কথা আছে। এস্থলে সেগুলির পুনরুল্লেখ করিবার কোন প্রয়োজন নাই। তবে দুই একটীর উল্লেখ করা আবশ্যক। ভীষ্মের মৃত্যু; প্রতিজ্ঞা পালনের অতি চমৎকার অদৃষ্টপূর্ব্ব নিদর্শন। ভীষ্ম প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, ইহ জীবনে কোন রমণীকে বিবাহ করিবেন না, কোন রমণীর গাত্র স্পর্শ করিবেন না, কোন রমণীর দেহে আঘাত করিবেন না। শিখণ্ডী স্ত্রীবেশে ভীষ্মের প্রতি বাণক্ষেপ করিতে লাগিলেন, ভীষ্ম তাঁহাকে স্ত্রী ভ্রমে তাঁহার বিরুদ্ধে একটীও বাণক্ষেপ না করিয়া, শরশয্যায় জীবন বিসর্জ্জন দিলেন! জগতে এমত প্রতিজ্ঞা পালনকারী কোন মহাবীরের নাম শুনা গিয়াছে কি?

প্রতিজ্ঞাপালন জন্য ভীম খুব প্রশংসা পাইয়া থাকেন, কিন্তু আমি বলি, দুর্য্যোধনের প্রতিজ্ঞা পালনটা কি কম প্রশংসার কথা? দুর্য্যোধন প্রতিজ্ঞা করিলেন, "আমি সূচ্যগ্রবিদ্ধ ভূমি পাণ্ডবদিগকে দিব না।" শেষ তিনি রাজ্যভ্রষ্ট, সর্ব্বস্বান্ত এবং হত হইলেন, কুরুবংশ ধ্বংস হইল, তথাপি তিনি সত্যের অসম্মান করিলেন না! তুমি বলিবে যে, এ প্রতিজ্ঞাটা রাবণের প্রতিজ্ঞার মত নিতান্ত মূর্খতা প্রকাশক, কিন্তু যাঁহারা সত্যের মান জানেন, তাঁহারা ঘটনাক্রমে এরূপ সত্যপাশে বদ্ধ হইলেও প্রাণ দিয়া তাহা পালন করেন।

বৈদিক এবং পৌরাণিক কালের পর আমরা যদি আবার ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টি দান করি, তাহা হইলেও পরবর্ত্তী সময়ে হিন্দুর প্রতিজ্ঞা পালনের জলন্ত নিদর্শন দেখিতে নাই। কর্ণেল টড, রাজস্থানের ইতিবৃত্ত মধ্যে হিন্দুজাতির প্রতিজ্ঞা পালনের অগণিত দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। আমি বাহুল্য

ভয়ে সেই সমস্ত দৃষ্টান্ত এস্থলে উদ্ধৃত না করিয়া, হিন্দুজাতির মধ্যে সত্যের আদর বরাবর কিরূপ চলিয়া আসিতেছে, তাহার প্রমাণ স্বরূপ কয়েকটি বিষম প্রতিজ্ঞার কথা এস্থলে বিবৃত করিতে চাই।

টড লেখেন, মিবারের অধীশ্বর মহারাণা রাজসিংহ বাল্যাবস্থায় পিতৃহীন হইয়া রাজপদে অভিষিক্ত হন। মিবারের অধীনস্থ কোয়ারিয়ো নামক স্থানের সামন্ত সরদার সিংহ, মহারাণা রাজসিংহের সমবয়স্ক এবং প্রিয় মিত্র ছিলেন। একদা মহারাণা কোন বিষয়ে সরদার সিংহের প্রতি প্রীত হইয়া বলিলেন, "আপনি কি পুরস্কার চাহেন বলুন, আমি দিতে প্রতিশ্রুত হইলাম।" সামন্ত এই প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন, "আমি কোয়ারিয়ো প্রদেশ সংলগ্ন লাবা প্রদেশটী প্রার্থনা করিতেছি।" মহারাণা তৎকালে অপ্রাপ্ত ব্যবহার ছিলেন, তাঁহার জননী প্রতিনিধিরূপে রাজ্য শাসন করিতেন। সুতরাং বালক মহারাণা বাক্যবদ্ধ হইয়া, সত্যপালন জন্য মাতার নিকট গিয়া সমস্ত বিদিত করিলেন। দুর্ভাগ্য বশত উক্ত লাবা প্রদেশ তৎকালে মহারাণীর নিজের খাসভূমি স্বরূপ ছিল। সুতরাং তিনি কিছু দুঃখিত হইয়া বলিলেন, "সরদার সিংহ, আমার নিজের ভূমি প্রার্থনা না করিয়া, অবশ্যই অন্য ভূমি প্রার্থনা করিতে পারিতেন। তোমার ইচ্ছা হয়, সমগ্র মিবার রাজ্য তাঁহাকে দেও গিয়া।" জননীর এই উত্তরে মহারাণা নিতান্ত অসন্তুষ্ট হইয়া, তদ্দণ্ডেই প্রতিজ্ঞা করিলেন, "ভাল, আমি তাঁহাকে মিবার রাজ্য দিলাম।" মহারাণা রাজসিংহ, বালক হইলেও প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিবার নহে। তিনি অবিলম্বে সরদার সিংহকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "আমি তিন দিবসের জন্য সমস্ত মিবার রাজ্য আপনাকে প্রদান করিলাম, সেই তিন দিন আপনার যাহা ইচ্ছা করুন। আমার সেলেখানা, আমার অশ্বশালা, আমার সিংহাসন, আমার ধনাগার এবং মন্ত্রীগণ তিন দিবসের জন্য আপনার ইচ্ছাধীন হইল।" মহারাণার প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্য সরদার সিংহ অগত্যা তাহাতে সম্মত হইলেন। তিন দিনের জন্য রাণা পদে অভিষিক্ত হইয়া, সরদার সিংহ নিজ মনোমত সমস্ত দ্রব্য স্বীয় প্রদেশ কোয়ারিয়োতে পাঠাইয়া দিলেন। সেই তিন দিন সরদার সিংহ প্রকৃত রাণার ন্যায় সিংহাসনের এক পার্শ্বে বসিয়া সমস্ত

অমাত্য এবং সামন্ত পরিবৃত হইয়া রাজকার্য্য সমাধা করিতে লাগিলেন। তৃতীয় দিবসে রাণার মাতা লাবা প্রদেশের শাসন সনন্দ স্বীয় পুত্রের নিকট পাঠাইয়া দিলে, চতুর্থ দিবসে সরদার সিংহ রাজ শক্তি পুনরায় মহারাণার হস্তে অর্পণ করিলেন। জগতের কোন জাতীয় বালক রাজাকে এরূপে সত্যের সম্মান রক্ষা করিতে দেখা গিয়াছে কি? এই প্রতিজ্ঞা পালন অধিক দিন নহে, ইংরাজি ১৬৫৩ খৃষ্টাব্দে ঘটে।

রাজপুত বান্ধব টড, আর একটী বিষম প্রতিজ্ঞা পালনের কথা লিখিয়া গিয়াছেন। জয়শলমীর রাজ্যের অন্তর্গত দেবরাউল প্রদেশের সিংহাসনে যে সময়ে বীরবর দেবরাজ অধিষ্ঠিত ছিলেন, সেই সময়ে যশোকর্ণ নামক তাঁহার একজন বলবান বণিক প্রজা ধাররাজ্যে বাণিজ্য জন্য গমন করেন। ধারপতি ব্রজভানু পুঁয়ার, যশোকর্ণকে বলহীন জানিয়া, তাঁহাকে বন্দী করিয়া, সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইয়া শেষে মুক্তি দেন। যশোকর্ণ দেবরাউলে ফিরিয়া আসিয়া, দেবরাজের নিকট সমস্ত বিবৃত করিয়া বলেন যে, "ধারপতি আমাকে বিনা কারণে বন্দী করিয়া অশেষ কষ্ট দিয়াছেন। তিনি আমাকে যে দারুণ নিগ্রহ ভোগ করাইয়াছেন, এই দেখুন, তাহার প্রমাণ স্বরূপ আমার গলদেশে বন্ধনী শৃঙ্খলের চিহ্ন বিরাজমান।" দেবরাজ স্বীয় প্রজা যশোকর্ণের অবমাননায় এতদূর ক্রুদ্ধ হইলেন যে, তদ্দণ্ডেই প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিলেন যে, "আমি এই অবমাননার প্রতিশোধ দান জন্য ধারনগরী জয় না করিয়া জল গ্রহণ করিব না।" এ প্রতিজ্ঞাটী বড় সহজ নহে। ধারনগরী বহু দূরবর্ত্তী, এক দিনে তথায় গমন করিয়া নগর জয় করা অসম্ভব, অথচ যখন প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে, ধার নগরী জয় না করিয়া জল গ্রহণ করিব না, তখন উপায় কি? উপর্য্যুপরি কয়েক দিন নিরম্বু উপবাস অসম্ভব, অথচ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিতে পারিবেন না। মন্ত্রীগণ শেষে পরামর্শ দিলেন যে, "ধার নগরীর অধিকাংশ অধিবাসীই পুঁয়ার-জাতীয়। আপনার সৈন্য দলের মধ্যে অনেক পুঁয়ার বা প্রমার জাতীয় আছে। আপনি মৃত্তিকা নির্ম্মিত একটী কৃত্রিম ধার নগরী প্রস্তুত করুন। এবং আপনার অধীনস্থ পুঁয়ার সৈন্যদল অস্ত্র হস্তে সেই ধার নগরী রক্ষায় নিযুক্ত হউক এবং আপনিও সসৈন্যে তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া সেই ধার নগরী জয়

করিয়া প্রতিজ্ঞা পালন করুন।” অবিলম্বেই সেই মন্ত্রণা মত কার্য্যারম্ভ হইল। দেবরাজের অধীনস্থ পুঁয়ার সৈন্যদল নিজ নিজ অসি ভল্ল হস্তে বীরসাজে সেই কৃত্রিম ধার নগরী রক্ষায় নিযুক্ত হইল। বীরবর দেবরাজ সসৈন্যে তাহাদিগকে আক্রমণ করিলেন। উভয় পক্ষ ঘোরতর যুদ্ধানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। পুঁয়ার সৈন্যদল আপনাদিগের নেতা তেজসিংহ এবং সারঙ্গের অধীনে বিপুল বিক্রমের সহিত সেই কৃত্রিম ধার নগরী রক্ষা করিতে লাগিল। সেই সময়ে একশত বিংশতি জন পুঁয়ার নিহত হইলে, দেবরাজ সেই কৃত্রিম ধারনগরী জয় করিয়া লইলেন। কিন্তু পুঁয়ার সৈন্যদলের পুত্র কন্যাদিগের জন্য বৃত্তি নির্দ্ধারিত করিতে বিস্মৃত হইলেন না।

আপনারা মনে করিতে পারেন, এইখানেই প্রতিজ্ঞা পালন শেষ হইয়া গেল, না, তাহা নহে। কয়েকদিন পরেই দেবরাজ সসৈন্যে গমন পূর্ব্বক ভয়ানক সমরে ধারপতি ব্রজভানুকে নিহত করিয়া, ধারনগরীর দুর্গচূড়ে স্বীয় বিজয় পতাকা উড্ডীন করিয়া প্রকৃতরূপে প্রতিজ্ঞা পালন করেন।

টড, হিন্দুজাতির দৃঢ় প্রতিজ্ঞতার আর একটী নিদর্শন লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। দুর্দান্ত আরঙ্গজেবের শাসনকালে শিরোহী নামক স্থানের সিংহাসনে সুরতান সিংহ অধিষ্ঠিত ছিলেন। সুরতান এরূপ প্রবল প্রতাপান্বিত মহাবীর ছিলেন যে, আরঙ্গজেব বারম্বার চেষ্টা করিয়াও তাঁহার রাজ্য জয় করিতে পারেন নাই, শেষ রাজা যশোমন্ত সিংহের কল্যাণে নাহর খা নামক এক যবন সেনানী গভীর রজনীতে ছদ্মবেশে শিরোহীর দুর্গে প্রবেশ করিয়া নিদ্রিত সুরতানকে ধৃত করিয়া যবন রাজধানীতে আনয়ন করে। রাজ পারিষদগণ, সুরতানকে সম্রাটের সমক্ষে উপনীত করিবার পূর্ব্বে তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন যে, “আপনি সম্রাটকে সমুচিত বিনয় নম্রভাবে অবনত মস্তকে অভিবাদন করিবেন, কারণ সম্রাটসমক্ষে যে কেহই উপনীত হউন না, তাঁহাকে ঐ রূপে অভিবাদন করিতে হয়।” কিন্তু বীরতেজা সুরতান কহিলেন, “আমি জানি যে, আমার জীবন সম্রাটের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিতেছে, কিন্তু আপনারা জানিবেন যে, আমার সম্মান আমার নিজের হাতে; আমি এ জীবনে কখনও কোন মনুষ্যের নিকট মস্তক নত করি

নাই এবং করিবও না।” এই উক্তিতে পারিষদগণ স্তম্ভিত হইলেন। শেষ তাঁহারা কৌশলে সুরতানকে সম্রাট সমক্ষে অবনত মস্তকে উপস্থিত করাইতে উদ্যোগী হইলেন। তাঁহারা সকলে সুরতানকে লইয়া সভাকক্ষের এক পার্শ্বস্থ জানু সমান উচ্চ একটী ক্ষুদ্র দ্বার দিয়া তাঁহাকে সম্রাট সমীপে উপনীত করিতে মনন করিয়া, ভাবিলেন যে, সেই ক্ষুদ্র দ্বার দিয়া প্রবেশ কালে অবশ্যই সুরতানকে অতীব নত মস্তকে সম্রাট সমক্ষে উপস্থিত হইতে হইবে। সুরতান যেমন সাহসী এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, সেইমত চতুর ছিলেন। তিনি পারিষদগণের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া সেই ক্ষুদ্র দ্বার দিয়া সর্ব্বাগ্রে দুইটী পদ প্রবেশ করাইয়া শেষে উন্নত মস্তকে সম্রাট সমক্ষে দণ্ডায়মান হইলেন।

আর্য্যগণের সত্যপ্রিয়তা এবং সেই সত্যপালন সম্বন্ধে এ স্থলে বহুল উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু আমি বলি আর প্রয়োজন নাই। কিন্তু কতকগুলি ব্যক্তি বিজাতীয় আর্য্যগণকে একটী বিষয়ে সত্যপালন সম্বন্ধে দোষ দিয়া থাকেন। শাস্ত্রকারগণ সত্যের সম্মান রক্ষার জন্য বিশেষ উপদেশ এবং কঠোর বিধি সৃষ্টি করিয়া যাইলেও কয়েক স্থলে তাঁহারা আবার সত্যের অপলাপ করিলেও পাপ হয় না, এমত বিধি দিয়াছেন। গৌতম বলেন, “মহা ক্রোধের সময়, সমধিক আনন্দ, ভয়, ক্লেশ এবং দুঃখের সময়, মিথ্যা কথা কহিলে, এবং বালক, অতি বৃদ্ধ, ভ্রান্তলোক, মাতাল, উন্মাদ, মিথ্যাকথা কহিলে তাহার মহাপাপ ঘটে না।” বিজাতীয়দিগের মধ্যে কেহ কেহ এই বিধিটী ধরিয়া ঋষিগণকে মিথ্যাকথার প্রশ্রয়দাতা বলিতে ক্ষান্ত নহেন। কিন্তু কেন যে, এ বিধির সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার অনুসন্ধান করেন না!

জাতীয় চরিত্রের অন্যান্য যে সকল গুণের প্রয়োজন, আমাদিগের পূর্ব্ব পুরুষগণের তাহা ছিল কি না, তাহার বাহুল্য বর্ণনায় আর বিশেষ আবশ্যক দেখা যায় না। জননী জন্মভূমির দায়িত্ব পালনে যে, তাঁহারা প্রাণপণে নিযুক্ত ছিলেন, তাহা “জননী জন্ম ভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী” এই কয়টী কথাতেই প্রকাশমান। আর শৌর্য্য, বীর্য্য, বিক্রম, প্রতাপ, সাহস, বীরত্ব উদ্যম, একতার কথা কে না জানে?

এখন দেখা যাউক, আমাদিগের জাতীয় চরিত্র সম্বন্ধে বিজাতীয়গণ কে কি

বলিয়া গিয়াছেন। অবশ্য, সমস্ত বিজাতীয়ের উক্তি উদ্ধৃত করা এ স্থলে অসম্ভব, তবে দুই চারি জনের কথার উল্লেখ করা গেল।

বিদেশীয়দিগের মধ্যে গ্রীকদিগের সহিতই আমাদিগের প্রথম দেখা শুনা হয়। পাটলীপুত্র বা পাটনার রাজা চন্দ্র গুপ্তের সভায় গ্রীকরাজ সিলিউকস নিকটারের দূত মেগাস্থিনিস আসিয়াছিলেন। তিনি ভারত-ভ্রমণ করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন, "ভারতে চুরি প্রায় ঘটে না এবং ভারতবাসী-গণ সদ্‌গুণ ও সত্যের বিশেষ সম্মান করে।"

এরিয়ান, ভারতের বিভাগীয় রাজ পুরুষদিগের বিষয় উলেখ করিয়া বলেন, "তাঁহারা অধীনস্থ প্রদেশের যে সকল বিষয় রাজাকে জ্ঞাত করেন, তন্মধ্যে একটীও মিথ্যা লেখেন না। বাস্তবিক কোন ভারতবাসীই মিথ্যা-বাদীরূপে অভিযুক্ত হন না।"

ইহার পর চীন পর্য্যটকদিগের সহিত আমাদিগের সাক্ষাৎ। বিখ্যাত পর্য্যটক হিয়োন্থসাং বলেন, 'ভারতবাসিগণ সততা এবং সরলতার জন্য প্রসিদ্ধ। তাঁহারা অন্যায়রূপে ধন গ্রহণ করেন না। বিচারকালে বরং সমধিক দয়া প্রদর্শন করেন। সততাই তাঁহাদিগের শাসনের উজ্জ্বল নিদর্শন।"

অপর চীন পর্য্যটক ফাহিয়ানও এইমত সুমন্তব্য প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, তাহা ইতিহাস পাঠকগণের অবিদিত নাই।

তাহার পর মুসলমানদিগের সহিত আমাদিগের দেখা শুনা হয়। তাঁহারাই বা আমাদিগের জাতীয় চরিত্র সম্বন্ধে কি বলিয়া গিয়াছেন, দেখা যাউক। একাদশ শতাব্দীতে ইদ্রিশি স্বীয় ভূবৃত্তান্ত মধ্যে যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, ইলিয়ট, তাঁহার ভারতীয় ইতিহাস মধ্যে তাহা উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইদ্রিসি লেখেন, "সাধারণ্যে ভারতীয়গণ ন্যায়াধিকারপ্রিয়, এবং তাঁহারা কখনও অন্যায় মূলক কার্য্য করেন না। তাঁহাদিগের বিশ্বস্ততা, সততা, এবং সত্যপালন বিখ্যাত এবং তাঁহারা এই সকল গুণের জন্য এমন প্রসিদ্ধ যে নানাস্থানের লোক আসিয়া তথায় (ভারতে) বাস করিতেছে।"

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মার্কোপলো বলিয়া গিয়াছেন, "ইহারা (হিন্দু) জগতের মধ্যে উৎকৃষ্ট বণিক এবং অতীব সত্যবাদী; পৃথিবীর যে কোন দ্রব্য দাও না কেন, ইহারা কোনমতেই মিথ্যা কথা কহিবে না।"

চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে পাদরী জর্ডানস বলিয়া গিয়াছেন, "উত্তর এবং দক্ষিণ ভারতের লোকেরা সত্যবাদী এবং ন্যায় বিচারের জন্য প্রসিদ্ধ।"

খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে কামালউদ্দীন দূতরূপে কালিকট এবং বিজয়-নগরের রাজসভায় উপনীত হয়েন। ভারতে বিদেশীয়গণ যে নিরাপদে ও নির্ভয়ে যাতায়াত করিতে পারে, তাহা তিনি ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন।

১৭শ শতাব্দীতে সম্রাট আকবরের মন্ত্রী বিখ্যাত আবুলফজল বলিয়া গিয়াছেন, "হিন্দুগণ জ্ঞান, নিঃস্বার্থতা, মিত্রতা, প্রভুভক্তি এবং অন্যান্য অনেক গুণে বিভূষিত বলিয়াই প্রসিদ্ধ।" আর একস্থলে তিনি বলিয়া গিয়াছেন, " হিন্দু জাতি ধার্ম্মিক, মিষ্টভাষী, অপরিচিতের প্রতি সদয়, আনন্দ প্রকৃতি, সুশিক্ষিত, ন্যায়বিচার প্রিয়, কার্য্যদক্ষ, কৃতজ্ঞ, সত্যপ্রিয় এবং সকল কার্য্যেই অসীম বিশ্বাসভাজন। বিপদে পতিত হইলে, তাঁহাদিগের চরিত্র সমুজ্জ্বলরূপে প্রকাশ পায়। তাঁহাদিগের সৈন্যদল, সমরক্ষেত্র হইতে পলায়ন কাহাকে বলে, তাহা জ্ঞাত নহে; কিন্তু সংগ্রামের ফল যেখানে সন্দেহ-যুক্ত হয় বলিয়া বিবেচিত হয়, সে স্থলে তাহারা অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া তাহাদের ঋণ পরিশোধ স্বরূপ রণক্ষেত্রে জীবন বিসর্জ্জন করিয়া থাকে।" আইন আকবরীতে এরূপ অনেক কথা আছে।

তাহার পর ইংরাজদিগের সহিত আমাদিগের আলাপ পরিচয়। বিশপ্ হেবার বলেন, "হিন্দুগণ সাহসী, ভদ্র, বুদ্ধিমান, শিক্ষা এবং উন্নতির জন্য চেষ্টিত, ধীর, শ্রমশীল, পিতা মাতার প্রতি কর্ত্তব্যপরায়ণ, পুত্র-বৎসল, নম্র-স্বভাব, অনুমত, এবং তাঁহাদিগের প্রতি দয়া প্রকাশ করিলে, বা তাঁহাদিগের অভাব মোচন করিলে, তাঁহারা যতদূর কৃতজ্ঞ হন, আমি জগতের কোন জাতিকেই সেরূপ কৃতজ্ঞ হইতে দেখিতে পাই না।"

বিখ্যাত ওয়ারেণ হেষ্টিংস, একস্থলে বলিয়া গিয়াছেন, "হিন্দুগণ নম্র-প্রকৃতি, সদয়স্বভাব, দয়া প্রাপ্ত হইলে সমধিক কৃতজ্ঞ হয়, এবং তাহাদিগের প্রতি অত্যাচার অনিষ্ট করিলে, তাহারা প্রতিহিংসা দানে এত অনগ্রসর যে জগতের কোন জাতিকে সেরূপ দেখা যায় না। তাহারা বিশ্বাসী এবং আইন পালনে তৎপর।"

সার টমাস মনরো বলিয়া গিয়াছেন, "উৎকৃষ্ট কৃষিপ্রণালী, সুবিধা

এবং বিলাসিতার জন্য প্রয়োজনীয় যে কোন দ্রব্য প্রস্তুত করণের ক্ষমতা, লেখা পড়া এবং গণিত শিক্ষার জন্য প্রত্যেক গ্রামে পাঠালয় স্থাপন, সাধারণ্যে অতিথি সৎকার, পরস্পরের মধ্যে দানশীলতা, এবং সর্ব্বোপরি স্ত্রীজাতির প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন যদি সভ্যজাতির পরিচায়ক হয়, তাহা হইলে হিন্দুজাতি য়ুরোপের জাতি সমূহ অপেক্ষা নিকৃষ্ট নহে, এবং যদি সভ্যতা ইংলণ্ড এবং ভারতের মধ্যে বাণিজ্যদ্রব্য স্বরূপ হয়, তাহা হইলে, আমার বিশ্বাস যে, ইংলণ্ড আমদানীর দ্বারা অধিক লাভবান হইবে।”

কর্ণেল টড বলেন “প্রবল সাহস, দেশ হিতেচ্ছা, রাজভক্তি, সসম্মান আচরণ, আতিথেয়তা, এবং সরলব্যবহার,—এই কয়টী মণ্ডনে তাঁহারা বিভূষিত, ইহা বিনা দ্বিরুক্তিতেই স্বীকার করিতে হইবে। জাতীয় চরিত্রের অবনতি জ্ঞাপক যে প্রবঞ্চনা, এবং মিথ্যা-প্রিয়তা অভেদে আসিয়িক জাতির মধ্যে সচ্ছলরূপে দেখিতে পাওয়া যায়, সেই প্রবঞ্চনা এবং মিথ্যা-প্রিয়তা রাজপুত জাতির মধ্যে সাধারণ্যে যে প্রবলরূপে প্রচলিত, আমি তাহা স্বীকার করি না।”

বোম্বাই পরিদর্শন।

বাণ্ডোরা,—কালিঘাট, ভবানীপুর, বরাহনগর প্রভৃতির ন্যায় বোম্বায়ের একটি উপনগর। অনেক পার্শী কর্ম্মচারী ও সওদাগর এইখানে বাস করেন এবং এইখান হইতেই বোম্বায়ে বিষয় কর্ম্ম করিতে প্রতিদিন যাতায়াত করিয়া থাকেন। আমরা Bandora এষ্টেসন হইতে হোমী ভিলা যাইবার সময় প্রতিদিন সন্ধ্যার পরে দেখিতাম, যে পার্শী ভদ্র লোকেরা নিজ নিজ বাটীর সম্মুখের উদ্যানে, স্থানে স্থানে টেবিল চেয়ার পাতিয়া, চার পাঁচজন বন্ধুবান্ধবে মিলিয়া, বিশুদ্ধ আমোদ প্রমোদে কাল অতিবাহিত করিতেছেন। কোন দল দাবা খেলিতেছেন, কোন দল তাশ খেলিতেছেন, কোন দল আহারাদি করিতেছেন, কোন দল সংবাদ পত্র বা সাময়িক পত্রাদি পাঠ

করিতেছেন। সমস্ত দিবস পরিশ্রমের পর এইরূপ সখা সমিতিতে মিলিত হইয়া আহার, বিহার, অধ্যাপনা প্রভৃতি করা, অতি উত্তম নিয়ম। আমাদের দেশে ভদ্র লোকেরা কার্য্য স্থান হইতে গৃহে আসিয়া এরূপ সমিতির নাম শুনিলেই চটিয়া উঠেন, একবার বিছানায় না গড়াইলে, তাঁহাদের চলে না। আমি বলি বৃথা বক্তৃতা বা বৃথা গালগল্প না করিয়া কিছু কিছু আহারাদিও চলে, এরূপ কোন স্থানে মিলিত হওয়া কি বাঞ্ছনীয় নহে? আলস্য বাঙ্গালীর একটি প্রধান দোষ। সে আলস্য যাহাতে তিরোহিত হয়, সমাজ সংস্কারকদিগের তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখাই প্রথম কার্য্য।

এইবার বোম্বাই সহরের কথা বলিতেছি। বোম্বাই সহর আর কলিকাতা সহরের প্রভেদ কি? বোম্বাই অপেক্ষা কলিকাতার রাজ অট্টালিকাগুলি জাঁকাল, কেল্লা জাঁকাল, চৌরঙ্গী জাঁকাল, গঙ্গায় জাহাজের শোভা জাঁকাল, সন্ধ্যার সময় Strand এ গাড়ী ঘোড়ার বাহার জাঁকাল, আনন্দ উদ্যান গুলি জাঁকাল, বোধ হয় বোম্বায়ের নীলাম্বুর মহিমা এবং পার্শী রমণী ও ভাটিয়া রমণীর সৌন্দর্য্য ব্যতীত, কলিকাতার সকল বস্তুই জাঁকাল। কিন্তু এই দুই শোভা দেখিবার জন্য কি বোম্বাই যাওয়া? কলিকাতার কিয়দ্দূর দক্ষিণে যাইলেত সমুদ্র দেখিতে পাওয়া যায় এবং রমণী সৌন্দর্য্যও যে বাঙ্গালায় নাই, তাহাও বলিতে পারি না। তবে বোম্বাই যাইবার প্রলোভন কি? আমি বলি, ভারতবাসীর পক্ষে মহানগরী কলিকাতা দেখিবার যে প্রলোভন নাই, বোম্বাই দেখিবার সে প্রলোভন আছে। কলিকাতায় ভারতবাসীর জাতীয় জীবন দেখিতে পাই না, কিন্তু বোম্বাই গিয়া ভারতবাসীর জাতীয় জীবনের অভ্যুদয় দেখি। ভারতবাসীর পক্ষে ইহা অপেক্ষা আনন্দকর দৃশ্য আর কি আছে? কলিকাতায় গিয়া বাঙ্গালীর দাসত্ব ব্রত দেখিবে, বোম্বাই গিয়া অধিবাসীদের স্বাধীন ব্রত দেখিবে। কলিকাতায় গিয়া ভারতের অবনতি দেখিবে, বোম্বাই গিয়া ভারতের উন্নতির সোপান দেখিয়া আসিবে। কলিকাতায় গিয়া দেখ, ধনী ধনের অসদ্ব্যবহার করিতেছেন, জ্ঞানী জ্ঞানের অসদ্ব্যবহার করিতেছেন, মানী মানের অসদ্ব্যবহার করিতেছেন, বোম্বাই গিয়া দেখ, ধনী জ্ঞানী ও মানী সকলেই শিক্ষা দীক্ষা, ধন মানের সদ্ব্যবহার করিতেছেন। বঙ্গবাসী! তুমিও ইংরাজকে অনুকরণ কর, বোম্বাইবাসীও

ইংরাজকে অনুকরেন। কিন্তু তুমি অনুকরণ করিতে গিয়া আপন অস্তিত্ব লোপ করিয়া ফেল, আর বোম্বাইবাসী অনুকরণ করিয়া আপন অস্তিত্বের গুরুত্ব লাভ করিতেছেন। বাঙ্গালি! আজ শতবর্ষের অধিক তুমি ইংরাজের অনুকরণ করিতেছ! ইংরাজ তোমায় যথেষ্ট শিক্ষা দিয়াছেন; বিশেষত বিগত কয়েক বৎসরের মধ্যে এতই জীবন্ত শিক্ষা পাইয়াছ, যে তাহা তোমার হৃদয় পঞ্জর ক্ষত করিয়া বসিয়া গিয়াছে! তবু তুমি যাহাকে অনুকরণ করিতেছ, তাহার আসল কায একটিও শিখিলে না। তুমি বামন হইয়া একেবারে চন্দ্র ধরিতে প্রয়াস পাও, তুমি তুচ্ছ হইয়া একেবারে মহত্ত্ব লাভ করিতে চাও, তুমি দুইটা বক্তৃতা শুনিয়া, দুই খানা ইতিহাস পড়িয়া, ইউরোপীয় প্রদেশের দুই একটা দলাদলির কথা শুনিয়া, বাঙ্গালাকে সদ্য সদ্য রোমীয় রাজ্য করিয়া তুলিতে চাহ; দাসত্বের শৃঙ্খল গলায় না পরিলে তোমার উদরে অন্য যোটে না, অন্য জাতির বল না লইলে তোমার বাহুতে বল হয় না, অন্যে তোমার ধন না রাখিলে, তোমার ধন রক্ষা হয় না, তবে তুমি এতদিন ইংরাজের অনুকরণ করিয়া কি শিখিলে? তোমার আকিঞ্চনে ধিক্। তুমি কথায় কথায় বল, উদ্যম না করিলে উন্নতি হইবে কিরূপে? আমি বলি তোমার উদ্যমে ধিক্! তোমার হৃদয়ে যদি উদ্যম থাকিত, তাহা হইলে ইলবর্ট বিলের হাঙ্গাম শেষ হইতে না হইতেই, বাঙ্গালার পাড়ায় পাড়ায় দোকান পাট বসিত, পল্লীতে পল্লীতে জয়েণ্ট ষ্টক্ (Joint stock farm) ফারম খোলা হইত, নগরে নগরে মিল্ খোলা হইত, বাঙ্গালী দেশ বিদেশ বাণিজ্যে বহির্গত হইত, মাতৃভূমি শস্যশালিনী হইতেন, বাঙ্গালীর অর্দ্ধেক দুঃখ ঘুচিত, বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনের ভিত্তি রোপিত হইত। যে জাতিকে সূচ্ সূতা ছুরি কাঁচি কাগজ কলম দেশেলাই প্রভৃতি, অতি সামান্য সামান্য বস্তুর জন্যও ভিন্ন জাতির মুখ প্রতীক্ষা করিতে হয়, পাদুকা পরিধেয় গাত্র বস্ত্র প্রভৃতি নিত্য প্রয়োজনীয় বস্তুর জন্যও, যে জাতিকে ভিন্ন জাতির উপর নির্ভর করিতে হয়, পাড়ার পাড়ায় পল্লীতে পল্লীতে নগরে নগরে, সভা সংস্থাপন করিয়া দিবারাত্র বক্তৃতা করিতে করিতে, ইংরাজের দ্বারে দ্বারে কাঁদিয়া বেড়াইলেও, সে জাতির উন্নতি হইবে না; যে জাতি স্বাতন্ত্র্য বুঝে না, অথচ স্বাধীনচেতা ইংরাজের সমকক্ষ হইতে চাহে, সে জাতির মঙ্গল

নাই। বাঙ্গালি! তুমি নিজের প্রতি চাহিয়া দেখ,—তোমার মত দরিদ্র জগতে নাই, তুমি আগে নিজের দারিদ্র্য মোচন কর; দাসত্বে অতি অল্প ধন উপার্জ্জন হইয়া থাকে; বাণিজ্য ব্যতীত দেশের ধন বৃদ্ধি হয় না। গ্রীসের উন্নতি বাণিজ্যে হইয়াছিল; ফিনিসিয়দিগের উন্নতি বাণিজ্যে হইয়াছিল; পর্টুগীজদিগের উন্নতি বাণিজ্যে হইয়াছিল; ইজিপ্টের উন্নতি বাণিজ্যে হইয়াছিল; ফ্রান্সের উন্নতি বাণিজ্যে হইয়াছিল; ইংলণ্ডের উন্নতি বাণিজ্যে হইয়াছিল; আমেরিকার উন্নতি বাণিজ্যে হইয়াছিল; আরব্যের উন্নতি বাণিজ্যে হইয়াছিল; পারশ্যের উন্নতি বাণিজ্যে হইয়াছিল; চীনের উন্নতি বাণিজ্যে; জাপানের উন্নতি বাণিজ্যে। বাঙ্গালীর বাণিজ্য নাই বাঙ্গালীর উন্নতির প্রত্যাশা কোথা? বাঙ্গালীর ক্ষিপ্রকারিতা, উৎসাহ নাই, বাঙ্গালীর উন্নতির প্রত্যাশা কোথায়? বোম্বাই গিয়া দেখ ক্ষিপ্রকারিতা বোম্বাইবাসীর অঙ্গে অঙ্গে ছুটিয়া বেড়াইতেছে, উৎসাহ বোম্বাইবাসীর বদনে ও ললাটে উছলিয়া পড়িতেছে। এ পার্থক্যের কারণ অনুসন্ধান করিয়া দেখ, বোম্বাইবাসী জাতীয় স্বাতন্ত্র্য বুঝিয়াছে, তাই আজ তাহাদের এ মূর্ত্তি। যাঁহারা সাম্যবাদী তাঁহাদের স্বাতন্ত্র্য কথাটি ভাল লাগিবে না, কিন্তু আমি বলি, যে, বর্ত্তমান হিন্দুর পক্ষে সাম্যবাদী হওয়া যুক্তিসিদ্ধ কিনা তাহা তর্কের বিষয়। কিন্তু সে তর্ক করিতে আমি এখন প্রস্তুত নহি।

কেহ কেহ বলেন যে বোম্বায়ের এত উন্নতির প্রধান কারণ, যে পশ্চিম ভারতের লোকেরা মুসলমানগণ কর্ত্তৃক ভারতে অন্যান্য জাতির ন্যায় বশীকৃত হয় নাই। কিন্তু তাহা হইলেও, বুদ্ধিজীবী বাঙ্গালী ইংরাজের কেবল হাঁচিটি, মুচ্কে হাস্য করাটি, এবং সঙ্কুচিতে মস্তক চুলকানটি অনুকরণ করিতেছেন, কিন্তু ইংরাজের সারত্বটুকু অনুকরণ করেন না, করিতে জানেন না; সেই জন্যই বাঙ্গালীর দুর্দ্দশা ঘোচে না। বাঙ্গালীর প্রথম উদ্যম সাহেবী পোসাক। ইংরাজি ভাল করিয়া শিখুন আর না শিখুন, পোসাকটা যতদূর ঘটিয়া উঠে, সাহেবি করিতেই হইবে। দ্বিতীয় সাহেবী ভাষায়; পিতা পুত্রকে পত্র লিখিতেছেন "My dear son" পুত্র পিতাকে পত্র লিখিতেছেন, "My dear father" এবং আমি শুনিয়াছি, যে আজকাল কোন কোন বাঙ্গালী তাঁহাদের স্ত্রীর নিকট হইতে "My dear

হনুমান" প্রভৃতি সম্বোধনে লিখিত, পত্রাদি পাইলে চরিতার্থ হইয়া থাকেন। ইংরাজী ভাষায় বাঙ্গালীর রীতিমত শিক্ষা প্রয়োজন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু আমি বলি, পড়িবার সময় ইংরাজী পড়, কিন্তু লিখিবার সময় বাঙ্গালায় লেখ। তাই বলিয়া আমি ইংরাজি লেখা অভ্যাস করিতে নিষেধ করিব না। কিন্তু তাহার সময় আছে। আপনার পিতা মাতা, ভাই ভগিনী, পত্নী ও বন্ধুবর্গের নিকট, বিজাতীয় ভাষা কেন? বাঙ্গালীর তৃতীয় সাহেবি "মিটীং ও বক্তৃতা"। মিটীং ও বক্তৃতার উদ্দেশ্য ভাল তাহার সন্দেহ নাই, কিন্তু মিটিং করিয়া, বক্তৃতা করিয়া, কাহাকে বুঝাইতে চাও? যদি স্বদেশীয়কে বুঝাইতে চাও, তবে ইংরাজি কেন? যদি গবর্ণমেণ্টকে বুঝাইতে চাও, তবে বক্তৃতা কেন? যাহা গবর্ণমেণ্টকে বুঝাইতে চাও, তাহা ইংরাজীতে লিখিয়া গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন কর; কিন্তু মনে স্থির জানিও, যে, যে স্থানে গবর্ণমেণ্টের স্বার্থ আছে, সে স্থলে আবেদন "রদ্দি কাগজ জাৎ" হইবে। তবে কি মিটিং বা বক্তৃতার প্রয়োজন নাই? আমি বলি, আবেদন করা অপেক্ষা মিটিং ও বক্তৃতার প্রয়োজন আছে। কিন্তু সে প্রয়োজন কি? সে প্রয়োজন প্রথমে বাঙ্গালীর জাতীয় ভাব প্রতিষ্ঠা। "জাতীয়ভাব" কাহাকে বলি? বাঙ্গালীর প্রথমে বুঝিতে হইবে, বাঙ্গালী কোন্ জাতি, তাহার পর বুঝিতে হইবে, কি করিলে পূর্ব্বের মত হইব। যাঁহারা ভারতের প্রাচীন ইতিহাস পড়িয়া বুঝেন না, যে প্রাচীন হিন্দু জাতি বুদ্ধি, বিদ্যা, বীর্য্যে ও ধর্ম্মে আধুনিক পৃথিবীর কোন জাতি অপেক্ষা ন্যূন ছিলেন না, তাঁহারা যেন শিক্ষিত বলিয়া ভাণ না করেন। আর যাঁহারা একথা স্বীকার করেন, তাঁহাদের বলি যে, ইংরাজের বুদ্ধি বিদ্যা, উৎসাহ, সাহস, বীর্য্য, ক্ষিপ্রকারিতা প্রভৃতি দেখিলে কি মনে করিব? সাহেব হইতে ইচ্ছা করিব? না, সেই জ্বলন্ত শিখার ন্যায় প্রাচীন হিন্দু হইতে ইচ্ছা করিব। 21798

যদি হিন্দু হইতে ইচ্ছা করি, তবে তাঁহাদের মত প্রবল উৎসাহ চাই, গভীর বিশ্বাস চাই, দৃঢ় অধ্যবসায় চাই। কিন্তু আধুনিক বঙ্গবাসীর তাহা কই? উদ্যম আছে প্রকৃত উৎসাহ কই? অধ্যবসায় কই? আমি বোম্বাই ও পুনা প্রভৃতি স্থানে দেখিলাম, কি মহারাষ্ট্রীয়, কি গুজরাটী, কি পার্শী, কি অন্য জাতীয়, কি বালক, কি যুবা, কি প্রৌঢ়,

কি বৃদ্ধ, সকলেই যেন জীবনে পরিপূর্ণ, তাঁহাদের হাতে যেন সর্ব্বদাই এত কাজ রহিয়াছে, যে দিবারাত্র পরিশ্রম করিয়াও শেষ হইতেছে না। আর এখানে বাঙ্গালীর দিকে চাহিয়া দেখিলে বোধ হয়, যেন ইহাদের হয় সব কায শেষ হইয়া গিয়াছে, নয় যেন নির্জীব দাসত্ব ব্যতীত ইঁহারা আর কোন কাজ করিতেই জগতে আসেন নাই। এমন কি বোম্বাই প্রভৃতি স্থানের বৃদ্ধ লোকদিগের ও যে উৎসাহ ও ক্ষিপ্রকারিতা দেখিয়াছি বঙ্গদেশের পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রেবরেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাক্তার রাজেন্দ্র লাল মিত্র, বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, ও আর জন কয়েক যুবা পুরুষ ব্যতীত অতি অল্প লোকেরই তাহা দেখিতে পাই।

সাহেবী জিনিষটা যে একেবারেই মন্দ, তাহা আমি বলি না, কিন্তু যাহাকে সাধারণত সাহেবী কহে, তাহার সকলটা সাহেবী নহে। হিন্দুরও সে সকল ছিল। সাহেবের উৎসাহ, উদ্যম, ক্ষিপ্রকারিতা—কি হিন্দুর ছিল না? আমরা সে সকল শিক্ষা করি না কেন? বোম্বাই বাসীর ত এ সকল যথেষ্ট আছে; কিন্তু কয় জন বোম্বাইবাসী সাহেবের পোষাক করেন? বা কয় জন আপন মাতৃভাষায় অনাদর করেন?

বোম্বায়ের অধিবাসীদিগকে এই কয় শ্রেণীতে বিভক্ত করিব।

বৌদ্ধ ও জৈন,	...	১৭,২১৮	পার্শী,	...	৪৮,৫৯৭
ভাটিয়া,	...	৯,৪১৭	ইহুদি,	...	৩,৩২১
ব্রাহ্মণ,	...	৩৫,৪২৮	দেশীয় খ্রীষ্টান,	...	৩০,৭০৮
ধর্ম্মচ্যুত হিন্দু,	...	৪,০৭,৭১৭	ফিরিঙ্গি,	...	১,১৬৮
অন্যজাতীয় হিন্দু,	...	৪৯,১২২	ইউরোপীয়,	...	১০,৫৫১
মুসলমান,	...	১,৫৮,০২৪	চিনবাসী,	...	১৬৯
আফ্রিকার নিগ্রো,	...	৬৮৯			
				সর্ব্বশুদ্ধ	৭,৭৩,১৯৬

জৈনদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণ এবং ভাটিয়াও আছে, উহারা মৎস্য ও মাংস আহার করেন না। জৈন ধর্ম্ম অনেকটা বৌদ্ধ ধর্ম্মের মত। ইহারাও মূর্ত্তির উপাসনা করিয়া থাকেন, ইঁহাদিগের উপাস্য মূর্ত্তি অনেকটা বৌদ্ধদিগের উপাস্য মূর্ত্তির ন্যায়। ইঁহাদের মধ্যে জাতিভেদ নাই। আত্মার দেহান্তর প্রাপ্তিতে ইঁহাদের দৃঢ় বিশ্বাস, সেই জন্যই জীব হত্যা করেন না। ব্যব-

সাই ইহাদের উপজীবিকা,—ইহারা দাসত্ব করিতে প্রায় জানে না। ইঁহাদের মধ্যে প্রায় সকলেই ধনী। ইঁহারা ভারতের নানাস্থানে, বহু অর্থব্যয় করিয়া, উপাস্য দেবের মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। মন্দির গুলি ও উপাস্য দেবমূর্ত্তির অঙ্গ বিস্তর স্বর্ণ ও জহরত দিয়া সুশোভিত করা আছে, কাটীওয়ারে গির্ণার ও পালিটানা নামক স্থানে, এবং "আবু" পর্ব্বতে ইহাদের অতি বিখ্যাত উপাস্য মন্দির আছে। আবু পর্ব্বতে যে উপাস্য মন্দির আছে, শুনিয়াছি, তথায় ১,৪৪৪ মণ এক স্বর্ণ মূর্ত্তি আছে, উহার মূল্য প্রায় সাড়ে আট কোটী টাকা।

বোম্বায়ের ব্রাহ্মণদিগকে সাধারণত দুই ভাগে বিভক্ত করিব। এক দল বিষ্ণু উপাসক,—এক দল শিব উপাসক। শৈবেরা সকলেই ললাটে চন্দন রেখা, একদিক হইতে অন্য দিক পর্য্যন্ত লেপন করেন এবং বৈষ্ণবেরা উর্দ্ধভাবে চন্দন রেখা লেপন করেন। বোম্বায়ে বিষ্ণু উপাসকই অধিক। ভাটিয়ারা অনেকেই কৃষ্ণ উপাসক এবং ইঁহারা ইহাদের ধর্ম্মগুরুকে অবতারের ন্যায় জ্ঞান করেন। পূর্ব্বে ইহারা অতি আনন্দ সহকারে, স্ত্রী ও কন্যা গুরুকে উৎসর্গ করিয়া শুদ্ধ করিয়া লইতেন, এক্ষণে সে জঘন্য প্রথা আছে কি না তাহার সন্ধান করিতে পারি নাই। প্রায় বিংশতি বৎসরের অধিক হইল বোম্বায়ে একটী মোকদ্দমায় ইহাদের এই প্রথা প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছিল। ইঁহারা গণপতিরও উপাসনা করিয়া থাকেন। শৈবদল শিবের উপাসক বটে, কিন্তু শিবপত্নী কালীপূজায় অধিকতর ভক্ত। মধ্য ও পশ্চিম ভারতে ভবানীর উপাসকই অধিক। প্রসিদ্ধ ঠগি দলের সহায় ভবানী নিজে হইতেন বলিয়া প্রবাদ আছে।

"বেনে" বলিয়া যাঁহারা পরিচয় দেন, তাঁহাদের মধ্যে ভাটীয়াই অধিক। ধন সঞ্চয় করাই ইহাদের জীবনের উদ্দেশ্য; যিনি ক্রোড়পতি, এক পয়সা ব্যয় করিতে হইলে তিনিও কুণ্ঠিত হয়েন। Ovington সাহেব যিনি ১৬৬৯ খ্রীষ্টাব্দে ভারত ভ্রমণ করিয়াছিলেন, তিনি ভাটীয়াদিগের সম্বন্ধে এইরূপ তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন;—"They are mainly addicted to prosecute their temporal interest, and the amassing of treasure and therefore will fly at the securing of a pie, though they can

command whole lakhs of rupees. I know those amongst them, computed to be worth £1,000, 000, whose service, the prospect of six pence advantage, will command, to traverse the whole city of Surat."

ভারতের প্রাচীন ইতিহাস লেখক হউল নামক জনৈক ইউরোপীয় বলেন যে গুজরাটে বেণিয়াদিগের সম্বন্ধে এই রূপ প্রবাদ আছে "It took three Jews to make one Chainaman and three Chainamen to make one Banian." যিনি যাহাই বলুন, ভিন্ন দেশের সহিত ভারতের প্রাচীন ব্যবসায় বাণিজ্য যে বেনিয়াদিগের দ্বারায় চালিত, তাহার আর সন্দেহ নাই। প্রাচীন কালে পারশ্য উপসাগরের উপকূলে ও ভারত সমুদ্রের উপকূলে যে সকল জাতি ছিল, তাঁহাদের সহিত এই বেণিয়ারাই যে ব্যবসা বাণিজ্য করিতেন, সে কথা একরূপ স্থির হইয়াছে। আজিকালি, আফ্রিকা ও আরবের পূর্ব্ব উপকূলে, প্রধানত বোম্বায়ের এই বেণিয়াদিগের দ্বারাই বাণিজ্য চলিতেছে; জাঞ্জিবার, মসকট ও অন্যান্য স্থানে ইঁহাদের বিস্তর এজেণ্ট আছে। বেণিয়ারা অধিকাংশ জৈন ধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া কোন প্রকার জীব হিংসা করেন না। বোম্বায়ে প্রায় সর্ব্বদাই দেখিতে পাওয়া যায়, যে বেণিয়ারা রাস্তার ধারে ও বাটীর প্রাচীরের পার্শ্বে পীপীলিকাদির আহারের জন্য চিনি ছড়াইতেছেন। পীড়িত, অথর্ব্ব ও নিরাশ্রয় সকল প্রকার পশুর চিকিৎসা ও প্রতিপালন জন্য বোম্বায়ের স্থানে স্থানে ইঁহারা পশুশালা নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। এই সকল পশুশালাকে "পীঁজরাপোল" কহে।

মাড়োয়ারীদের মহাজনী ও তেজারতি ব্যবসা। বোম্বাই ও পশ্চিম ভারতের অধিকাংশ লোকেই এই মাড়োয়ারীদিগের নিকট হইতে টাকা কর্জ্জ লইয়া বিষয় কর্ম্ম নির্ব্বাহ করেন।

বোম্বায়ে সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট অধিবাসীদিগের মধ্যে মৎস্য ব্যবসায়ী, কুলী ও মুটে মজুরই অধিক। ইহারা এই দ্বীপের, গুজরাটের ও দাক্ষিণাত্যের আদিম নিবাসী বলিয়া বোধ হয়।*

* বোম্বায়ে অতি প্রাচীনকালে আফ্রিকার নিগ্রোদিগকে আনা হইত এবং তাহারা দাসের ন্যায় ক্রীত ও বিক্রীত হইত। নীচলোকদিগের মধ্যে ইহাদের বংশসম্ভূত দুই এক জন, সন্ধান করিলেও পাওয়া যাইতে পারে।

আত্মতীর্থম্।

আত্মৈব পরমং তীর্থং মুক্তিক্ষেত্রং সনাতনম্।
ত্রিতাপহারিণী যত্র ভক্তি-গঙ্গা বিরাজতে॥ ১॥

আত্মাই মুক্তির ক্ষেত্র তীর্থ সনাতন,
কিবা আর আছে তীর্থ, এ তীর্থ যেমন?
ত্রিতাপহারিণী যথা পতিত পাবনী,
ভক্তিরূপে বিরাজিত গঙ্গানারায়ণী। ১।

ন দেবো বিদ্যতে মন্ত্রে ন তন্ত্রে ন ব্রতেঽপি বা।
ন তীর্থে প্রতিমায়াং বা ভাবগম্যোহি কেশবঃ॥ ২॥

মন্ত্রে তন্ত্রে জপে তপে ব্রতে প্রতিমায়,
কিম্বা তীর্থে কভু কেহ নাহি পায় তাঁয়;
ভকত-বৎসল হরি ভকত জীবন,
কেবল ভকতি দিলে মিলে সেই ধন॥ ২॥

ভক্তিহীনা তু যা বুদ্ধিঃ শাস্ত্র মাত্রানুশীলিনী।
পরমার্থং ন জানাতি দর্ব্বী পাক-রসং যথা॥ ৩॥

ভক্তি নাই, শুধু করে শাস্ত্র আলোচন,
হেন বুদ্ধি—নাহি বুঝে ব্রহ্ম সনাতন;
দর্ব্বী দেখ! নাড়ে চাড়ে সুমিষ্ট ওদন, (১)
তথাপি সে নাহি জানে মিষ্ট যে কেমন। ৩।

ভবেঽস্মিন্ জন্মমরণরোগশোকাদ্যুপপ্লুতে।
কেবলং ভগবদ্ভক্তি-র্মুক্তিক্ষেত্রং হি দেহিনাম্॥ ৪॥

---

(১) 'দর্ব্বী'—হাতা, তাড়ু, খুন্তী, ইত্যাদি। 'সুমিষ্ট ওদন'—মিষ্টান্ন।

জন্ম, মৃত্যু, জরা, রোগ, শোক নিরন্তর,
সমস্ত সংসার তাহে হের! জরজর;
একমাত্র ভক্তি সেই দেব নারায়ণে,
জীবের মুক্তির ক্ষেত্র জানিবে ভুবনে। ৪।

রে মূঢ়! মজ্জ শততীর্থ জলেষজস্রম্,
ধৌতং ততঃ খলু ভবেদ্রজ এব বাহ্যম্।
নৈবাত্মতীর্থ পরিষেবণ মন্তরেণ
মালিন্য মান্তর মপৈতি ন নিবৃ'তি র্বা॥ ৫॥

রে মূঢ়! সহস্র তীর্থে করহ মজ্জন,
বাহিরের ধূলা তাহে হইবে ক্ষালন;
আত্মতীর্থে নাহি যদি কর যোগ-স্নান,
যাবে না মনের রজ, পাবে না নির্ব্বাণ। ৫।

পরিভ্রমসি কিং দূরং তুচ্ছকাচজিঘৃক্ষয়া।
মনঃ! কিং নাভিজানীষে গৃহে চিন্তামণিং তব॥ ৬॥

কাচের আশায় দূরে ভ্রম কেন মন!
চিন না কি গৃহে তব চিন্তামণি ধন? ৬।

তীর্থে তীর্থে পরিভ্রম্য মূঢ়াস্তাম্যন্তি মুক্তয়ে।
আত্মৈব পরমং তীর্থং যত্র মুক্তিময়োহরিঃ॥ ৭॥

তীর্থে তীর্থে মুক্তি আশে করিয়া ভ্রমণ,
বৃথাই অশেষ ক্লেশ পায় মূঢ়গণ;
আত্মাই পরম তীর্থ জানিবে নিশ্চিত,
মুক্তিরূপে নারায়ণ যথা বিরাজিত। ৭।

ক্ষিপন্তি ভস্মনি ঘৃতং নানাযজ্ঞপরা জনাঃ।
আত্মাগ্নৌ ভক্তি হুতিভিঃ প্রীয়তে পরমেশ্বরঃ ॥ ৮ ॥

নানাবিধ যাগযজ্ঞ করিয়া সাধন,
ভস্মেই কেবল ঘৃত ঢালে মূঢ়গণ;
আত্মাই পবিত্র বহ্নি, আহুতি ভকতি,
প্রীত হন নারায়ণ যাহে বিশ্বপতি। ৮।

ক্ষুদ্র জীব! মহাযজ্ঞং কৃষ্ণ প্রেম হুতাশনে।
কৃষ্ণায় নম ইত্যুক্তা নিক্ষিপাত্মান মাহুতিম্ ॥ ৯ ॥

রে জীব! একান্ত যদি লভিবে নির্ব্বাণ,
তবে এই মহাযজ্ঞ কর অনুষ্ঠান,
যিনি যজ্ঞেশ্বর হরি, তাঁরি প্রেমানলে,
আত্মাকে আহুতি দেও 'কৃষ্ণায় নমঃ' বলে। ৯।

সর্ব্ব তীর্থাণি তত্রৈব সর্ব্বসিদ্ধর্ষি যোগীনঃ।
আবির্ভবন্তি যত্রৈব হরের্নামানুকীর্ত্তনম্ ॥ ১০ ॥

ভক্তবৃন্দে প্রেমানন্দে হইয়া মগন,
যেই স্থানে হরি নাম করে সংকীর্ত্তন;
যোগী ঋষি সিদ্ধ যত, যত তীর্থ স্থান,
সেই স্থানে সকলেরি হয় অধিষ্ঠান। ১০।

আত্মা কাশী মহাতীর্থং মুক্তিক্ষেত্রং সনাতনম্।
নিত্যং সন্নিহিতো যত্র রাজরাজেশ্বরঃ শিবঃ ॥ ১১ ॥

ভক্তের আত্মাই কাশী তীর্থ সনাতন,
কি আছে মুক্তির ক্ষেত্র এ তীর্থ যেমন?
নিত্য বিরাজেন যথা জগতের গুরু,
রাজ রাজেশ্বর সেই শিবকল্পতরু। ১১।

শ্রীক্ষেত্রং পরমং তীর্থং ভক্তস্য হৃদয়ং হি তৎ।
মুক্তিদাতা স্বয়ং যত্র জগন্নাথো বিরাজতে॥ ১২॥

শ্রীক্ষেত্র পরম তীর্থ ভকতেরি চিত ;
মুক্তিদাতা জগন্নাথ যথা বিরাজিত। ১২।

হৃদেব ভক্ত হৃদয়ং গয়াতীর্থং বিমুক্তিদম্।
পাদপদ্মং বিনিদধে যত্র দেবো গদাধরঃ॥ ১৩॥

গয়াতীর্থ মোক্ষ ধাম ভক্তেরি হৃদয় ;
গদাধর পাদপদ্ম নিত্য যথা রয়। ১৩।

নিত্যানন্দময়ো যত্র হৃদয়ে রমতে হরিঃ।
সর্ব্বতীর্থোত্তমং তদ্ধি সর্ব্বতীর্থোত্তমং হি তৎ॥ ১৪॥

যে হৃদয়ে নিত্যানন্দ হরির বিহার ;
সর্ব্ব তীর্থ সার সেই সর্ব্ব তীর্থ সার। ১৪।

যল্লব্ধ্বা ন শোচন্তি তদ্ ব্রহ্ম পরমং যয়া।
সম্পদ্যতে নমস্তস্যৈ ভক্তয়েঽচিন্ত্যশক্তয়ে॥ ১৫॥

যাঁহাকে লভিলে আর শোক নাহি রয়,
সেই ব্রহ্ম যাহার প্রসাদে লাভ হয় ;
অচিন্ত্য শকতি সেই ভকতির পদে,
নমস্কার বার বার করি পদে পদে। ১৫।

শ্রীতারাকুমার শর্ম্মা।

সংসার আশ্রম।*

(সমালোচনা)

উপন্যাস মাত্রই এক একটি কৃত্রিম ও ক্ষুদ্র জগৎ। ভগবানের এই প্রত্যক্ষ অনন্ত জগতের অনুকরণেই ইহা সৃজিত হইয়া থাকে। এই অনুকরণ সাধারণত দুই প্রকারের—স্থূলের অনুকরণ ও মূলের অনুকরণ। স্থূলের অনুকরণে, অনুকরণের বিষয়টী সমষ্টিভাবে সমগ্ররূপে অনুকৃত হইয়া থাকে—মূলের অনুকরণে অনুকরণের বিষয়টি ব্যষ্টিভাবে আংশিকরূপেই অনুকৃত হয়। এক প্রকারের অনুকরণের আসলটা জগতে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি—অন্য প্রকারের অনুকরণের আসলটা কোন স্থানেই সমষ্টিভাবে একত্রিত দেখিতে পাই না; কিন্তু সেই আসলটার অংশ প্রত্যংশ আমরা অপরাংশের সহিত অযুক্তাবস্থায় অন্যত্র বর্ত্তমান দেখিতে পাই। একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা কথাটি বুঝাইতেছি। এই যে শারদীয় দুর্গোৎসবের সময় দেবীপ্রতিমা গঠিত হইয়া থাকে, ইহাতেই আমরা উপরোক্ত দ্বিবিধ অনুকরণ দেখিতে পাই। এই যে অতসীবর্ণ পুষ্পাভা ত্রিনয়না দশভুজা মূর্ত্তি উহা আমাদের পূর্ব্ব বর্ণিত মূলের অনুকরণে গঠিতা হইয়াছে। সুন্দরী রমণীর প্রায় সমগ্র অংশ আসলরূপে গ্রহণ করিয়া অন্যত্র হইতে অতসী পুষ্পের বর্ণ অতিরঞ্জনে তিনটী চক্ষু, দশখানি হাত গড়িয়া দিব্য এক দেবী প্রতিমা কল্পিতা হইল। মানুষ ঠিক মূল সৃষ্টি করিতে পারে না সত্য, কিন্তু প্রত্যক্ষীকৃত মূলের অপ্রত্যক্ষীকৃত সংযোগ কল্পনা বা সৃষ্টি করিতে সক্ষম। এই যে দেবী প্রতিমার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিলাম, ইহাতে অবশ্য অতিরঞ্জন কিছু অস্বাভাবিক অনুমিত হইবে। কিন্তু এই অনুকরণে স্বাভাবিক অথবা স্বাভাবিক-বলিয়া-প্রতিপন্ন-হইবার-যোগ্য পদার্থও সৃষ্ট হইয়া থাকে। আবার

---

* সংসার আশ্রম—গার্হস্থ্য উপন্যাস।
শ্রীহারাণচন্দ্র রক্ষিত প্রণীত ও ১৯নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কলিকাতা হইতে শ্রীবিপিনবিহারি রক্ষিত কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য বার আনামাত্র।

এই যে দেবীপদতলে মহিষ মূর্ত্তিটি দেখিতে পাও, উহা আমাদের পূর্ব্ব কথিত স্থূলানুকরণে স্বজিত। যেমন জীবিত মহিষের আকার বা যেমন মৃত মহিষের আকার—ঠিক সেই রকমই উহার আকার গঠনের চেষ্টা হইয়াছে। যেমন এই প্রতিমা সম্বন্ধে দেখিতে পাইলে, তেমনই উপন্যাসের চরিত্র ও ঘটনা সম্বন্ধেও দেখিতে পাইবে। এক প্রকার উপন্যাসে বর্ণিত হয়, যাহা আছে তাহাই—অন্য প্রকার উপন্যাসে বর্ণিত হয়, যাহা হইতে পারে তাহাই। উদাহরণ রূপে দুই খানি উপন্যাস তুলনা কর। "স্বর্ণলতা" ও "দেবী চৌধুরাণী"। স্বর্ণলতা স্থূলানুকরণ-প্রধান উপন্যাস। ইহাতে আমাদিগের সচরাচর প্রত্যক্ষীকৃত একটি হিন্দু একান্নবর্ত্তী পরিবারের চিত্র অনুকৃত হইয়াছে। একেবারে যে ঠিক হইয়াছে—এরূপ নহে। তাহা হইলে ইহাকে চলিত কথায় ইতিহাসই বলিতাম। অরণ্যজাত বৃক্ষগুল্মাদি যত্নে উদ্যান মধ্যে রোপিত করিলে, যেরূপ পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়, প্রকৃত ঘটনায় ও চরিত্রে, এবং স্বর্ণলতার ঘটনা ও চরিত্রেতে সেইরূপ পার্থক্য পরিদৃষ্ট হয়। তাই "স্বর্ণলতাকে" স্থূলানুকরণে সৃষ্ট উপন্যাস বলিয়া আমরা অভিহিত করিলাম। এদিকে "দেবীচৌধুরাণী" প্রধানত মূলানুকরণে গঠিত উপন্যাস। ইহার নায়িকা প্রফুল্ল এ জগতে গ্রন্থকার কখনও দেখিতে পান নাই। কিন্তু তিনি যাহা দেখিয়াছেন, তাহা হইতেই এরূপ আদর্শ চিত্রের সম্ভাবিতা অনুমান করিয়া তিনি এই চিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন। দেবী চৌধুরাণী প্রফুল্ল—যাহা আছে, তাহা নহে; যাহা হইতে পারে ও হইলে ভাল হয় তাহাই। যেরূপ পূর্ব্ব কথিত অনুকরণে এখনকার বর্ণিত অনুকরণের কিছু না থাকিলে, উপন্যাস ইতিহাস হইয়া পড়ে—সেইরূপ এখনকার কথিত অনুকরণে পূর্ব্ব কথিত অনুকরণের ভাগ অধিক না থাকিলে, তাহা আরব্য উপন্যাস হইয়া পড়ে। ফলত উৎকৃষ্ট উপন্যাস মাত্রেই দ্বিবিধ প্রকারের অনুকরণ থাকে, তবে উপন্যাসের যাহা প্রাণস্বরূপ, তাহা যে শ্রেণীর অনুকরণে গঠিত হয়, উপন্যাসকে সেই শ্রেণীর অনুকরণ প্রধান বলিয়া অভিহিত করা হয়।

ভগবানের অপূর্ব্ব সৃষ্টি এই অসীম জগতের সমস্ত কেহ অনুকরণ করিতে সমর্থ হয় না। অংশ মাত্রই উপন্যাসে অনুকৃত হইতে পারে। তবেই

এই অনুকরণ সম্বন্ধে উপন্যাসকারের প্রথম প্রশ্ন—ইহার কোন অংশ তিনি অনুকরণ করিবেন? ইহার কি কি তিনি অনুকরণ করিবেন? এই বিষয় নির্ব্বাচনই গ্রন্থকারের সর্ব্ব প্রথম কার্য্য।

এই বিষয় নির্ব্বাচনের সঙ্গে সঙ্গে আর এক কথাও আসিয়া পড়ে—কিসের জন্য এ নির্ব্বাচন? উপন্যাসের মূল উদ্দেশ্য কি?

সম্প্রতি যে সকল উপন্যাস আমরা সচরাচর দেখিতে পাই, সেই সকলের বিশ্লেষণ করিলে প্রধানত দুই প্রকারের উদ্দেশ্য বিলক্ষিত হয়। আমরা তাহা নিম্নে নির্দ্দেশ করিতেছি।

এক প্রকার উপন্যাসের উদ্দেশ্য কেবলমাত্র সৌন্দর্য্য সৃষ্টি। ইহাকে আমরা চলিত কথায় "সকের' উপন্যাস" বলিতে পারি। যশের কথাটা ছাড়িয়া দিলে—অনুকরণই এই শ্রেণীর উপন্যাসের উদ্দেশ্য। অনুকরণে সৌন্দর্য্য প্রদর্শন অর্থাৎ যাহা অনুকৃত হইল তাহা আসলের ন্যায় অবিকল হইল অথবা তাহা জগতের প্রত্যক্ষীভূত অংশমাত্র সংগ্রহে অপ্রত্যক্ষীকৃত সৌন্দর্য্যেরূপে কল্পিত হইল, ইহাই প্রদর্শনের জন্য এই শ্রেণীর উপন্যাস সৃষ্ট হইয়া থাকে। এই উপন্যাস লিখিবার সময়ে গ্রন্থকারের মনোমধ্যে প্রধান লক্ষ্যই থাকে নিজের বা পাঠকবর্গের চিত্তরঞ্জন। এই উপন্যাসে অন্য কোন উদ্দেশ্য গৌণভাবে সাধিত হইলেও মুখ্যভাবে লোকের চিত্ত-রঞ্জনই ইহার লক্ষ্য। প্রদর্শন বা সৃষ্টি দ্বারা লোকের মন বিমোহিত করা বা নিজে মুগ্ধ হওয়াই ইহা প্রণয়নের উদ্দেশ্য। এই প্রকার উদ্দেশ্যেই আয়েষা ও কপালকুণ্ডলা প্রভৃতি সৃষ্ট হইয়াছে।

অন্য প্রকারের উদ্দেশ্য—যশের কথা ছাড়িয়া দিলে, মুখ্যত জগতের বা সমাজ বিশেষের হিতসাধন। এই প্রকার উদ্দেশ্যে লিখিত উপন্যাসে গ্রন্থকারের প্রথম লক্ষ্য বা নির্ব্বাচনের মূল সূত্রই থাকে, জগতের বা সমাজ বিশেষের হিতসাধন। গৌণভাবে প্রথমোক্ত উদ্দেশ্যও ইহাতে অবশ্যই থাকিবে। কিন্তু তাহা উদ্দেশ্য সাধনার্থ অবলম্বিত উপায় মাত্র।

এই হিতসাধন বিবিধ প্রকারে হইতে পারে। দোষভাগ দেখাইয়া তজ্জন্য পাঠকবর্গকে সাবধান করা—কি উপায়ে তাহা পরিত্যাগ করা যায় তাহা প্রদর্শন করা—গুণভাগ, তৎপ্রতি আসক্তি আকর্ষণের জন্য পাঠকবর্গ

সমীপে উপস্থিত করা, প্রভৃতি বিবিধ উপায়ে এই হিত সংসাধন সম্পন্ন হইতে পারে। বঙ্কিম বাবুর অধিকাংশ উপন্যাসই এই উদ্দেশ্যে লিখিত। মানব জীবনের কঠোর সমস্যা ব্যাখাকে তিনি উপন্যাস বলিয়াছেন। এই ব্যাখা, জগতের বা সমাজ বিশেষের হিতসাধন জন্যই তিনি করিয়াছেন। তাঁহার বিষবৃক্ষ, কৃষ্ণকান্তের উইল, তাঁহার শান্তি, প্রফুল্ল, প্রভৃতি সকলই এই উদ্দেশ্যে লিখিত। এই উদ্দেশ্যানুসারে বিষয় নির্ব্বাচন করিয়া আমাদিগের পূর্ব্ব বর্ণিত অনুকরণের পন্থাবিশেষ গ্রন্থবিশেষে অনুকরণ করিয়া, তিনি উপন্যাস বা কৃত্রিম জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন।

এই উদ্দেশ্য ও নির্ব্বাচনের সঙ্গে মানসিক অনুকরণ সংযুক্ত হইলেই গ্রন্থকারের মনোমধ্যে উপন্যাসখানি নির্ম্মিত হইল। ইহার পরে, এই মনের উপন্যাসকে লিপিকৌশলে পুস্তকে সন্নিবিষ্ট করিলেই, তবে পুস্তকের উপন্যাস হইবে।

তবেই দেখিতে পাইলাম, উপন্যাস লেখা বড় সহজ কার্য্য নহে। ইহাতে বহু প্রকারের শিক্ষা চাই। রাজনীতি, অর্থনীতি, ব্যবহারনীতি, ধর্ম্মনীতি, বিজ্ঞাননীতি সর্ব্বশাস্ত্রেই গ্রন্থকারের সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকা চাই। এ জগৎ এমন রহস্যময়, যে, ইহার কি ভাল, কি মন্দ, ভালটা কি করিলে মন্দ হইয়া যাইতে পারে, মন্দটা কি হইলে ভাল হইয়া উঠিতে পারে, আদর্শ ভাল কি—এ সকল সহজ বুদ্ধিতে বুঝা যায় না। এরূপ স্থলে গ্রন্থকারের বিশেষ জ্ঞান ও ভূয়োদর্শন না থাকিলে গ্রন্থের উদ্দেশ্য সাধন হইবে কেন? তাহার পরেও উপন্যাসকারের মানব মন সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান থাকা নিতান্ত আবশ্যক। উপন্যাসের অধিকাংশ স্থলেই এই মানব মনই অনুকরণের বিষয় হইয়া থাকে। যাহা অনুকরণ করিতে হইবে, তাহা ভাল করিয়া না দেখিতে জানিলে, অনুকরণ ভাল হইবে কেন? কাজেই বলিতে হয়, দেশের হিতসাধন জন্য উপন্যাস লিখিতে, অনেক শিক্ষা ও জ্ঞান চাই।

তবে আর এক শ্রেণীর উপন্যাস লেখা কিছু সহজ। অনুকরণের যাথার্থ্য দেখাইবার জন্য, জগতে যাহা আছে, তাহারই অংশ বিশেষ প্রদর্শন করা তত কষ্টকর নহে। তাহাতে দেশের হিত সাধনের উপলক্ষ থাকে না— তাহাতে মূলানুকরণের, বা নূতন সৃষ্টির চেষ্টা থাকে না, তাহা সরলভাবে অনু-

করণের বাহবা লইবার জন্যই সৃষ্ট হইয়া থাকে। এরূপ স্থূলানুকরণে চিত্ত-রঞ্জন জন্য লিখিত উপন্যাস মনোমধ্যে গড়িতে বিশেষ বিদ্যা বুদ্ধির আবশ্যক করে না। এরূপ উপন্যাস লিখিয়া কৃতকার্য্য হইতে কেবলমাত্র লেখার কৌশল ও মানসিক সামান্যমাত্র নির্ব্বাচন ক্ষমতার আবশ্যক। একখানি "স্বর্ণলতা" লেখা বড় কঠিন নহে—কিন্তু একখানি "দেবীচৌধুরাণী" লেখা অতি কষ্টসাধ্য।

কোন্ প্রকার উপন্যাস কিরূপ ভাবে মনে গড়িতে হইবে, এবং তাহার জন্য কিরূপ শিক্ষার প্রয়োজন, তাহা উক্ত হইয়াছে। এক্ষণে তাহা পুস্তকাকার করিতে কি কি আবশ্যক, সংক্ষেপে তাহাই বলিব।

এই লিপিকৌশল সম্বন্ধেও আমরা গ্রন্থকারের সর্ব্ব প্রধান ও অতি প্রয়োজনীয় গুণ দেখিতে পাইতেছি—গ্রন্থকারের নির্ব্বাচিত বিষয়ের উপর সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও সেই বিষয়ের সর্ব্বোজ্জ্বল এবং পার্থক্য-প্রকাশক অংশ নির্ব্বাচনের ক্ষমতা। মনে যাহা ভাবা যায়, চক্ষে যাহা দেখা যায়, তাহার সকল কিছু কাগজে লেখা যায় না। তবেই আবার নির্ব্বাচন চাই—আবার দেখা চাই, কোন্ বিষয়ের কোনটি মজ্জা এবং সার অংশ। সেই পার্থক্য-প্রকাশক উজ্জ্বল অংশটিই লিখিতে হইবে। প্রকৃতি বর্ণনায়ই বল, আর চরিত্র চিত্রণেই বল, নির্ব্বাচন না করিয়া লইলে, চিত্রই ফুটে না। তবে সর্ব্ব প্রথমেই লিখিতব্য বিষয়ের (জান) মূল ভাগ দেখা চাই।

তার পরে বাক্যবিন্যাস কৌশল ও শৃঙ্খলা কৌশল। লেখা,—সরল, মধুর, সংক্ষিপ্ত, কার্য্যকর, রুচিকর ও রসময় হওয়া চাই। শৃঙ্খলা এরূপ ভাবে হওয়া চাই যে, প্রত্যেক দৃশ্য দর্শনান্তেই যেন তাহার পরিণাম দেখিবার জন্য মনের কৌতূহল উদ্রিক্ত হয়। দৃশ্য বিস্তৃত হইয়া যেন দর্শকের মনে বিরক্তি সঞ্চার না করে। কোন কথা যেন অতিরিক্ত না হয়। যেখানে একটি সামান্য রেখা পাতে চিত্রের সৌন্দর্য্য ফুটিতে পারে, সেখানে যেন বহু রেখা পাত দ্বারা তাহা ফুটাইবার চেষ্টা না করা হয়। কত আর বলিব? আমরা কিছু সকল জানি, তাহাও নহে। তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি, বাক্যবিন্যাস ত মনের ভাববিশেষের বা দৃশ্য বিশেষের প্রতিকৃতি তুলিবার জন্য,—তবে সেই প্রতিকৃতি তুলিবার উপকরণ, ছায়াও আলোক, মসী ও

রঙ প্রভৃতি ভাল না হইলে, ঠিক প্রতিকৃতি উঠিবে কেন? সে প্রকৃতি দেখিয়া আসলের ধারণা মনোমধ্যে আসিবে কেন?

এই যে সকল কথা বলিলাম, এ ছাড়া উপন্যাসের আরও এক ভাগ আছে। সে ভাগে গ্রন্থকার স্বয়ং ব্যাখ্যাকারক পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া পাঠকবর্গকে তাঁহার সৃষ্টি বুঝাইয়া দেন। এই ভাগেই গ্রন্থকারের বড় সাবধান হইয়া চলিতে হয়। প্রস্তাব বাহুল্যভয়ে এ সম্বন্ধে কিছুই লিখিলাম না।

আমরা এখন উপরোক্ত কথানুসারে সংসার আশ্রম উপন্যাসখানি কিঞ্চিৎ সমালোচনা করিতে চাহি। এই উপন্যাসের উদ্দেশ্য আমাদিগের বর্ণিত দ্বিবিধ উদ্দেশ্যের কোন্‌টি, তাহা ঠিক বুঝিতে পারিলাম না। যদি দেশের হিত সাধন এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য হয়, তবে তাহা গ্রন্থে প্রকাশিত হয় নাই। শুদ্ধ চিত্তরঞ্জনই মুখ্য উদ্দেশ্য ধরিয়া তিনি উপন্যাস খানি লিখিয়াছেন, ইহাই আমাদিগের বোধ হয় এবং আমাদিগের ন্যায় শিক্ষিত লোকের পক্ষে তাহাই উচিত।

অনুকরণে চিত্তরঞ্জনই উদ্দেশ্য করিয়া গ্রন্থকার হিন্দু পরিবারের সংসার আশ্রমের একভাগ নির্ব্বাচন করিয়া লইয়াছেন। এই ভাগ যথাযথরূপে লিখিয়া প্রদর্শন করাই বোধ হয়, তাঁহার অভিপ্রায়। সুতরাং তাঁহার উদ্দেশ্য অনুকরণ দ্বারা ক্ষুদ্র সংসার আশ্রম সৃষ্টি করিয়া লোকের চিত্তরঞ্জন; কাজেই তাঁহার নির্ব্বাচিত বিষয় হিন্দু পরিবারের সংসার আশ্রমের একটি সকরুণ দৃশ্য। ইহা তিনি আমাদিগের পূর্ব্ব কথিত স্থূলানুকরণ পন্থা অবলম্বন করিয়া আমাদিগের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন।

এরূপ উদ্দেশ্যে লিখিত উপন্যাসের বিচার করিতে হইলে, দেখিতে হইবে—প্রদর্শিত অনুকরণটি অবিকল হইয়াছে কি না ও তাহা পড়িলে যে জন্যই হউক, চিত্ত আনন্দে উচ্ছ্বলিত হয় কি না।

এই বিচারে আবার দুইটী বিষয়ই দেখিতে হইবে—গ্রন্থকারের মনের উপন্যাস ও তাঁহার পুস্তকের উপন্যাস। আমরা যথাক্রমে এই দুই বিষয় আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

যতদূর বুঝিতে পারা যায়—গ্রন্থকারের মনের উপন্যাস অধিকাংশ স্থলেই আসলের অবিকল অনুকরণেই সৃষ্ট হইয়াছে। তাঁহার ধারণাগত "সংসার-

আশ্রম” জগতের অকৃত্রিম সৃষ্টির একাংশ বলিয়াই অনুমিত হয়। তাঁহার নির্ব্বাচিত ঘটনাগুলি—তাঁহার নির্ব্বাচিত চরিত্রগুলি,—অধিকাংশ স্থলেই সরল ও স্বাভাবিক। তাঁহার ‘আনন্দময়ী’র চরিত্র যেমন স্বাভাবিক, তেমনই আবার বড় সুন্দর। তাঁহার ‘মাতঙ্গিনী’র অধিকাংশ ও ‘ব্রজসুন্দরী’ ‘হরসুন্দরী’র সম্পূর্ণই স্বাভাবিক উজ্জ্বল চিত্র। তাঁহার শৈলেন্দ্রের চরিত্র অন্য উদ্দেশ্যে লিখিত; অন্যরূপ অনুকরণের গঠিত উপন্যাসেরই তাহা উপযোগী, এ উপন্যাসে না লিখিলেই ভাল হইত। অর্থাৎ এই চরিত্রটি গ্রন্থকার বিকশিত করিতে পারেন নাই সুতরাং এরূপ আদর্শ চরিত্র বিকাশের ক্ষমতাও তাঁহার নাই বলিলেও চলে। তাই বলিতেছিলাম, এরূপ চরিত্র তিনি গ্রন্থমধ্যে না লিখিলেই ভাল হইত। যাহা হউক এই চরিত্রটি ও ইহার আনুসঙ্গিক দুই একটি চরিত্র ও ঘটনা ছাড়িয়া দিলে, আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি যে, হারাণ বাবুর উপন্যাসের ধারণা—স্বাভাবিক; এবং উদ্দেশ্য—সরল।

তার পরে দেখিতে হইবে, তাঁহার লিপিকৌশল। লিপিকৌশল দেখিতে হইলে, তৎসঙ্গে লিখিতব্য বিষয়ের প্রাণ নির্ব্বাচন ক্ষমতাও দেখিতে হয়। এই ক্ষমতা যে লেখকের থাকে, তিনি অতি অল্প কথায় অতি সুন্দর ফল উৎপাদন করিতে সক্ষম হয়েন। হারাণ বাবুর এ ক্ষমতা এখনও পরিপক্কাবস্থা প্রাপ্ত হয় নাই। নাই হউক, তাঁহার এ ক্ষমতা আছে, তাহা আমরা স্বীকার করিতে প্রস্তুত। তাঁহার লিখিত কথোপকথনগুলি ইহার নিদর্শন স্থল।

এই নির্ব্বাচন ক্ষমতার পরে যাহা যাহা আবশ্যক, হারাণবাবুর তাহা এখনও অভ্যাস হয় নাই। তাঁহার স্থানে স্থানে লেখা বড়ই অপরিপক্ক, মন্তব্য অধিকাংশ স্থলেই পাঠকের অরুচিকর ও বালকত্ব পরিচায়ক। গ্রন্থের স্থানে স্থানে করুণরস জমাট বাঁধিয়াছে সত্য, কিন্তু তাহাতেও লিপি কৌশলের অভাব পরিদৃষ্ট হয়। গ্রন্থের যে ভাগে গ্রন্থকার দর্শকদিগের নিকট ব্যাখ্যাকারক ভাবে দণ্ডায়মান থাকেন, হারাণবাবুর গ্রন্থ সেই ভাগে পাঠকবর্গের আনন্দ জন্মাইতে সমর্থ হয় নাই। হারাণবাবুর মন্তব্যগুলি ভাল নহে। যাহা হউক, হারাণ বাবুর বয়স অল্প। তিনি যে অনুকরণে মনে একটি জগৎ গড়িতে পারিয়াছেন, তাহা কম প্রশংসার কথা নহে। উপযুক্ত লিপিকৌশল হইলেই, হারাণ বাবু “স্বর্ণলতা” শ্রেণীর উপন্যাস

লিখিয়া পাঠকবর্গের চিত্তরঞ্জন করিতে সমর্থ হইবেন, আমরা এরূপ ভরসা করি।

উপসংহারে আমরা হারাণ বাবুর "সংসার আশ্রমের" প্রশংসাই করি।

হিতোপদেশ।*

বিষ্ণু শর্ম্ম প্রণীত হিতোপদেশ অতি আশ্চর্য্য সংগ্রহ গ্রন্থ এবং শ্রীযুক্ত তারাকুমার কবিরত্ন কৃত সেই হিতোপদেশের এই ভূমিকা, পরিশোধিত মূল, বঙ্গানুবাদ, ব্যাখ্যা ও পরিশিষ্ট অতি আশ্চর্য্য অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের ফল। কবিরত্ন লিখিয়াছেন, "মধুমক্ষিকা যেমন নানা পুষ্পের মধু আহরণ করিয়া অপূর্ব্ব মধুচক্র রচনা করে, বিষ্ণুশর্ম্মাও তেমনি তৎপূর্ব্ববর্ত্তী পণ্ডিতগণের শাস্ত্র হইতে সার সঙ্কলন করিয়া এই হিতোপদেশ রচনা করিয়াছেন।" কিন্তু সেই অপূর্ব্ব অফুরন্ত মধুচক্র লইয়া কবিরত্ন যে কি করিয়াছেন, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। তিনি সেই সমগ্র মধুচক্রের সহস্র প্রকোষ্ঠের কোনটিতে কোন ফুলের মধু সঞ্চিত হইয়াছে, তাহা ধীরে ধীরে দেখাইয়া দিয়াছেন, ফুলের গন্ধের সহিত মধুর গন্ধ মিলাইয়া দিয়াছেন, আর দেখাইয়াছেন, যে মধুমাত্রই শ্লেষ্মঘ্ন হইলেও, পদ্মমধু নেত্র রোগে, তালমধু অম্লরোগে, এক এক ফুলের এক এক প্রকার মধু, বিশেষ বিশেষ স্থলে, বিশেষ উপকারী। এখন আপনারাই বলুন, আমরা সেই মধুমক্ষীর, না এই মধু বৈদ্যের, প্রশংসা করিব!

মনু, বৃহস্পতি, শুক্রাচার্য্য, বাল্মীকি, পরাশর, ব্যাস, চাণক্য, কামন্দক প্রভৃতি হইতে বিষ্ণু শর্ম্মা উপদেশ সঙ্কলন করিয়াছেন; কিন্তু কোথা হইতে

---

* হিতোপদেশ, শ্রীতারাকুমার কবিরত্ন কর্ত্তৃক পরিশোধিত মূল এবং তৎ কর্ত্তৃক অনুবাদ, ব্যাখ্যা ও পরিশিষ্ট প্রভৃতির সহিত। কলিকাতা ১১৯ নং ওল্ড বৈটকখানা রোড বানর্জি যন্ত্রে মুদ্রিত এবং জে, এন্, বানর্জি এণ্ড সন্ কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কোনটি লওয়া, গ্রন্থে তাহার কোন পরিচয় নাই। এই মাত্র আছে, যে পঞ্চতন্ত্র এবং অন্যান্য গ্রন্থ হইতে হিতোপদেশ সঙ্কলিত হইল। কবিরত্ন অগাধ পরিশ্রমে, কোন শ্লোকটি বা পর্য্যায়টি কোথা হইতে গৃহীত তাহা পরিশিষ্টে বলিয়া দিয়াছেন, এবং ব্যাখায় ও 'হিতোপদেশের উপদেশ' বিবরণে সঙ্গৃহীত শ্লোকাদির বিশেষ উপকারিতা বুঝাইয়া দিয়াছেন; তাহাতেই বলিতেছিলাম, যে সেই পূর্ব্বকালের মধুমক্ষীর, না এই উপস্থিত মধু বৈদ্যের, কাহার অধিক প্রশংসা করিব?

বিষ্ণু শর্ম্মার পঞ্চতন্ত্র ও হিতোপদেশের গৌরব জগদ্ বিখ্যাত। খাস ধর্ম্মগ্রন্থ ছাড়া, অন্য কোন গ্রন্থের এত অধিক ভাষায় অনুবাদ বা অনুকরণ হয় নাই। হিব্রু, পহ্লবী, আরবিক, পারসিক, সাইরিক, তুরস্ক, চীন, গ্রীক্, লাটিন, ইটালিক, জর্ম্মানিক, ফ্রেঞ্চ, ইংরাজী, স্পানিস্, হিন্দী, উর্দ্দু, বাঙ্গালা প্রভৃতি পৃথিবীর প্রাচীন ও আধুনিক অনেক ভাষায়, গদ্যে ও পদ্যে, বিষ্ণু শর্ম্মার হিতোপদেশের ও পঞ্চতন্ত্রের অনুবাদ ও অনুকরণ হইয়াছে। বহুদিন হইতে বিষ্ণু শর্ম্মার অনুসরণ জগতে চলিতেছে। বোধ হয়, পারস্যরাজ নৌশেরানের সময় হইতে হিতোপদেশের অনুসরণ আরম্ভ হয় এবং আপাতত আমাদের আলোচ্য সংস্করণই শেষ বলিতে হইবে। কিন্তু কবিরত্ন কৃত এই উপস্থিত সংস্করণের মত, এমন উৎকৃষ্ট সংস্করণ হিতোপদেশের অদৃষ্টে আর কখন হইয়াছে কিনা সন্দেহ। কবিরত্ন বহু গ্রন্থ মিলাইয়া, সংহিতাদি মূল গ্রন্থ দেখিয়া, সমগ্র হিতোপদেশের পাঠ উদ্ধার করিয়াছেন, গদ্যভাগের গদ্যে ও পদ্য ভাগের পদ্যে অতি সরল সহজ ভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন এবং দুরূহ স্থলে ভাবার্থের ব্যাখ্যা করিয়া দিয়াছেন। আর কি করিয়াছেন, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এখন নাকি চারুপাঠ হইতে সংগ্রহ হইয়া সুচারু পাঠ হইতেছে, কথামালা হইতে কথামালা-সার হইতেছে, এমন দিনে, একখানি অতি পুরাতন গ্রন্থের সংস্করণে ও বিশ্লেষণে এরূপ অগাধ শ্রম অতি আশ্চর্য্য ব্যাপার।

আমরা বলিতেছিলাম, পঞ্চতন্ত্র ও হিতোপদেশ জগদ্বিখ্যাত, কেন না ঐ গ্রন্থদ্বয় জগতের নানা ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। কিন্তু আমাদের দেশে আজি কালি জগৎ ছাড়া লোক বিস্তর হইয়াছেন। জগতের লোক আপ-

নাদের গৌরব রক্ষার্থ বিব্রত, কিন্তু আমাদের জগৎ ছাড়া মহাত্মারা আত্মগৌরব নষ্ট করণার্থ বদ্ধ পরিকর। তাঁহারা যেমন শুনিবেন যে, হিতোপদেশ হইতে Pilpay's Tales প্রভৃতি গৃহীত হইয়াছে অমনই বলিবেন যে, হিতোপদেশ যে ঐ Pilpay's Tales হইতে গৃহীত হয় নাই, তাহা কে বলিতে পারে? তুমি যদি প্রমাণ দেখাইতে যাও, অমনই তাঁহারা বলিবেন, আমরা এখন সাহিত্য বিতণ্ডায় প্রবেশ করিতে পারি না, এই মাত্র বলিতে পারি, যে দুই মতের পক্ষেই অনেক কথা বলিতে পারা যায়। সুতরাং জগৎ ছাড়া লোক-দের কোন বিষয়েই সিদ্ধান্ত নাই। কেবল একটি স্থূল সিদ্ধান্ত আছে, যে আমাদের কিছুই ছিল না। এই সকল লোকদের কথা ছাড়িয়া দিয়া, আমরা সাধারণ লোকদের বলিতে পারি, যে ভারতবর্ষ প্রচলিত ঐ দুই গ্রন্থ হইতে যে বিদেশীয়গণ গ্রহণ করেন, তাহা তাঁহারা আপনারই বলিয়া গিয়াছেন! না বলিলেও, ইহা বুঝিতে পারা যায় যে, যে জাতি পশু পক্ষী পর্য্যন্তের আত্মা থাকা ধর্ম্মত এবং কর্ম্মত বিশ্বাস করে, তাহারাই পশু পক্ষীর মুখ দিয়া ধর্ম্মো-পদেশ বলাইবে ও শুনিবে। তাহাদের স্থানে শুনিয়া অন্যে অনুকরণ করিতে পারে, কিন্তু যে কথায় জাতি সাধারণের বিশ্বাস নাই, সে কথা কখন কোন মৌলিক রচনার মুল হইতে পারে না।

পঞ্চতন্ত্র ও হিতোপদেশ উভয় গ্রন্থই বিষ্ণু শর্ম্ম-প্রণীত; উভয় গ্রন্থই দুর্বৃত্ত রাজকুমারগণকে নীতিশিক্ষা প্রদানার্থ সঙ্গৃহীত। পঞ্চতন্ত্র কিছু বিস্তৃত, হিতোপদেশ অপেক্ষা কৃত সংক্ষিপ্ত। গ্রন্থের উদ্দেশ্যানুসারে ইহাতে রাজনীতি বিস্তর আছে; কিন্তু এখনকার মত তখনকার রাজনীতি সাধারণ নীতির বিরোধিনী ছিল না, কাজেই হিতোপদেশের নীতি সাধারণের উপযোগিনী। গ্রন্থের বিভাগ চারিটি—মিত্রলাভ, সুহৃদ্‌ভেদ, বিগ্রহ ও সন্ধি। কেবল রাজা রাজড়া বলিয়া নয়, আমাদের সাংসারিক জীবনেও আমরা ঐ চারিটি অবস্থা দেখিতে পাই। প্রথমে অন্ধ মৈত্র, তাহার পর স্বার্থান্বেষণে সুহৃদ্‌ভেদ, তাহার ফলে ঘোরতর বিগ্রহ ও লাঞ্ছনা, তাহার পর ঠেকিয়া শিখিয়া শেষে—সন্ধি।

সুতরাং মানবের বৈষয়িক জীবনের অবস্থোপযোগী সকল উপদেশই হিতোপদেশে আছে। কেবল বৈষয়িক জীবনের কেন, বুঝিতে পারিলে

ইহাতে পারমার্থিক জীবনের উপযোগী উপদেশও, কথার ছলে বলা হইয়াছে। পারমার্থিক জীবনে অনেকেরই প্রথমে থাকে ভগবানে এক রূপ অন্ধ বিশ্বাস; তাহার পর সংশয়বাদে ক্রমে সুহৃদ্ ভেদ হয়, আমরা সেই সখার সখা প্রাণপতি হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে থাকি। তাহার পর বিগ্রহ; আশা ভরসা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়; এমন যে মানব হৃদয়ের শান্তি রাজ্য তাহা ঘোর বিপদ সঙ্কুল হইয়া উঠে; শরীরে স্বাস্থ্য, হৃদয়ে স্বস্তি, প্রাণে শান্তি—কিছুই থাকে না। তখন সেই পাষণ্ডতার বিঘোরে চৈতন্যের উদয় হয়; হৃদয়ে সন্ধির আকাঙ্ক্ষা উঠে। তখন সেই সখার সখা সন্ধি বন্ধনে আপনা আপনি আবদ্ধ হয়েন। হিতোপদেশ বৈষয়িক বিচারে, সেই পারমার্থিক কথাই বুঝাইয়াছেন।

তাহাতেই উপসংহারে কবিরত্ন লিখিয়াছেন; "হিতোপদেশের উপদেশ এই যে, এ জগতে সকলেই মিত্র লাভ কর। যদি না বুঝিয়া সুহৃদ্ ভেদে ও বিগ্রহে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া থাক, পুনরায় সন্ধি অর্থাৎ সদ্ভাব স্থাপন কর অবশ্যই শক্তি ও সিদ্ধি লাভ করিতে পারিবে। সিদ্ধিঃ সাধ্যে মতামস্ত।"

সদ্ভাবের ব্যাখ্যা অন্যত্র কবিরত্ন করিয়াছেনঃ—

"বিশ্বেষাং হৃদয়ানাং যদক্ষয্যং পরিবন্ধনং।
এক ব্রহ্ম মহাসূত্রেণৈব সদ্ভাব ঈরিতঃ॥ ১॥
প্রীতির্নো বর্দ্ধতাং নিত্যং বয়ং সর্ব্বে সহোদরাঃ।
ইতি মৈত্রীময়ী বুদ্ধিঃ সদ্ভাবাদুপজায়তে॥ ২॥
মৈত্রী বুদ্ধের্মহাশক্তি রনন্তা জায়তে ত্বক্ষয়া।
মহাশক্তিময়ো লোকঃ প্রলয়েঽপি ন লীয়তে॥ ৩॥

এক ব্রহ্ম-রূপ মহা সূত্র দ্বারা সমস্ত বিশ্ববাসীর হৃদয়মণ্ডলের যে অক্ষয় বন্ধন, তাহারি নাম সদ্ভাব। ১। নিত্যই আমাদের মধ্যে প্রীতি পরিবর্দ্ধিত হউক, আমরা সকলেই এক মায়ের সন্তান, এই মৈত্রীময়ী বুদ্ধি সদ্ভাব হইতে উৎপন্ন হয়। ২। মৈত্রীময়ী বুদ্ধি হইতে অনন্ত ও অক্ষয় মহাশক্তি উৎপন্ন হয়; যে মনুষ্য সমাজ সেই মহাশক্তির বলে বলীয়ান্, মহাপ্রলয়েও তাহার বিলয় নাই॥ ৩॥"

এইরূপ সন্ধি, মৈত্রী ও সদ্ভাবের কথাই হিতোপদেশের প্রধান উপদেশ।

ঐ মূল উপদেশ ব্যতীত হিতোপদেশে আরও অনেক উপদেশ আছে। কবিরত্ন তাহার মধ্যে গুটি ৩০।৩২ উপদেশ পৃথক করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন। হিন্দুশাস্ত্রের আর একটি মূল মীমাংসার কথা আমরা, কবিরত্নকে অনুসরণ করিয়া, হিতোপদেশ হইতে দেখাইতেছি :—

যখন যে স্থানে মানুষের মনে বিচার বিতর্ক আরম্ভ হইয়াছে, তখনই সেই স্থলে, দৈব ও পুরুষকার লইয়া মানুষের মনে একটা মহা গণ্ডগোল উপস্থিত হইয়াছে, বিষম খট্‌কা লাগিয়াছে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মধ্যে কেহ কেহ অদৃষ্ট বাদকে কেবল কুসংস্কার মাত্র বলিয়াছেন; আবার দৈবই সর্ব্বেসর্ব্বা এমনও অনেকে বলিয়াছেন। সকলেই জানেন, পাশ্চাত্য কবির উক্তি ;—

Man proposes,
And God disposes.
মানুষে করে আস্থা,
কিন্তু ঘটান জগদম্বা।

এটি দৈববাদীর কথা। পোপের উক্তিও অনেকের স্মরণে আসিতে পারে ;—

Yet gave me, in this dark estate,
To see the good—from ill ;
Binding *Nature* fast in fate,
Left free the human will.

তবু এই অন্ধকারে, ভাল মন্দ দেখিবারে,
মোরে নাথ! দিয়াছ ক্ষমতা।
অদৃষ্ট পাশে স্বভাবে, বেঁধেছ নিগূঢ় ভাবে,
নরেচ্ছারে দিয়ে স্বাধীনতা।

ইহাতে দৈববাদের সঙ্গে পুরুষকারের সামঞ্জস্য সাধনের চেষ্টা হইয়াছে ; আবার পুরুষকারের প্রাধান্যও পাশ্চাত্য সাহিত্যে বিশেষরূপে প্রথিত হইয়াছে ; বাল-পাঠ্য কবিতায় তাহা সকলে দেখিয়া থাকিবেন।

Lives of greatmen all remind us,
We can make our lives sublime,
And, departing, leave behind us,
Foot-prints on the sands of time :—

মহৎ চরিত্র দেখি এই মনে হয়,
সকলে মহৎ হতে আমরাও পারি,
রেখে যেতে পারি মোরা, যাবার সময়,
সময় সাগর তটে পদ চিহ্ন সারি।

প্রধান পাশ্চাত্য দার্শনিক মিল্ অদৃষ্ট এবং পুরুষকারের মীমাংসা করিতে গিয়া, আমাদের দেশের অদৃষ্টবাদ হইতে (Asiatic fatalism) বিভিন্ন রূপে তাঁহার নিজের একরূপ অদৃষ্টবাদ (Modified fatalism) সৃষ্টি করিয়া কি যে এক কাণ্ড করিয়াছেন, তাহাও অনেকে দেখিয়াছেন। অথচ প্রকৃত হিন্দুর পক্ষে এই গণ্ডগোল একেবারে নিষ্প্রয়োজন। হিন্দু কর্ম্ম-ফলে বিশ্বাসবান। কর্ম্মের অনন্ত প্রবাহ। পূর্ব্ব কর্ম্মের কতক ফল ভোগ হইয়াছে, কতক এখন ভোগ করিতেছি, বর্ত্তমান কর্ম্মেরও এখন কতক ফল ভোগ হইতেছে, কতক ফল সঞ্চিত থাকিতেছে। যে টুকু ভোগ করি, সে টুকু অদৃষ্ট বা দৈবায়ত্ত, ভোগ করিতে করিতে যাহা করি, তাহা পুরুষায়ত্ত। সুতরাং দৈব ও পুরুষকার উভয়ই আমাদের জীবনের নির্দ্দেশক। পাশ্চাত্য গণিতের ভাষায় Co-ordinates। সুতরাং কার্য্যকালে কেবল দৈবের উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চেষ্ট থাকা, নিতান্ত নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচায়ক এবং কাপুরুষতার লক্ষণ। সমস্ত হিন্দুশাস্ত্রে যেমন, হিতোপদেশেও তেমনই এই কথা পরিষ্কার করিয়া বলা আছে ;—

দৈবের প্রভাব বর্ণনায় কথিত হইয়াছে ;—

অবশ্যম্ভাবিনো ভাবা ভবন্তি মহতামপি।
নগ্নত্বং নীলকণ্ঠস্য মহাহি-শয়নং হরেঃ॥

অপিচ। যদ্ ভাবি ন তদ্ভাবি ভাবি চেন্ন তদন্যথা।
ইতি চিন্তা বিষঘ্নোঽয়মগদঃ কিং ন পীয়তে ?

কপালে যা আছে তাহা অবশ্য ঘটিবে,
সকলের শ্রেষ্ঠ যিনি তাঁরো না খণ্ডিবে ;
কপালের দোষে শিব সদা বিবসন,
সর্পের শয্যায় দেখ! বিষ্ণুর শয়ন।

না হবার যাহা, তাহা কে করে ঘটন,
যা হবার হবে, তার কে করে খণ্ডন;
সর্ব্ব চিন্তা-বিষ নাশ করে এই জ্ঞান,
এ ঔষধ কেন লোকে নাহি করে পান?

অন্যচ্চ। স হি গগনবিহারী, কল্মষধ্বংসকারী,
দশ শত করধারী, জ্যোতিষাং মধ্যচারী।
বিধুরপি বিধি যোগাদ্ গ্রস্যতে রাহু নাসৌ,
লিখিত মপি ললাটে প্রোজ্‌ঝিতুং কঃ সমর্থঃ॥

অত্যুচ্চ আকাশে বাস, যে করে তিমির নাশ,
তারা মধ্যে জ্বলে যার সহস্র কিরণ,
দেখ না! দৈবের বশে, সে শশী রাহুর গ্রাসে,
ললাটে বিধির লেখা কে করে খণ্ডন।

যোঽধিকাদ্ যোজন শতাৎ পশ্যতীহামিষং খগঃ।
স এব প্রাপ্ত কালস্তু পাশবন্ধং ন পশ্যতি॥

শত শত যোজন হ'তেও উচ্চ দেশে
থাকি পক্ষী, নিজ ভক্ষ্য দেখে অনায়াসে;
কিন্তু দেখ বিধি যবে বিপদ ঘটায়,
কাছেতে ব্যাধের ফাঁদ দেখিতে না পায়।

অপিচ। শশি দিবাকরয়ো গ্র্হ পীড়নম্,
গজ ভুজঙ্গময়োরপি বন্ধনম্।
মতি মতাং চ বিলোক্য দরিদ্রতাম্,
বিধি রহো বলবানিতি মে মতিঃ।

মাতঙ্গ ভুজঙ্গগণে দেখিয়া বন্ধন,
শশধর দিবাকরে রাহুর পীড়ন;
সুবুদ্ধি পণ্ডিতগণে দেখিয়া নির্ধন,
অলঙ্ঘ্য জানিনু ভবে বিধির শাসন।

অন্যচ্চ। ব্যোমৈকান্ত বিহারিণোঽপি বিহগাঃ সম্প্রাপ্নুবন্ত্যাপদম্,
বধ্যন্তে নিপুণৈরগাধ সলিলাম্মৎস্যাঃ সমুদ্রাদপি।
দুর্নীতং কিমিহাস্তি কিং সুচরিতং কঃ স্থান লাভ গুণঃ,
কালোহি ব্যসন প্রসারিতকরো গৃহ্ণাতি দূরাদপি॥

আরো। মীন থাকে সিন্ধুতলে, বিহঙ্গ আকাশে চলে,
তবু দেখ জাল মধ্যে বন্ধন তাহার;
দুরন্ত কালের ঠাঁই, নিস্তার কাহারো নাই,
গুণাগুণ দেশ পাত্র না করে বিচার॥

অচিন্তিতানি দুঃখানি যথৈবায়ান্তি দেহিনাম্।
সুখান্যপি তথা মন্যে দৈব মত্রাতিরিচ্যতে॥

অচিন্তিত দুঃখ কত আসিছে যেমন,
তেমনি হতেছে কত সুখের ঘটন;
এ জগতে যার ভাগ্যে যবে যাহা হয়,
সকলি দৈবের হাত জানিবে নিশ্চয়।

তথাচোক্তং। অপরাধঃ স দৈবস্য ন পুন র্মন্ত্রিণাময়ম্।
কার্য্যং সুঘটিত যত্নাদ্ দৈব যোগাদ্ বিনশ্যতি।

অনেক যতনে হয় যার সুঘটন,
সে কার্য্যে যদ্যপি ঘটে বিধি বিড়ম্বন;
সে কারণে মন্ত্রীগণ অপরাধী নয়,
অদৃষ্টের দোষ তাহা জানিবে নিশ্চয়।

এইরূপ নানা কথা শাস্ত্রে আছে, কিন্তু তা বলিয়া, শাস্ত্র কখন দৈবে নির্ভর করিতে বলেন না। হিতোপদেশ হইতে সার সংগ্রহ করিয়া কবিরত্নের উপদেশ শুনুন;—

অসীম সমুদ্রের ন্যায় সম্মুখে সঙ্কটাকীর্ণ বিশাল কর্ম্মক্ষেত্র বিস্তীর্ণ রহিয়াছে। অর্জ্জুন যেমন কৃষ্ণকে সারথি করিয়া এবং অক্ষয় তূণ ও অজেয় গাণ্ডীব ধারণ করিয়া, সমর সাগর পার হইয়াছিলেন, তেমনি তোমরাও ধর্ম্মকে সহায় করিয়া এবং অটল অধ্যবসায় ও অমেয় উদ্যোগ ধারণ করিয়া, এই

কর্ম্মসাগর পার হও। দৈবের দোহাই দিয়া নিজের অস্তিত্ব লোপ করিও না। দৈবও পুরুষকার ভিন্ন কদাচ ফলপ্রদ হয় না। অতএব পুরুষকারই মানুষের একমাত্র গতি ;—

> ন দৈবমপি সঞ্চিন্ত্য ত্যজেদুদ্যোগমাত্মনঃ।
> অনুদ্যোগেন তৈলানি তিলেভ্যো নাপ্তুমর্হতি॥
> উদ্যোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মীঃ।
> দৈবেন দেয়মিতি কাপুরুষা বদন্তি।
> দৈবং নিহত্য কুরু পৌরুষমাত্ম শক্ত্যা।
> যত্নে কৃতে যদি ন সিদ্ধতি কোহত্র দোষঃ॥
> যথা হ্যেকেণ চক্রেণ ন রথস্য গতির্ভবেৎ।
> এবং পুরুষকারেণ বিনা দৈবং ন সিধ্যতি॥
> যথা মৃৎপিণ্ডতঃ কর্ত্তা কুরুতে যদ্ যদিচ্ছতি।
> এবমাত্মকৃতং কর্ম্ম পুরুষঃ প্রতিপদ্যতে॥
> কাকতালীয়বৎ প্রাপ্তং দৃষ্ট্বাপি নিধিমগ্রতঃ।
> ন স্বয়ং দৈবমাদত্তে পুরুষার্থমপেক্ষতে॥
> উদ্যোগেন হি সিদ্ধন্তি কার্য্যাণি ন মনোরথৈঃ।
> নহি সুপ্তস্য সিংহস্য প্রবিশন্তি মুখে মৃগাঃ॥

> দৈবের দোহাই দিয়া থাকা কিছু নয়,
> বিনা যত্নে তিল হ'তে তৈল নাহি হয়।
> লভে লক্ষ্মী সতত উদ্যোগী নরবর,
> কাপুরুষ দৈবে সদা করয়ে নির্ভর ;
> দৈব ছাড়ি দেখাও পৌরুষ প্রাণপণে,
> কি দোষ ? রতন যদি না মিলে যতনে।
> শুধু চক্রে যেমন শকট নাহি চলে,
> তেমনি পৌরুষ বিনা দৈব নাহি ফলে।
> যেমতি মৃত্তিকাপিণ্ড লয়ে কুম্ভকার,
> ইচ্ছামত গড়ে কত বিচিত্র আকার ;

তেমতি করিয়া কার্য্য আপন ইচ্ছায়,
আপন কর্ম্মের ফল আপনিই পায়।
দৈবাৎ সম্মুখে যদি হেরে কেহ নিধি,
হাতে কি নিজেই তাহা তুলে দেন বিধি?
কুড়াইয়া লইতেও চেষ্টা করা চাই,
পুরুষের চেষ্টা বিনা কোন সিদ্ধি নাই।
ইচ্ছায় না হয় কাজ উদ্যম বিহনে,
মৃগ নাহি পশে সুপ্ত সিংহের বদনে।

পুনশ্চ,—

উৎসাহ সম্পন্ন মদীর্ঘসূত্রম্,
ক্রিয়া বিধিজ্ঞং ব্যসনেষ্বসক্তম্।
শূরং কৃতজ্ঞং দৃঢ় সৌহৃদং চ
লক্ষ্মীঃ স্বয়ং যাতি নিবাসহেতোঃ॥

অতুল উৎসাহী, শূর, কার্য্যে অনলস,
কোনরূপ ব্যসনের নহে পরবশ;
কার্য্যের ব্যবস্থা জ্ঞানে অতি বিচক্ষণ,
প্রণয়ে অটল আর কৃতজ্ঞ যে জন;
আপনি কমলাদেবী বসতির তরে,
গমন করেন সেই পুরুষের ঘরে।

হিতোপদেশের এইরূপ মীমাংসা-পূর্ণ উপদেশ সকল হিন্দুশাস্ত্রের সার। সরল সহজ ভাষায় অনুবাদসহ সেই সমগ্র হিতোপদেশের এই সংস্করণ প্রকাশ করিয়া কবিরত্ন স্বয়ং ধন্য হইয়াছেন এবং আমাদের সকলকেই ধন্য করিয়াছেন।

ঢাকুর সমালোচনা।*

পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে আমাদিগের ইতিবৃত্ত লিখিবার যে প্রবৃত্তি জন্মিয়াছে, তাহা মন্দ নহে। কিন্তু এই শিক্ষা বলে, আমরা যে কতকগুলি মন্দ বিষয় লাভ করিতেছি তাহা বোধ হয়, কেহই অস্বীকার করিবেন না। অধুনাতন, ইতিবৃত্তের নাম করিয়া, আমাদিগের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অনেকেই সত্যের অপলাপ ও অপরের সহিত নিরর্থক কলহ করিতে শিখিয়াছেন। এতদিন আমাদিগের ধারণা ছিল, যে এই দোষ প্রধানত পাশ্চাত্য শিক্ষা বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের মধ্যেই বর্ত্তমান আছে। দুঃখের বিষয়, এই রোগ, যাঁহারা পাশ্চাত্য শিক্ষার গৌরবের ফলভাগী হইতে ইচ্ছুক নহেন, তাঁহাদিগের মধ্যেও প্রবেশ লাভ করিয়াছে।

সমালোচ্য গ্রন্থের বিজ্ঞাপনের আরম্ভেই গ্রন্থকার বলিতেছেন "সামাজিক বারেন্দ্র কায়স্থকুলের বংশ-বিবরণ-যুক্ত পুস্তকের নাম" ঢাকুর বা ঢাকুরী। এই শব্দ কোন ভাষা হইতে সমুৎপন্ন, মুল, কি অপভ্রংশ, তাহা জানিতে পারা যায় নাই।" গ্রন্থকার ঢাকুর শব্দ সম্বন্ধে জানিতে পারেন নাই। কিন্তু এ সম্বন্ধে আমরা যেরূপ মনে করি, তাহা প্রকাশ করিতেছি।

ঢক্কা শব্দের উত্তর শীলার্থ উরপ প্রত্যয় করিয়া ঢক্কুর শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে! ঢক্কুর শব্দের অপভ্রংশ যে ঢাকুর, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ "ঠক্কুর" শব্দের অপভ্রংশ যে "ঠাকুর" তাহা উল্লেখ করা যাইতে পারে। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য ঢক্কুর বা ঢাকুর শব্দের এস্থলে অর্থ কি? ঢাকের স্বভাব বিশিষ্ট বা উচ্চ শব্দ বোধক যে সামগ্রী, তাহাই ঢাকুর নামে কথিত। কুল গ্রন্থ যে আমাদিগের দেশে উচ্চ শব্দ বোধক সে কথার উল্লেখ করা বাহুল্য মাত্র। ইহাতে যাহা কথিত হয়, তদপেক্ষা উচ্চ বা শ্রেষ্ঠ কথন আর নাই। বঙ্গদেশে ঢাকই এক মাত্র উচ্চ শব্দ বিশিষ্ট বাদ্যযন্ত্র। কোন

---

* ঢাকুর অর্থাৎ কায়স্থ জাতি ও বারেন্দ্র কায়স্থ সমাজের ইতিবৃত্ত। শ্রীগোবিন্দমোহন রায় বিদ্যাবিনোদ বারিধি কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। শকাব্দা ১৮১০।

প্রকাশ্য কথা কেহ গোপন করিতে উদ্যত হইলে, লোকে বলে "ঢাকে ঢোলে কথা!" অপিচ, জনশ্রুতি বলিতেছে, যে পূর্ব্বতন কুলাচার্য্যগণ যখন কুল কাহিনী বলিতেন, তখন বাদ্য হইত এবং তাঁহারা বাদ্যসহ অঙ্গ ভঙ্গি পূর্ব্বক কুলকাহিনী কীর্ত্তন করিতেন। আমরা এখনও দেখিতে পাই, যে কোন কোন স্থলে, কুলাচার্য্যগণ তাকিয়াতে আঘাত পূর্ব্বক কুলকাহিনী বর্ণন করেন। এক্ষণ বঙ্গদেশ সভ্যতাভিমানী, সেই জন্যই আমরা বহুবিধ পরিবর্ত্তন অবলোকন করি। পূর্ব্বে যে ঢাকের বাদ্য হইত, তাহাতে আর বিচিত্র কি? সুতরাং "ঢক্কুর" শব্দ হইতে যে ঢাকুর শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে তাহা প্রমাণিত হইল।*

এইরূপ ভাবে কোন কিছুর নামকরণ বা উপাধি যে পূর্ব্বে হইত, তাহার বিস্তর প্রমাণ, পাঠকগণ অনুসন্ধান দ্বারায় পরিজ্ঞাত হইতে পারিবেন। আমরা এস্থলে একটী সাদৃশ্য প্রদর্শন করিতেছি। নাটোরের প্রাতঃস্মরণীয়া রাণী ভবানীর একমাত্র কন্যা তারার বিবাহে যে মহতী ঘটা ও অপর্য্যাপ্ত অর্থ ব্যয় হইয়াছিল, এমন আর বঙ্গদেশে, বোধ হয়, কখন হয় নাই। যাহা হউক, এই বিবাহে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ সমাজের রাণীর মতের যাবতীয় কুলীন একত্রিত হইয়াছিলেন। ইঁহাদিগকে আহারের সময় অনুসন্ধান করিয়া লওয়া নিতান্ত অসম্ভব হওয়ায় অধুনাতন কলিকাতাস্থ ঢোল মহাশয়দিগের পূর্ব্বপুরুষ (ইঁহার নাম স্মরণ নাই) সকলকে বলিয়া দেন, যে আমি ঢোল বাজাইলেই আপনারা আহারে গমন করিবেন। ইনি একজন শ্রেষ্ঠ কুলীন

---

* 'ঢাকুর' বা 'ঢেকুর' শব্দ বঙ্গসাহিত্যে অন্যত্র পাওয়া যায়। ধর্ম্মমঙ্গলে আছে;—

"বিপক্ষ করিলে বল, বাড়িবে নদীর জল,
অরি প্রবেশিতে নারে পুর।
অপর প্রার্থনা শুন, ত্রিষষ্টির গড় পুন
নাম হবে অজয় ঢাকুর।"

ধর্ম্মমঙ্গলে যে ভাগে এই গড়ের বর্ণনা আছে, তাহার নাম 'ঢেকুর পালা' বা 'ঢাকুর পালা'। সুতরাং ঢাকুর শব্দ আদিতে যে অর্থেই ব্যবহৃত হউক, ধর্ম্মমঙ্গলে যে স্থানবাচক তাহা বেশ বুঝা যায়। সেই ঢাকুর হইতে ঢাকুর গ্রন্থ রচিত হয় নাই ত? নবজীবন সম্পাদক।

ছিলেন। ঢোলের বাদ্যের জন্য সকলে ইহাঁকে ঢোল নামে অভিহিত করেন। তদবধি ইহাঁর বংশধরগণ ঢোল উপাধিতে পরিচিত। এই সাদৃশ্য দ্বারা পাঠকগণ বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন যে, ইহার বহুপূর্ব্বে ঢাকুর শব্দ যে পূর্ব্ব কথিত ভাবেই উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

গ্রন্থকার বিজ্ঞাপনে বলিয়াছেন যে "যদি কোন সামাজিক বারেন্দ্র কায়স্থ মহোদয়ের কৌলিক ইতিহাস সম্বন্ধে সন্দেহ হয়, তবে তিনি পদ্য ঢাকুরের সহিত গদ্য ঢাকুরের ঐক্য করিয়া লইবেন।" মুদ্রাযন্ত্রের প্রসাদে তাঁহার গ্রন্থখানি সাধারণের পাঠ করা সহজ। কিন্তু পদ্য ঢাকুর সেরূপ নহে। যে পদ্য ঢাকুরের সহিত, গদ্য ঢাকুরের ঐক্য করিতে অনুরোধ করিয়াছেন, সে খানিকে মুদ্রিত করিলেন না কেন? গ্রন্থকার বলেন, সেইখানি অবিকল মুদ্রিত করিতে ইচ্ছুক ছিলাম, কিন্তু তাহার রচনা প্রণালী বর্ত্তমান কৃতবিদ্য সমাজের প্রীতিকর হইবে না বলিয়া, প্রচলিত বাঙ্গালা সাধু ভাষাতে প্রকাশিত হইল। গ্রন্থকার এই স্থলে, 'আধুনিক কৃতবিদ্য সমাজ' শব্দের কিরূপ অর্থ করেন, তাহা বলিতে পারি না। আমরা, আধুনিক কৃত-বিদ্য সমাজ বলিলে বিপ্লব-প্রয়াসী ইংরেজি-নবিশ সম্প্রদায়কেই সাধারণত বুঝিয়া থাকি। এই সম্প্রদায় যে সকল মানসিক রোগগ্রস্ত, গ্রন্থকার সেরূপ নহেন। প্রাচীনের প্রতি অভক্তি, ইঁহাদিগের একটী প্রধান রোগ। প্রবীণ গ্রন্থকার তাহার উপশম না করিয়া বরং প্রশ্রয় দান করিয়াছেন, এজন্য আমরা দুঃখিত হইলাম। সামাজিক কুল কাহিনী যিনি অবগত হইতে ইচ্ছুক —সজাতি ও সবংশের প্রতি যিনি ভক্তিমান, সামাজিক ও কুল গ্রন্থের রচনা প্রণালী যেরূপই হউক না কেন, তিনি উহা অবশ্যই পাঠ করিবেন।

বিজ্ঞাপনের পর গ্রন্থকারের বংশ বর্ণনা এবং উহার পরেই, গ্রন্থ সম্বন্ধে সামাজিক ব্যক্তি বিশেষের একখানি সার্টিফিকেট আছে। এ সম্বন্ধে কোন কথা বলা নিষ্প্রয়োজন হইলেও, ইহা উল্লেখ করা অসঙ্গত নহে যে, আজি কালিকার সার্টিফিকেট দেখিলেই বিলাতি সভ্যতার উচ্চ অঙ্গ মনে পড়ে!

এই সকলের পর, মূল গ্রন্থ আরম্ভ হইয়াছে। গ্রন্থকার এই স্থলে কায়স্থ জাতি সম্বন্ধে সবিশেষ আলোচনা করিয়াছেন। অনেক দিন হইতেই কায়স্থগণের ক্ষত্রিয়ত্ব বিষয়ে আন্দোলন চলিয়া আসিতেছে। সেই সকল

পুরাণ কথা লইয়া, সেই স্কন্দ পুরাণের চন্দ্রসেন রাজার অন্তর্ব্বত্নী মহিষীর গর্ভজাত পুত্র মহর্ষি দাল্‌ভ্যের আশ্রিত কায়স্থ, সেই পদ্মপুরাণের সৃষ্টিখণ্ডের চিত্র গুপ্ত কায়স্থ, * সেই পুরাণ, সেই তন্ত্র ইত্যাদির সাহায্যে, গ্রন্থকার স্বীয় বিচক্ষণতা প্রতিপাদন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। কিন্তু বাস্তবিক যাহা স্থির মীমাংসা করা সহজ নহে, পুরাণেতিহাস যে স্থলে, কোন পক্ষকে অধিক বা কোন পক্ষকে অল্প পরিমাণে সমর্থন করে, সে স্থলে এইরূপ বাগ্‌বিতণ্ডাকে, কলহ ব্যতীত আর কি বলা যাইতে পারে? এইরূপ খাস বিলাতি ধরণের বাগ্‌বিতণ্ডার দ্বারায় আমরা কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি না; অথচ আপনার তত্ত্বজ্ঞতা বা পাণ্ডিত্যের ভাণ করিয়া, বিপক্ষকে হীন করিবার জন্য অগ্রসর হইয়া, আপনার শ্রেষ্ঠতাকে মলিন বা অধিকতর তর্কানুবন্ধ করিয়া থাকি। বিজ্ঞ গ্রন্থকার করণ শব্দের মীমাংসা করিতে যাইয়া, ভরত মল্লিকের প্রতি যে বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহা দৃষ্টান্ত স্বরূপ আনয়ন করিলেই উহা প্রতীয়মান হইতে পারিবে।

গ্রন্থকার বলেন "ভরত মল্লিক এদেশের একজন আধুনিক লোক, জাতিতে বৈদ্য। নিজে বর্ণসঙ্কর, তাই কায়স্থকে বর্ণসঙ্কর রূপে প্রতিপাদনে বিশেষ যত্ন করিয়াছেন।" পাঠকগণ দেখিতে পাইবেন, যে ভরত মল্লিক যে করণ শব্দের উল্লেখ করেন, তাহা নানার্থক ও 'বৈশ্য হইতে শূদ্রা-গর্ব্ভজাত জাতি বিশেষ' এবং কায়স্থ উভয়কেই বুঝায়। তাহা গ্রন্থকারও স্বীকার করেন। তবে তাঁহার আপত্তি এই যে "দ্বিজশব্দ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই তিন জাতি-কেই বুঝায়, তাই বলিয়া কি এই তিন জাতি অভিন্ন?" এই শেষোক্ত স্থলে আমাদিগের মত এই যে, ত্রিবর্ণ যখন অভিন্ন ছিল, তখনই দ্বিজত্বের আরম্ভ ও উত্তর কালে গুণ কর্ম্মের বিভাগ দ্বারায় ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য নাম করণ হইয়াছে। সুতরাং ভরত মল্লিক যে "করণ" শব্দের দ্বারা বর্ণসঙ্কর জাতি বিশেষ এবং কায়স্থ উভয়কে বুঝিবেন, তাহা বিচিত্র নহে। বৈশ্য হইতে শূদ্র-গর্ব্ভজাত একই ব্যক্তির সন্তানগণ, গুণ কর্ম্মানুসারে দ্বিবিধ সংজ্ঞায় অভিহিত হইবে, তাহা কি তিনি অসঙ্গত রূপে অনুমান করিয়াছেন? অপিচ,

* বৈদ্যগণ গুপ্ত নামে পরিচয় দান করেন। চিত্রগুপ্তের বংশ ক্ষত্রিয় হওয়ায় দোষ কি?

অগ্নিপুরাণ কায়স্থগণের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপাদনের বিরুদ্ধ। এই পুরাণে ঘোষ প্রভৃতির উল্লেখ থাকায় যে ঐ বচন প্রক্ষিপ্ত, গ্রন্থকারের এ যুক্তি সঙ্গত নহে। পঞ্চ বিপ্রসহ যখন কায়স্থগণ এদেশে আসেন, তখনও তাঁহাদিগের মধ্যে ঐ উপাধি ছিল। সুতরাং তাহাদিগের পূর্ব্ব পুরুষগণের ঐ উপাধি থাকা অসম্ভব নহে। এখনও ঐরূপ উপাধি কোলাঞ্চ প্রদেশে থাকার বিষয় আমরা অবগত আছি। তবে উচ্চারণে তারতম্য আছে মাত্র, যথা, "বসু" "বসা" ইত্যাদি। গ্রন্থকার অগ্নি পুরাণের বচনের কোন এক অংশকে অমৌলিক ও প্রক্ষিপ্ত বলিতেছেন। আমরা যদি অগ্নি পুরাণের বচনকে প্রক্ষিপ্ত বলি, তাহা হইলে বিরুদ্ধবাদীরা স্কন্দপুরাণাদির বচনও প্রক্ষিপ্ত বলিলে, তাহাতে আমাদিগের কি কোন যুক্তিযুক্ত প্রত্যুত্তর আছে? যাহা যখন যাঁহার বিরুদ্ধে হইবে, তখনই তাহাকে প্রক্ষিপ্ত বলিলে এবং এইরূপ তর্কমার্গে ভ্রমণ করিলে, সমুদায় শাস্ত্রই প্রক্ষিপ্ত বচনের বোঝা হইয়া পড়ে এবং তাহা হইলে শাস্ত্রের প্রতি আস্থা থাকে কৈ? আর এরূপ তর্কের মূল্যই বা কি হইবে?

আধুনিক অবস্থা এইরূপ দাঁড়াইয়াছে যে, কায়স্থগণ ক্ষত্রিয় নামে আপনাদিগকে পরিচিত করিলে, বৈদ্যগণ তাহার প্রতিবাদ করেন এবং বৈদ্যগণ আপনাদিগকে সেন বংশীয় বলিলে কায়স্থগণ তাহার প্রতিবাদ করেন। উভয়েই পাণ্ডিত্যাভিমানে, উভয়েই ঈর্ষা প্রাবল্যে, সত্য বা প্রকৃত মীমাংসায় উপস্থিত হইতে অনিচ্ছুক। এ বিষয়ে আমাদের বক্তব্য আছে।

বৈদ্যগণ আপনাদিগকে অম্বষ্ঠ নামে অভিহিত করেন। একটু আলোচনা করিলেই অম্বষ্ঠ এবং কায়স্থ শব্দ যে একার্থক, তাহা বিলক্ষণ প্রতীত হইবে।

স্কন্দ পুরাণের রেণুকা মাহাত্ম্য পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, চন্দ্রসেন মহিষী গর্ভবতী থাকায় মহর্ষি দালভ্য পরশুরামের নিকট তাঁহার গর্ভ রক্ষার্থ প্রার্থী হওয়ায় ও গর্ভস্থ সন্তান ক্ষত্র ধর্ম্মানুযায়ী হইবে না, ইহা প্রতিশ্রুত হওয়ায়, গর্ভ রক্ষা হয়।

———কায়াস্থো গর্ভ উত্তমঃ॥

তস্মাৎ কায়স্থ ইত্যাখ্যা ভবিষ্যতি শিশু শুভাঃ।

ইহার দ্বারায় প্রতীয়মান হয় যে শিশু তৎকালে "কায়াতে" (মাতৃকায়াতে) স্থিত, তজ্জন্যই কায়স্থ নামকরণ হইয়াছে। এবং মহর্ষি—

রামাজ্ঞয়া সদাল্‌ভ্যেন ক্ষত্র ধর্ম্মাদ্বহিষ্কৃতঃ।
কায়স্থ ধর্ম্মাদত্তোস্ম্যৈ চিত্রগুপ্তস্য যঃ স্মৃতঃ।
তাহাকে ক্ষত্র ধর্ম্ম হইতে বহিষ্কৃত করেন ও চিত্রগুপ্ত ধর্ম্ম প্রদান করেন।

এক্ষণে "অম্বষ্ঠ" সম্বন্ধে বিবেচনা করা হউক। অম্বা হইতে যে অম্বষ্ঠ শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে, তাহাতে কোনি সন্দেহ নাই। অম্বাতে অর্থাৎ মাতাতে (মাতৃ গর্ভেতে) স্থিত যে শিশু তাহাই অম্বষ্ঠ নামে অভিহিত হইয়াছে। সুতরাং "কায়াতে" স্থিত এবং "অম্বাতে" স্থিত যে একই কথা, তাহা অস্বীকার করিবার যোগ্য নহে। গ্রন্থকার ভবিষ্য পুরাণের "বর্ণাবর্ণদ্বয়ঞ্চৈব অম্বষ্ঠ্যা দাশ্চ সপ্তম" উল্লেখ করিয়া বলেন, যে "এই অম্বষ্ঠ হইতেই বোধ হয় অম্বষ্ঠ ক্ষত্রিয় বংশের উৎপত্তি হইয়াছে।" ভবিষ্য পুরাণের অম্বষ্ঠ চিত্রগুপ্তের অন্যতম পুত্র। তাঁহার এক পুত্রের দ্বারা অম্বষ্ঠ ক্ষত্রিয় উৎপত্তি হইলে, তদীয় অন্যতম পুত্র সৌরসেনা, অহিফণা প্রভৃতির বংশও তাহাদিগের নামেই পরিচিত হইত। যেমন কুরু, পাণ্ডু প্রভৃতি, ইঁহাদিগের বংশ উৎপত্তি হওনান্তর ঐ নামেই পরিচিত হইয়াছে। অথবা যেরূপ বলীরাজার পুত্র, অঙ্গ, বঙ্গ, পৌণ্ড্র ইত্যাদি হইতে তাঁহাদিগের শাসিত দেশের নামকরণ হইয়াছে, সেই রূপ হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু তেমন কোন স্পষ্ট প্রমাণ না থাকায় গ্রন্থকারের অনুমান সম্পূর্ণ অলীক। সুতরাং আমরা কায়স্থ ও অম্বষ্ঠকে যে এক ও অভিন্ন মনে করিলাম, তাহা পরিহার যোগ্য নহে।

আমরা এ স্থলে আর একটী কথা বলিয়া রাখি। পদ্মপুরাণ বলিতেছেন;—

ক্ষণং ধ্যানাস্থিতস্যাস্য সর্ব্বকায়াদ্বিনির্গতঃ।
* * * *
চিত্রগুপ্ত ইতি খ্যাত ধর্ম্মরাজ সমীপতঃ
* * * *
ব্রহ্মকায়োদ্ভবো যস্মাৎ কায়স্থ বর্ণ উচ্যতে।

ভবিষ্য পুরাণও এইরূপ স্বীকার করেন। ইঁহাদিগের মধ্যে মহর্ষি দালভ্যের রক্ষিত চন্দ্রসেন তনয়ের উল্লেখ নাই। অপিচ স্কন্দপুরাণে উক্ত আছে যে মহর্ষি দালভ্য চন্দ্রসেন তনয়কে ক্ষত্রধর্ম্ম বহিষ্কৃত করিয়া চিত্রগুপ্ত ধর্ম্ম

প্রদান করেন। ইহাতে অনুমান হয়. যে শেষোক্ত গ্রন্থ পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থাদির পূর্ব্বে রচিত হওয়ায় ঐ বিষয়ের উল্লেখ নাই।

পদ্ম পুরাণ—ব্রহ্মকায়া হইতে চিত্রগুপ্তের উৎপত্তি ও তদনুসারে কায়স্থ আখ্যা বলিতেছেন; স্কন্দ পুরাণ দ্বারায় বলা হইয়াছে যে চন্দ্রসেন তনয় মাতৃকায়াতে স্থিতি জন্য "কায়স্থ" নামে উক্ত হয়। চিত্রগুপ্তই আদি, তজ্জন্য তিনি ব্রহ্মকায়া হইতে উৎপত্তি বলিয়া উক্ত হইবেন, ইহা বিচিত্র নহে। সুতরাং তিনি ব্রহ্মকায়া হইতে উৎপত্তি এরূপ অনুমিত হইলেও, চন্দ্রসেন তনয় যে মাতৃকায়াতে স্থিতিজন্য কায়স্থ নামে অভিহিত ও উত্তরকালে অম্বষ্ঠ নামে বিবেচিত হইবেন, বিশেষ প্রণিধান করিলে, ইহা অযুক্তিক বোধ হইবে না।

বিষ্ণু পুরাণে "অম্বষ্ঠ" নামক জাতির উল্লেখ আছে। পাণিনী অম্বষ্ঠ শব্দের অর্থ দেশবিশেষ ও ক্ষত্রিয় জাতি বিশেষকে নির্দ্দেশ করেন। সুপ্রসিদ্ধ মহাভারতকার প্রাগুক্ত দুই অর্থেই অম্বষ্ঠ শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র অনুমান করেন যে, এই অম্বষ্ঠ ক্ষত্রিয় শ্রেণী হইতেই সেনবংশীয় রাজাগণ উদ্ভব হইয়া থাকিবেন। তিনি আরো অনুমান করেন যে, পূর্ব্বতন কালে, উত্তর পশ্চিম প্রদেশে, অম্বষ্ঠ নামক যে ক্ষত্রিয় জাতি ছিল, উত্তরকালে সাধারণে তাহাকেই মনূক্ত অম্বষ্ঠ (ইহারা ব্রাহ্মণের ঔরস ও বৈশ্যার গর্ভ জাত বর্ণসঙ্কর জাতি বিশেষ) নামক জাতিতে পরিগণিত করিয়া থাকিবে।

আমাদিগের দেশের প্রাচীন সংস্কার এই যে, সেনরাজগণ বৈদ্যবংশীয় ছিলেন। ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রমুখ ব্যক্তিগণ সেনবংশীয় রাজগণকে ক্ষত্রিয় প্রতিপাদনে বিশেষ যত্ন করিতেছেন। যদি সেন রাজাগণ ক্ষত্রিয় সাব্যস্ত হয়েন, তবে তাহার ফলভাগী বৈদ্যগণ কেন না হইবেন? বরং সোমবংশীয় উল্লেখ থাকায় "ওষধি নাথ" বা বৈদ্যবংশীয় অধিকতর যুক্তিসঙ্গত। ব্রহ্ম ক্ষত্রিয় বাক্যের দ্বারা ক্ষত্রিয় অনুমান করিলেও বৈদ্যগণের ক্ষত্রিয় হওয়া অসঙ্গত নহে। আমাদিগের গ্রন্থকার শ্রীমদ্ভাগবতের বিতথ রাজার বংশের শেষ ব্যক্তি ক্ষেমকের প্রসঙ্গে বলিতেছেন, যে "কলিতে ক্ষেমক হইতেই যদি ব্রহ্ম ক্ষত্রিয় কুলের অবসান হইয়া থাকে, তবে সেন বংশীয়দিগের ব্রহ্মক্ষত্রিয়ত্ব কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে? এ প্রশ্নের সদুত্তর সহজ সাধ্য নহে। এ

বিষয়ের অবশ্যই কোন কারণ আছে, ফল কথা সেন রাজগণ ক্ষত্রিয় ছিলেন।'' 'এ প্রশ্নের উত্তর সহজ সাধ্য নহে' অথচ 'সেন রাজাগণ ক্ষত্রিয় ছিলেন' ইহার তাৎপর্য্য কি? একখানি তাম্রফলকে বা প্রস্তর খণ্ডে লিখিত বাক্য, যাহা প্রকৃত পক্ষে দ্ব্যর্থঘটিত বলিয়াই সকলে স্বীকার করিবেন, তাহা যে বাস্তবিক দ্ব্যর্থ করিবার জন্যই লিখিত হইয়াছিল, এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত নহে এবং এ স্থলে একটি অর্থ পরিগ্রহণ করিয়া অপরটি পরিবর্জ্জন করা কিছুতেই সমীচীন বোধ হয় না।

তাম্র-শাসনে লিখিত "সোম বংশ" শব্দ দ্ব্যর্থঘটিত। আবার "ব্রহ্ম ক্ষত্রিয়" শব্দের অর্থ কেহ প্রধান ক্ষত্রিয় বলিতেছেন, কেহ 'বিতথের কুল' অর্থ করিতেছেন; কেহ কেহ বলিতেছেন, ব্রাহ্মণের ঔরস ও ক্ষত্রিয়ানীর গর্ভ জন্যই ব্রহ্মক্ষত্রিয় শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকিবেক। ইহার যাথার্থ অবধারণ করা সহজ নহে।

আমাদিগের ঘটকগণের গ্রন্থ কিন্তু বল্লালসেনের অব্যবহিত পরেই রচিত হইতে আরম্ভ হয়। এই সকল গ্রন্থ এবং জনশ্রুতি বিশেষত বক্তিয়ার খিলিজীর বঙ্গ বিজয়ের সমকালীয় ব্যক্তিগণের প্রমুখাৎ, লাক্ষণেয় সেন সম্বন্ধে মুসলমান ইতিহাসবেত্তা মেনহাজউদ্দীন যে সকল কথা শুনিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা কিছুতেই অবিশ্বাসযোগ্য নহে। তিনি সেন রাজাগণকে বৈদ্য বলিয়াই উল্লেখ করেন। সুপ্রসিদ্ধ আবুলফজল সেন রাজাগণকে যে কায়স্থ বলিয়াছেন, ইহার তাৎপর্য্য এই বোধ হয়, যে আকবরের দরবারের প্রধান প্রধান পণ্ডিতগণ "অম্বষ্ঠ" ও কায়স্থকে অভিন্ন বলাতেই তিনি সেন রাজাগণকে কায়স্থ উল্লেখ করিয়া থাকিবেন।

কায়স্থ ও বৈদ্যজাতির আচারগত কিছু বৈলক্ষণ্য থাকিলেও ইহাদিগকে স্বতন্ত্র অনুমান না করিবার হেতু আছে। কারণ আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, অদ্যাপিও পাশ্চাত্য কায়স্থগণ উপবীত ধারণ ও ক্ষত্রিয়বৎ অশৌচাদি ব্যবহার করেন। বেহার অঞ্চলের কায়স্থগণ উপবীত ধারণ না করিলেও গায়ত্রী জপ করিয়া থাকেন। রাজা রাজ বল্লভের পূর্ব্বে বৈদ্যজাতি উপবীত ধারণ করিতেন, কি না সন্দেহ। আন্দুলের রাজা রাজনারায়ণ দেবের পূর্ব্বে বঙ্গীয় কায়স্থগণ মধ্যে উপবীত ধারণ ও ক্ষত্রিয়বৎ অশৌ-

চাদি প্রতিপালনের চেষ্টা, বোধ হয়, না হইয়াই থাকিবে। বিক্রমপুর ও সোণার গ্রাম পরগণাতে এমন অনেক বৈদ্য ও কায়স্থ বংশীয় লোক আছেন যাঁহাদিগের পূর্ব্ব পুরুষের মধ্যে কন্যাপুত্রের আদান প্রদান চলিত। বিক্রম পুরে আদিশূর ও বল্লালসেনের রাজধানী ছিল। পঞ্চ কায়স্থ প্রথমে ঐ স্থানেই বিপ্রগণ সহ সমাগত হয়েন। পূর্ব্বে উক্ত প্রদেশে কোন কোন বৈদ্য ও কায়স্থ বংশে কন্যাপুত্রের আদান প্রদানের প্রথা থাকায় ইহাই প্রমাণিত হইতেছে যে, কান্যকুব্জাগত পঞ্চ কায়স্থ আদিশূরের সবংশীয় ও বৈদ্যগণ তাঁহার বঙ্গীয় জ্ঞাতি বিধায়, সদাচারসম্পন্ন পঞ্চ কায়স্থের সমকালে না হউক, তাঁহাদিগের উত্তরকালে উক্ত প্রথা প্রচলিত হইয়াছিল। এখনও চট্টল ও কুমিল্লা প্রদেশে কায়স্থ ও বৈদ্যজাতি মধ্যে বৈবাহিক ক্রিয়া সম্পন্ন হইতেছে।

আমরা দেখিতে পাই যে, যে সমাজে যতই ধনবান ও বিদ্বানের আবির্ভাব যখনই হইয়াছে, সে সমাজের বন্ধন তখনই অধিক দৃঢ়তর ও অন্য হইতে স্বাতন্ত্র্য লাভ করিয়াছে। রাজা রাজবল্লভ বৈদ্যজাতির কতকগুলি ঘর লইয়া একটী স্বতন্ত্র দল সৃষ্টি ও কতকগুলি প্রথা প্রচার করেন। উত্তরকালে ঐ দলই পরিপুষ্টি হয়। আমরা অবগত আছি, যে কুমিল্লা প্রদেশে এক সম্প্রদায় আচারভ্রষ্ট কায়স্থ আছে, তাহারা শুঁড়ী প্রভৃতি শূদ্রজাতির সহিত কন্যার বিবাহ প্রদান করে, কিন্তু তাহাদিগের কন্যা গ্রহণ করে না। এবং যে কন্যাকে দান করে, তাহার রন্ধন দ্রব্য ভক্ষণ করে না। ইহাদিগের মধ্যে যাহারা ধনী ও বিদ্বান হইতেছে, তাহারা কিন্তু স্বাতন্ত্র্যলাভের চেষ্টায় আছে।

ঘটকগণের মধ্যে অধিকাংশই সৎ ব্রাহ্মণ। ইহাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ বিশেষ বিদ্যাবুদ্ধি সম্পন্ন ছিলেন। নতুবা তাঁহাদিগের প্রতি বংশের নামাদি রক্ষণের ভার অর্পিত হইবে কেন? "বৈদ্যগণের অনেকের সেন উপাধি আছে, সেনবংশীয় রাজাগণ সেনান্ত নামে বিখ্যাত" এই ধারণা বলেই ঘটকগণের বুদ্ধিতে বৈদ্যগণ সেনবংশীয় বলিয়া অনুমিত হইয়াছে, এমন কথা বলা যাইতে পারে না। কারণ ভীমসেন, চন্দ্রসেন প্রভৃতির "সেন" শব্দ যে নামের একটী অংশ তাহা বিলক্ষণ তাঁহাদিগের জানা ছিল। কায়স্থ ও অন্যান্য কতিপয় জাতিতেও সেন উপাধি আছে। বাস্তবিক

সেনবংশীয় রাজগণ বৈদ্য ছিলেন, এই জন্যই, ঘটকগণ ও জনশ্রুতি তাঁহাদিগকে বৈদ্য বলিয়া প্রমাণ করিতেছে। তাঁহাদিগকে বৈদ্য ঠিক রাখিয়া, কায়স্থই করুন বা যাহাই করুন, সে স্বতন্ত্র কথা।

এ পর্য্যন্ত বৈদ্য ও কায়স্থ জাতি এক মূল হইতে উৎপত্তি এরূপ বলা হইল, এজন্য কেহ এরূপ মনে করিবেন না, যে আমরা উচ্ছৃঙ্খলতা পরতন্ত্র হইয়া বহুকালগত সমাজ বন্ধনকে ছিন্ন করিতে উদ্যত হইয়াছি। প্রকৃত যুক্তির অনুসরণ করিলে "কায়স্থ" ও "অম্বষ্ঠ" যেরূপ ভাবে পরিগৃহীত হইতে পারে, তাহাই আলোচিত হইয়াছে মাত্র। বহুকালাগত সামাজিক স্বাতন্ত্র্যে কায়স্থ ও বৈদ্যজাতি বিভিন্নভাবে আছেন। এক্ষণে "পরধর্ম্ম ভয়াবহ" পরিগ্রহণ করিলে সমাজ স্বপদে প্রতিষ্ঠিত থাকিবে কেন!

আমাদিগের আর একটি নিবেদন এই যে, কায়স্থগণ আপনাদিগের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপাদন করিতে যাইয়া নিরর্থক তর্কের বিষয়ীভূত না হয়েন। কায়স্থগণ ক্ষত্রিয় হইলেও ব্রাহ্মণের নিম্নে ব্যতীত, কখনই ব্রাহ্মণের সমানে হিন্দুসমাজে স্থান লাভ করিতে পারিবেন না। বঙ্গদেশে, ব্রাহ্মণের নিম্নেই কায়স্থগণ আসন লাভ করিয়াছেন। কায়স্থগণ হিন্দু সমাজে যে অধিকার বিস্তীর্ণ করিয়া এক্ষণে বর্ত্তমান আছেন, তাহা বাস্তবিক ক্ষত্রিয়ত্ব হইতে ন্যূন নহে! বঙ্গদেশে প্রথমে ব্রাহ্মণ ও শূদ্র ভিন্ন জাতি না থাকায়, তদানীন্তন বিপ্রগণ কায়স্থগণকে শূদ্রবৎ শাসনাধীন করিয়াছেন। এই জন্য স্মৃতিশাস্ত্রে কায়স্থগণ শূদ্রবৎ শাসনাধীন মাত্র এবং বহু পুরুষ পরম্পরায় ঐ ভাবেই তাঁহারা চলিয়া আসিতেছেন। ইহাতে কায়স্থ জাতির অগৌরব কি, তাহা আমরা বুঝিতে সমর্থ নহি।

কায়স্থ জাতির ক্ষত্রিয়ত্ব সম্বন্ধে গ্রন্থকারের ক্ষুদ্র পুস্তকের প্রায় অর্দ্ধাংশ আলোচিত হইয়াছে। বোধ হয় এই জন্যই তিনি সমালোচ্য গ্রন্থকে কায়স্থ জাতির ইতিবৃত্ত নাম দিয়াছেন। কিন্তু এই ইতিবৃত্তে গ্রন্থকারের নিকট আমরা আরও গুরুতর গবেষণা পাইবার আশা করিয়াছিলাম। (ক্রমশ)

শ্রীকৃষ্ণচরণ মজুমদার।

নবজীবন।

৫ম ভাগ। } শ্রাবণ ১২৯৬ সাল। { ১১শ সংখ্যা।

পাতঞ্জল যোগসূত্রম্।

যোগাঙ্গানুষ্ঠানাদশুদ্ধিক্ষয়ে জ্ঞানদীপ্তিরাবিবেকখ্যাতেঃ। ২৮॥

পদচ্ছেদঃ। যোগ-অঙ্গ-অনুষ্ঠানাৎ, অশুদ্ধিক্ষয়ে, জ্ঞানদীপ্তিঃ, আ-বিবেক-খ্যাতে॥

পদার্থঃ। যোগাঙ্গানি বক্ষ্যমাণানি যম নিয়মাদীন্যষ্টৌ, তেষাং অনুষ্ঠানাৎ পুনঃ পুনর্জ্ঞানপূর্ব্বকাভ্যাসাৎ, অশুদ্ধির্নাম চিত্তসত্ত্বস্য প্রকাশাবরণলক্ষণ ক্লেশরূপা পঞ্চপর্ব্বা তস্যাঃ ক্ষয়োনাশস্তস্মিন্ সতি জ্ঞানস্য দীপ্তিঃ সম্যক্ অভিব্যক্তিঃ আ বিবেকখ্যাতেঃ বিবেকখ্যাতির্নাম প্রকৃতিপুরুষস্বরূপ বিজ্ঞানং তৎ পর্য্যন্তং।

অন্বয়ঃ। যোগাঙ্গানুষ্ঠানাদশুদ্ধিক্ষয়েঽসতি, আবিবেকখ্যাতেজ্ঞানদীপ্তির্ভবতীতি শেষঃ।

ভাবার্থঃ। সাধনমন্তরেণ ন সিদ্ধির্ভবতীতি অভিপ্রেত্যাহ যোগাঙ্গানুষ্ঠানাদিতি যোগাঙ্গানাংবক্ষ্যমাণানাং যমনিয়মপ্রভৃতীনাং অনুষ্ঠানাৎ পুনঃ পুনরভ্যাসাৎ হেতোঃ চিত্ত সত্ত্বাবরক ক্লেশ রূপায়া অশুদ্ধের্নাশে সতি জ্ঞানস্য সম্যক্ অভিব্যক্তির্ভবতি বিবেক খ্যাতি পর্য্যন্তং তথাহি যথা যথা সাধনান্যনুষ্ঠীয়ন্তে তথা তথা। শুদ্ধিঃ তনুত্ব মাপদ্যতে, যথাযথাচাশুদ্ধিঃ ক্ষীয়তে তথা তথা চ ক্ষয়ক্রমানুরোধিনী জ্ঞানস্যাপি দীপ্তির্বিবর্দ্ধতে, সা খলু বৃদ্ধি

যাবিবেকখ্যাতেঃ প্রকৃতিপুরুষস্বরূপজ্ঞানং ভবতি তাবৎ পর্য্যন্ত মিত্যর্থঃ প্রকর্ষ মনুভবতি। যোগাঙ্গানুষ্ঠানমশুদ্ধে র্বিয়োগকারণং যথা পরশুঃ ছেদ্যস্য বিবেকঃ খ্যাতেস্তুপ্রাপ্তিকারণম্ যথা ধর্ম্মঃসুখস্য্ চ কিঞ্চাশুদ্ধি ক্ষয়দ্বারা যম নিয়মা-স্তর্গত কর্ম্মণাং জ্ঞানহেতুত্বসিদ্ধিরতএব—

কর্ম্মণা সহিতাজ্জ্ঞানাৎ সম্যগ্ যোগাভিজায়তে।

জ্ঞানঞ্চ কর্ম্ম সহিতং জায়তে দোষবর্জ্জিতম্।

অনুবাদ। যম, নিয়ম, প্রভৃতি আট প্রকার যোগাঙ্গের বারম্বার অভ্যাস দ্বারা চিত্তাবরকক্লেশরূপ অশুদ্ধির ক্ষয় হইলে, বিবেকখ্যাতি পর্য্যন্ত অর্থাৎ প্রকৃতি পুরুষের স্বরূপোপলব্ধি পর্য্যন্ত, জ্ঞানের বৃদ্ধি হয়।

সমালোচন। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে স্থির অর্থাৎ স্থায়িতাপ্রাপ্ত বিবেক খ্যাতিই জ্ঞানের উপায়। সুতরাং পুরুষার্থ লাভ করিতে হইলে, প্রথমে বিবেক খ্যাতির প্রাপ্তি আবশ্যক। বর্ত্তমান সূত্রে সেই বিবেক খ্যাতির প্রাপ্তি কিরূপে হয়, তাহাই বলা হইতেছে।

যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার এই পাঁচটি যোগের অঙ্গ, ইহা-দের প্রত্যেকের স্বরূপ পরে বলা হইবে। এই যোগাঙ্গ সকলের বারম্বার অনু-ষ্ঠান অর্থাৎ অভ্যাস করিলে, আমাদিগের চিত্তের প্রকাশ শক্তির আবরক ক্লেশ রূপা অবিদ্যার ক্ষয় হয়। অবিদ্যাদ্বারা চিত্তের প্রকাশ শক্তির অবরোধ থাকাতেই, আমাদের অজ্ঞানের প্রাদুর্ভাব। ঐ চিত্তের অবরোধের যত ক্ষয় হয়, ততই আমাদের অজ্ঞানের নাশ এবং জ্ঞানের প্রাদুর্ভাব হয়। এইরূপে জ্ঞানের বৃদ্ধি হইতে হইতে অবশেষে আমাদের প্রকৃতি ও পুরুষের স্বরূপ উপলব্ধির অর্থাৎ বিবেক খ্যাতির উদয় হয়। যদি বল, যম-নিয়মাদি কর্ম্ম, তাহারা তত্ত্বজ্ঞানের হেতু কিরূপে হইতে পারে? ইহার উত্তরে বিজ্ঞানভিক্ষু বলি-য়াছেন, যে ঐ সকল কর্ম্মদ্বারা অবিদ্যার ক্ষয় হয়, অবিদ্যার ক্ষয় হইতেই জ্ঞানের উৎপত্তি হয়। কূর্ম্ম পুরাণে—এই কথাই বলা হইয়াছে, কর্ম্ম সহচর জ্ঞান হইতে সম্যক্ প্রকার যোগ উৎপন্ন হয়। কর্ম্ম সহচর জ্ঞানও সম্পূর্ণ দোষ শূন্য হইতে পারে। ভাষ্যকার বলেন, পরশু যেমন ছেদ্য বস্তুর বিয়ো-গের কারণ, এই যোগাঙ্গ কর্ম্ম সকল সেইরূপ অশুদ্ধির নাশের কারণ এবং ধর্ম্ম যেমন সুখের প্রাপ্তির কারণ, সেইরূপ যোগাঙ্গ কর্ম্ম বিবেক খ্যাতির প্রাপ্তির

কারণ অর্থাৎ ধর্ম্ম যেমন সুখোৎপত্তির প্রতিবন্ধক দুরদৃষ্টের নিবৃত্তি করে, সেই-রূপ যোগাঙ্গসকল কর্ম্মের অনুষ্ঠান ও বিবেক খ্যাতি বা তত্ত্বজ্ঞানের প্রতিবন্ধক অশুদ্ধির নিবৃত্তি করে; তাহাতেই কারণ বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। সচরাচর কারণ শব্দ যে অর্থে ব্যবহৃত হয়, এখানে কারণ শব্দ সে অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই। পূর্ব্বাচার্য্যগণ নয় প্রকার কারণের নির্দ্দেশ করিয়াছেন যথা,—(১) উৎপত্তি কারণ, (২) স্থিতিকারণ, (৩) অভিব্যক্তি কারণ, (৪) বিকার কারণ, (৫) প্রত্যয় কারণ, (৬) আপ্তিকারণ, (৭) বিয়োগকারণ, (৮) অন্যত্বকারণ, এবং (৯) ধৃতিকারণ। ইহাদের মধ্যে উৎপত্তি কারণ বলিতে উপাদান কারণ, যেমন, মন জ্ঞানের উৎপত্তি কারণ। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি সমুদায় বৃত্তিই মনের পরিণাম মাত্র, জ্ঞানও এক প্রকার বৃত্তি সুতরাং উহার উপাদান মন। যাহা কোন বস্তুর অবস্থানের প্রতি কারণ হয়, তাহার নাম স্থিতিকারণ যেমন পুরুষার্থতা অর্থাৎ ভোগাপবর্গ মনের স্থিতির প্রতি কারণ; কেননা ভোগাপবর্গ সমাপ্তি হইলে, মনের আপনা আপনিই লয় হয়। অভি-ব্যক্তি দুই প্রকার; প্রথম বুদ্ধি অর্থাৎ প্রকাশ, দ্বিতীয় বোধ অর্থাৎ তদ্বিষয়ে পুরুষের জ্ঞান। প্রকাশরূপ অভিব্যক্তির প্রতি আলোক কারণ এবং পুরুষের জ্ঞানরূপ অভিব্যক্তির প্রতি রূপজ্ঞান কারণ। বিকার বলিতে অবস্থান্তর প্রাপ্তি; তাহার প্রতি কারণকে বিকার কারণ বলা যায়; অগ্নি যেমন পাক্য বস্তুর বিকার কারণ। কোন বিষয়ে মন একাগ্র হইলে অপর প্রলোভন বিষয় তাহার সম্মুখে আসিয়া উহাকে আপনার দিকে আকর্ষণ করিয়া একাগ্রতা ভঙ্গ করে; এস্থলে ঐ বিষয়ান্তরকে মনের বিকার কারণ বলা যায়। প্রত্যয় শব্দের অর্থ প্রমাণ নিশ্চয়; যেমন পর্ব্বতে অগ্নি আছে ইহা লোকমুখে জানা থাকিলে, পরে দূর হইতে ধূম দেখিলে, সেই পূর্ব্ব বহ্নি জ্ঞানের নিশ্চয় হয়; কাযেই ধূম দর্শন বহ্নি জ্ঞান নিশ্চয়ের কারণ; এইরূপ কারণকে প্রত্যয় কারণ বলে। আপ্তি এবং প্রাপ্তি একই; আপ্তিকারণ বলিতে সেইরূপ কারণ বুঝিতে হইবে, যাহা কোন বস্তুর উৎপত্তির প্রতিবন্ধকদিগকে নিবৃত্তি করে; যেমন যোগানুষ্ঠান বিবেক খ্যাতির প্রতিবন্ধকের নিবৃত্তি করে বলিয়া উহার আপ্তিকারণ। বিয়োগকারণ বলিতে কোন বস্তুর বিনাশ বা ধ্বংসের কারণকে বুঝিতে হইবে; যেমন মশকের প্রতি ধূম বিয়োগ কারণ। অন্যত্ব

কারণ বলিতে রূপভেদের কারণ। যেমন সুবর্ণের কটক ভাঙ্গিয়া কুণ্ডল গড়িলে, যাহাদ্বারা কটকের কুণ্ডলরূপে পরিণাম হয়, উহা কটকের অন্যত্ব কারণ এবং সুবর্ণের বিকার কারণ। আরও দেখ একই স্ত্রীজ্ঞান অবিদ্যা প্রভাবে মোহজনক, দ্বেষবশত দুঃখজনক, অনুরাগবশত সুখজনক এবং তত্ত্বজ্ঞানবশত বৈরাগ্যের কারণ হয়, অর্থাৎ অবিদ্যাযুক্ত ব্যক্তি কোন এক সুন্দরী স্ত্রীর নাম শুনিয়াই মূঢ় অর্থাৎ হিতাহিত বিবেকশূন্য হইয়া পড়ে, দ্বেষপরবশ ব্যক্তি সেরূপ স্ত্রী তাহার নাই ভাবিয়া দুঃখ ভোগ করে, বিষয়াসক্ত ব্যক্তি তাহাতে সুখ অনুভব করে এবং তত্ত্বজ্ঞানী অবিচলিত চিত্তে অবস্থান করেন। এখানে দেখা যাইতেছে, অবিদ্যা, দ্বেষ, রাগ, এবং তত্ত্বজ্ঞান একই স্ত্রী জ্ঞানের মূঢ়ত্বাদি ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তির উৎপাদক; কাযেই উহাদিগকে স্ত্রীজ্ঞানের অন্যত্ব কারণ বলা যাইতে পারে। ধৃতিকারণ বলিতে আশ্রয়রূপে ধারক, যেমন শরীর ইন্দ্রিয়দিগের ধারক বা ধৃতিকারণ, এবং ইন্দ্রিয় সকল ও শরীরের ধৃতিকারণ; মহাভূতসকল শরীরের ধারক এবং মহাভূতগণ পরস্পর পরস্পরের ধারক। এইরূপ তির্য্যগ্‌জাতীয় শরীর, মনুষ্য জাতীয় শরীর, ও দৈব শরীর পরস্পর পরস্পরের ধৃতিকারণ। এই নয় প্রকার কারণ ব্যাখ্যাত হইল। যোগাঙ্গ কর্ম্মসকল তত্ত্বজ্ঞান বা বিবেক খ্যাতির প্রাপ্তির কারণ বলা হইল। সেই যোগাঙ্গ কর্ম্মগুলি কি? এই জিজ্ঞাসার উত্তরে পরসূত্রের অবতারণা করিতেছেন।

যম নিয়মাসন প্রাণায়াম প্রত্যাহার ধারণ ধ্যান সমাধয়োঽষ্টাবঙ্গানি।২৯॥

পদচ্ছেদঃ। যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণ, ধ্যান, সমাধয়ঃ অষ্টৌ অঙ্গানি।

পদার্থঃ। যমাদি স্বরূপস্য সূত্রকৃতৈব বক্ষ্যমাণত্বাৎ অত্র তদর্থ দর্শনং গ্রন্থগৌরবায়ৈবেতি জ্ঞেয়ং।

অন্বয়ঃ। এতে অষ্টৌ অঙ্গানি যোগস্যৈবেতিশেষঃ।

অনুবাদ। যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণ, ধ্যান এবং সমাধি এই আটটি যোগের অঙ্গ।

সমালোচন। সূত্রকার নিজেই এক একটি সূত্রদ্বারা যমাদির স্বরূপ নির্দ্দেশ করিবেন সুতরাং এখানে তাহাদের বিষয় আড়ম্বর করিয়া বলিয়া গ্রন্থগৌরব করিবার প্রয়োজন নাই? তবে এইমাত্র বলা যাইতে পারে, যে ইহাদের মধ্যে কতকগুলি সমাধির সাক্ষাৎ উপকারী, এই নিমিত্ত অন্তরঙ্গ; যেমন ধারণাদি; এবং কতকগুলি প্রতিপক্ষ হিংসাদির উন্মূলন দ্বারা সমাধির উপকারক; যেমন যমনিয়মাদি; আবার আসনাদি কতকগুলি পরস্পর পরস্পরের উপকার করে। কেহ আশঙ্কা করিয়াছিল, যে প্রথম পাদে অভ্যাস, বৈরাগ্য, শ্রদ্ধা, প্রাণায়াম, প্রভৃতি কতকগুলি অঙ্গ উক্ত হইয়াছে। এবং এই দ্বিতীয় পাদের প্রথমে তপঃ স্বাধ্যায়, ঈশ্বর প্রণিধান প্রভৃতি মধ্যম সাধনের কথাও বলা হইয়াছে; যমাদি দ্বারা ত আবার সেই গুলিরই উক্তি হইতেছে, অতএব উহাদের পুনরুক্তিরূপ দোষ হইয়াছে, না বলিব কেন? ইহার উত্তরে বিজ্ঞান-ভিক্ষু বলেন, এখানে কেবল সেই গুলির কথা যদি বলা হইত, তবে পুনরুক্তি হইত কিন্তু এখানে তাহাদের সহিত আরও কতকগুলি নূতন সাধনের কথা বলা হইয়াছে এবং উহারা যোগ ও জ্ঞান উভয়ের সাধন বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, কাযেই পুনরুক্তি নাই। তিনি বলেন বৈরাগের সন্তোষে, শ্রদ্ধা প্রভৃতির তপআদিতে এবং পরিকর্ম্মদিগের ধারণাদিত্রয়ের মধ্যে প্রবেশ আছে বালিয়া এবং শ্রবণ ও মনন জ্ঞানের প্রতি সাক্ষাৎ হেতু বলিয়া প্রমাণ সিদ্ধ থাকায়, এস্থলে তাহাদের বর্ণনা করা হইল না।

অহিংসাসত্যাস্তেয় ব্রহ্মচর্য্যাপরিগ্রহা যমাঃ ।৩০॥ *

পদচ্ছেদঃ। অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য, অপরিগ্রহা যমঃ।

পদার্থঃ। প্রাণ বিয়োগ প্রয়োজন ব্যাপারো হিংসা, সাচ সর্ব্বানর্থ হেতুঃ তদভাবঃ অহিংসা; সর্ব্বথা, সর্ব্বদা সর্ব্বভূতানামনভিদ্রোহ ইতি যাবত্। সত্যং বাঙ্মনসয়োর্যথার্থত্বং। পরস্বাপহরণং স্তেয়ং, তদভাবঃ অস্তেয়ং। ব্রহ্ম-চর্য্যং ভোগসাধনানামস্বীকরণং। যমাঃ যম শব্দ বাচ্যা।

অন্বয়ঃ। এতে অহিংসাদয়ঃ পঞ্চ যমাঃ কথ্যন্তে ইতি শেষঃ।

---

* কোন কোন পুস্তকে, 'তত্রাহিংসা' এইরূপ পাঠ আছে; কোন কোন পুস্তকে 'তত্র' সূত্র হইতে পৃথক করা আছে। কোন কোন পুস্তকে 'তত্র' একেবারেই নাই।

অনুবাদ। অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য এবং অপরিগ্রহ ইহাদিগকে যম বলা হয়।

সমালোচন। যম ধাতুর অর্থবন্ধন। মত্ত হস্তীর মত, প্রবল বিষয় তৃষ্ণায় সর্ব্বদা ইতস্তত প্রধাবিত চিত্তের বেগ নিরোধকারী কার্য্য সকলের নাম যম। চিত্ত—সত্ত্ব রজ ও তম এই—ত্রিগুণময়, ইহা অনেক বার বলা হইয়াছে এবং উহার বৃত্তি সকল ত্রিগুণময় ইহাও অনেক বার বলা হইয়াছে। অনেক বার ইহাও বলা হইয়াছে, যে যখন চিত্তে সত্ত্বময় বৃত্তি সকল প্রবল থাকে, তখন উহা প্রকাশ স্বরূপ স্থিরতা এবং একাগ্রতা প্রাপ্ত হয়। যখন উহাতে রজঃ ও তমোময় বৃত্তি সকল প্রবল থাকে, তখনই উহা চঞ্চল বিষয়াসক্ত এবং অজ্ঞানে আবৃত হইয়া নানাবিধ পাপাচরণে প্রবৃত্ত হয়। কাম, ক্রোধ, লোভ মোহ বৃত্তি সকল রজ ও তমোময়। এই সকল বৃত্তি অসংখ্য হইলেও ইহাদের ব্যাপার (action) সকলকে সাধারণত পাঁচ প্রকারে বিভক্ত করা যাইতে পারে। যথা প্রথম অপরকে উৎপীড়ন করা, পরের অনিষ্ট করা, পরের প্রাণনাশ করা ইত্যাদি; ইহাদিগের সাধারণ নাম হিংসা। দ্বিতীয় পরকে প্রবঞ্চনা করা বাক্য এবং কার্য্য দ্বারা। তৃতীয় পরের দ্রব্য পরের অজ্ঞাতসারে গ্রহণ করা, পরের গচ্ছিত ধন পুনর্ব্বার তাহাকে না দেওয়া; ইহা সচরাচর চৌর্য্য বা অপহরণ বলিয়া প্রসিদ্ধ। চতুর্থ ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করা। পঞ্চম প্রার্থনা পূর্ব্বক ভোগ্য বস্তুর গ্রহণ ইত্যাদি। আমাদের চিত্তের রজোগুণোময়ী বৃত্তি সকলের ব্যাপারগুলি উপরি উক্ত পাঁচ প্রকারে বিভক্ত থাকায় চিত্ত ও সাধারণত এই পাঁচ প্রকার ব্যাপারে ব্যাপৃত থাকে। অতএব যে সকল কার্য্য চিত্তকে ঐ পাঁচ প্রকার ব্যাপার হইতে রুদ্ধ করিবার নিমিত্ত (যেন) বন্ধন করিয়া রাখে অর্থাৎ উহার গতি নিবৃত্তি করে, তাহাদিগকে যম বলা হয়। পূর্ব্বোক্ত পাঁচ প্রকার ব্যাপার হইতে চিত্তকে রুদ্ধ করে বলিয়া যমও সাধারণত পাঁচ প্রকারে বিভক্ত হইয়াছে। যথা (১) অহিংসা (২) সত্য (৩) অস্তেয় (৪) ব্রহ্মচর্য্য এবং (৫) অপরিগ্রহ। অহিংসা সকল প্রকার জীবের উপর কোন প্রকারে কোন সময় বিদ্রোহাচরণ না করা। যম ও নিয়মের অন্তর্গত যত প্রকার কর্ম্ম উক্ত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে কোন প্রকার জীবের প্রতি কোন কালে উৎপীড়ন না করাই শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম; এই নিমিত্ত

প্রথমে উহার উক্তি হইয়াছে। তবে এখানে ইহাও অবশ্য জ্ঞাতব্য, যে পরের ক্লেশ হইবে বলিয়া অথবা তাহা হইতে আপনার সুখ হইবে বলিয়া, ইচ্ছা পূর্ব্বক পরের প্রতি কোন রূপ বিদ্রোহাচরণ করার নামই হিংসা নতুবা আমরা যে নিত্য কর্ম্ম করিতে, হাত নাড়িতে, পা নাড়িতে, শয়ন করিতে, উপবেশন করিতে, অজ্ঞাতসারে শত শত ক্ষুদ্র জীবের প্রাণ সংহার করি, তাহা হিংসা বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। আমাদের চতুষ্পার্শ্বে, জলে, স্থলে, আকাশে, বায়ুতে, এমন কি আমাদের শরীরের প্রতি লোমকূপে, এত অসংখ্য কীটাণু বাস করে, যে আমাদের প্রতিপদক্ষেপে, এক এক ঢোঁক জল পানে, প্রতি শ্বাস গ্রহণে এবং এক এক বার গাত্র কণ্ডূয়নাদি করিবার সময় এত ক্ষুদ্র জীবের প্রাণবিয়োগ হয়, তাহার আর ইয়ত্তা নাই। আমরা সবিশেষ যত্নবান্‌ এবং সাবধান হইয়াও উহাদিগের প্রাণনাশ না করিয়া থাকিতে পারি না। যাহারা ঐ সকল কীটাণুরও প্রাণ নাশ না করিবার চেষ্টা করিয়া, কতকগুলি বাহ্যাড়ম্বর করিয়া বেড়ায়, তাহারা কেবল অহিংসা শব্দের অর্থে অনভিজ্ঞ নয়, পরমেশ্বর সৃষ্ট প্রাণিতত্ত্বেও সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। তাহারা বুঝে না, যে তাহাদের ঐ বাহ্যাড়ম্বরের দরুণ, ঐরূপ কীটাণুর বরং আরও অধিক পরিমাণে বিনাশ হইয়া থাকে। ভাষ্যকার বলেন, সত্য আদি যাবদীয় কর্ম্ম এই অহিংসারই সাধক। চিত্ত যতই নির্ম্মল হয় ততই হিংসা মন হইতে নিবৃত্ত হয়। ব্রাহ্মণ যতই ব্রত আদি ধর্ম্মাচরণ করিতে থাকে, ততই প্রমাদকৃত হিংসার নিদান হইতে নিবৃত্ত হইয়া সুনির্ম্মল অহিংসারই অনুষ্ঠান করে। মোক্ষ ধর্ম্মেও উক্ত হইয়াছে, যে যেমন হস্তিপদের মধ্যে সমুদয় পদ প্রবিষ্ট হয়, সেইরূপ অহিংসাতে সকল প্রকার ধর্ম্মার্থ সন্নিবিষ্ট।

সত্য। ভাষ্যকার সত্য শব্দের লক্ষণ করিলেন, 'যথার্থে বাঙ্মনসে' বাক্য ও মনের যথার্থতার নাম সত্য। মন শব্দের অর্থ এখানে তাৎপর্য্য বা অভিসন্ধি অর্থাৎ যেরূপ দেখিবে, যেরূপ অনুমান করিবে, বা যেরূপ শুনিবে ঠিক্‌, সেইরূপ অর্থ প্রকাশক, সেইরূপ তাৎপর্য্যে বা অভিসন্ধিতে প্রযুক্ত বাক্যের নাম সত্য। কেবল প্রকৃত বা যথার্থ অর্থ প্রকাশক বাক্যকে সত্য বলা যায় না, তাহ'লে যুধিষ্ঠিরের "অশ্বত্থামা হতো গজ !" এই বাক্যটি মিথ্যা হইত না। কারণ তৎকালে বাস্তবিকই অশ্বত্থামা নামে একটি হস্তীর মৃত্যু হইয়াছিল।

কিন্তু ঐ বাক্যের উচ্চারক যুধিষ্ঠিরের মন, তাৎপর্য্য বা অভিসন্ধি ঠিক 'হাতী মরেচে' এইরূপ বুঝানতে ছিল না কিন্তু উহা দ্বারা দ্রোণ পুত্র অশ্বত্থামার মৃত্যু হইয়াছে এইরূপ বোধ করানই তাঁহার তাৎপর্য্য বা অভিসন্ধি ছিল, সুতরাং যথার্থ অর্থ প্রকাশক বাক্যও বিভিন্ন তাৎপর্য্য বা অভিসন্ধিতে প্রযুক্ত হওয়ায়, উহা সত্য না হইয়া মিথ্যা হইল; সেই পাপে আজন্ম সত্য-শীল যুধিষ্ঠিরেরও নরক দর্শন হইল। তাৎপর্য্য বা অভিসন্ধির—ভাষা অর্থ মৎলব্—ইংরাজী অর্থ, motive। ভাষ্যকার সত্য বুঝাইবার জন্য আরও একটু খুলিয়া বলিয়াছেন। তিনি বলেন আপনার মনে যেরূপ জ্ঞান আছে, অপরের মনে ঠিক সেইরূপ জ্ঞানের উদয় করিয়া দিবার অভিপ্রায়ে যে কথা বলা হয়, তাহা যদি বঞ্চিতা অর্থাৎ বিপরীতার্থ বোধ করাইবার অভিপ্রায়ে প্রযুক্ত, ভ্রান্তা অর্থাৎ ভ্রমবশে প্রযুক্ত এবং প্রতিপত্তিবন্ধ্যা অর্থাৎ অভিপ্রেত অর্থ বোধ করাইবার নিমিত্ত অক্ষম না হয়, তাহা হইলেই উহাকে সত্য বলা যায়। সমুদয় প্রাণিবর্গের উপকারের নিমিত্ত ভগবান্ বিধাতা এই সত্য বাক্যের সৃজন করিয়াছেন, ইহা দ্বারা জীবগণের কোনরূপ অহিত হইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু যদি ঐরূপ বাক্য কখন কোন প্রাণীর অহিতের কারণ হয়, তখন উহার সত্যত্ব থাকে না। অর্থাৎ যদি কোন দস্যু গ্রামস্থ কোন ধনীর বাসস্থান জিজ্ঞাসা করে সে স্থলে, সত্য বাক্য বলা উচিত নয়, কারণ আমার সত্য কথার দরুণ একজন নিরপরাধ ধনীর সর্ব্বস্বান্ত হইবার সম্ভাবনা, সুতরাং সত্য তখন পুণ্যের কারণ না হইয়া,পাপের কারণ হইয়া উঠে। অনেকে এস্থলে শাস্ত্রকারদিগের বচনের প্রকৃত অর্থ না বুঝিয়া,বলিয়া থাকেন, যে কোন ব্রাহ্মণ যদি আমার সম্মুখে কাহাকে হত্যা করে,তাহলে ব্রাহ্মণের প্রাণ রক্ষার্থ রাজদ্বারে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া উচিত। এক্ষণে বিচার করিয়া দেখ, শাস্ত্র-কারেরা ব্রাহ্মণ শূদ্র কোন বিশেষ করিয়া বলেন নাই, তাঁহারা সামান্যরূপে বলিয়াছেন, সত্য কথা বলিলে যদি কোন প্রাণীর হানি হয়, সেরূপ স্থলে ঐ সত্য সত্য না হইয়া বরং পাপের কারণ হইয়া উঠে। এস্থলে যে নিরপরাধ প্রাণীর হানি, তাঁহাদের অভিপ্রেত সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই; অপরাধীকে দণ্ড হইতে রক্ষা করা যদি তাঁহাদের অভিপ্রেত হইত,তবে তাঁহাদের অপরা-ধীর দণ্ড বিধানের কোন আবশ্যকতা থাকিত না। তবে যে স্থলে দুষ্ট

অভিপ্রায়ে নয়, কিন্তু নিহত ব্যক্তি দ্বারা অন্যায় রূপে উত্তেজিত হইয়া হত্যাকারী উহার হত্যা করিয়াছে, সে স্থলে হত্যাকারী এক প্রকার নিরপরাধ, সে ব্রাহ্মণই হউক, আর শূদ্রই হউক, তাহার রক্ষার্থ সত্য না বলিলে, কোন দোষ হয় না। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, যে গ্রামস্থ কোন ভদ্র লোকের টায়টোয় ৫০০ শত টাকা আয় হইতে পারে, এইরূপ আমার বিশ্বাস। বিশ্বাসের কারণ, তিনি সম্বৎসর সপরিবারে আধপেটা খেয়ে এবং নানাবিধ কষ্ট সহ্য করে অতিবাহিত করেন, তাহা আমি দেখি না, কিন্তু বৎসরান্তে তিনি দুর্গোৎসব করিয়া কতকগুলি দীন দুঃখীকে অকাতরে অন্নদান করেন, ইহা আমি দেখিতে পাই; আরও দেখিতে পাই, আমার বৎসরে ২০০০ হাজার টাকা আয়, একজন উপরিলোককে অন্ন দেওয়া দূরে থাকুক, স্বর্ণকারের ঘন তাগাদায় বৎসরের মধ্যে দুই তিনবার বৃদ্ধ পিতা মাতাকেও দিন থাকিতে আপনার আপনার পথ দেখিবার পরামর্শ দিয়া থাকি; সুতরাং এ অবস্থায় যে ব্যক্তি বৎসরে তিন দিন অন্যূন তিন শত উপরি দরিদ্র ব্যক্তিকে অকাতরে অন্ন দেয়, তাহার যে পাঁচ শত টাকা আয় হইবে, একথা বিশ্বাস না করিয়াই বা কি করি! এমন স্থলে আসেসর বাবু যদি আমাকে ঐ ব্যক্তির আয়ের কথা জিজ্ঞাসা করেন, তাহা হইলে আমার যেরূপ বিশ্বাস তদনুরূপ সত্য বলা উচিত, না, ব্রাহ্মণকে বাঁচাইবার জন্য বিশ্বাসের বিপরীত মিথ্যা বলা উচিত? তুমি হয়ত বলিবে, আসেসর বাবু দস্যুর সমান, যত টাক্স বাড়াইবেন, ততই তাঁহার পদোন্নতি, বেতন বৃদ্ধি হইবে; এই স্বার্থে অন্ধ হইয়া, দীন দুঃখীর হৃদয় মর্ম্মভেদী হাহাকার রবে কর্ণপাত না করিয়া দুই হাতে টাক্স বসান ব্রতে ব্রতী। ব্রাহ্মণ নিরপরাধ নিতান্ত ধর্ম্মপ্রিয় বলিয়া দুর্গোৎসবটি করিয়া থাকেন। সম্বৎসর না খেয়ে, না দিয়ে, অর্থ সঞ্চয় করিয়া দুর্গোৎসবটি করেন মাত্র, তাঁহার সেই অর্থের উপর টাক্স বসাইলে, ধর্ম্ম কার্য্যের হানি হয় এবং ব্রাহ্মণকে মনস্তাপ দেওয়া হয়। এরূপ স্থলে, তাঁহার বাস্তবিক ৫০০ শত টাকা আয় হইলেও মিথ্যা বলিলে দোষ হয় না। আমার যুক্তি ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। ফল, আমার ন্যায় সত্য ভীরু লোক আছে বলিয়া প্রতি বৎসর গবর্ণমেণ্ট ইনকম টাক্সের দরুণ আয় বৃদ্ধি অনুভব করিতে পারিতেছেন। প্রকৃত কথা এই, যে স্থলে সত্য বলিলে সম্পূর্ণ নিরপরাধের উপর মহা আপদ

আসিয়া উপস্থিত হয়, সে সত্য কখন পুণ্যের কারণ না হইয়া, পাপের কারণ হয় এবং ঐরূপ কঠোর সত্য হইতে পরিণামে নরক প্রাপ্তিও ঘটে। অতএব পূর্ব্বে, লোকের হিতাহিত বিশেষরূপে পর্য্যালোচনা করিয়া সত্য বাক্যের প্রয়োগ করিবে। আমরা বলি, যে স্থলে সত্য বলিলে নিরপরাধের উপর বিশেষ বিপৎপাতের সম্ভাবনা, সে স্থলে সত্য না বলুক, কিন্তু তাই বলিয়া মিথ্যাও বলিবে না, মৌন অবলম্বন করাই শ্রেয়স্কর। কারণ, সেরূপ স্থলে বাক্য না বলাই শাস্ত্রকারের অভিপ্রেত।

অস্তেয় শব্দের অর্থ স্তেয়াভাব। কাযেই অস্তেয় শব্দের অর্থ জানিতে হইলে প্রথমে স্তেয় শব্দের অর্থ জানা আবশ্যক। ভাষ্যকার বলেন অশাস্ত্র পূর্ব্বক পর হইতে দ্রব্য গ্রহণের নাম স্তেয়। অর্থাৎ জ্ঞানপূর্ব্বক পরের অজ্ঞাতে পরের দ্রব্যকে আত্মসাৎ করার নাম স্তেয়; ভাষায় ইহা চুরি বলিয়া প্রসিদ্ধ। ঐ স্তেয়ের অভাব অস্তেয় অর্থাৎ কোন চুরি বা অপহরণ না করা। ভাষ্যকার বলেন কেবল কাযে চুরি না করাই যে অস্তেয় তাহা নহে। চৌর্য্যে স্পৃহাশূন্য হওয়াই অস্তেয়। অর্থাৎ চুরি বা অপহরণ করিবার ইচ্ছা পর্য্যন্ত না করা। বলপূর্ব্বক দুর্ব্বলের বস্তু গ্রহণ, বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া গচ্ছিত ধনের অপলাপ ইত্যাদি কার্য্যও স্তেয় মধ্যে পরিগণিত।

ব্রহ্মচর্য্য শব্দের অর্থ আসঙ্গলিপ্সা হইতে বিরতি বা কাম ভোগেচ্ছার প্রতিরোধ। *

অপরিগ্রহ বলিতে স্রক্ চন্দন প্রভৃতি ভোগ্য বস্তুর অগ্রহণ অর্থাৎ স্বয়ং কোনরূপ ভোগ্য বস্তুর আহরণের জন্য যত্ন করিবে না এবং যদি কেহ ঐ সকল দান করে তাহা হইলেও সে সকল গ্রহণ করিবে না। কারণ প্রথমে ভোগ্য বস্তু সমূহের উপার্জ্জন দুঃখপ্রদ, উপার্জ্জিত বস্তুর রক্ষণাবেক্ষণ আরও দুঃখপ্রদ, তাহার উপর, বস্তু সকল আবার নশ্বর, কোন বস্তু চিরস্থায়ী নয়। ভোগ করিতে করিতে তৃপ্তিই কি ছাই সহজে হয়? শাস্ত্রকারেরা বলেন তৃপ্তি একেবারেই হয় না। তাঁহারা বলেন, ভোগ্য বস্তুর উপভোগেত তৃপ্তি হয়

---

* আসঙ্গ লিপ্সা বা মৈথুন আট প্রকার। যথা স্মরণং কীর্ত্তনং কেলি প্রেক্ষণং গুহ্যভাবনং সংকল্পোধ্যবসায়শ্চ ক্রিয়া নিবৃত্তিরেবচ। এই আট প্রকার মৈথুন হইতে বিরক্তির নাম ব্রহ্মচর্য্য।

না বরং অগ্নি ঘৃতাহুতি দ্বারা যেমন পূর্ব্বাপেক্ষা প্রজ্বলিত হয়, তেমনি ভোগেও বিষয় তৃষ্ণা কেবল বর্দ্ধিত হয়। আরও দেখ, যাহা অপেক্ষাকৃত অধিক ভোগ্য আছে, তাহার প্রতি অল্প ভোগ্য বস্তু বিশিষ্ট ব্যক্তিরা হিংসা করে এবং অল্প ভোগ্য বস্তু বিশিষ্টেরা আবার অধিক ভোগ্য বস্তু বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক ঘৃণিত হয়। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া শাস্ত্রকারেরা বিষয়সঙ্গ হইতে এককালে নিবৃত্ত হইতে উপদেশ দিয়াছেন।

জাতিদেশকালসময়ানবচ্ছিন্নাঃ সার্ব্বভৌমা মহাব্রতম্।৩১॥

পদচ্ছেদঃ। জাতি-দেশ-কাল-সময়-অনবচ্ছিন্নাঃ, সার্ব্বভৌমা, মহাব্রতাঃ।

পদার্থঃ। জাতিঃ ব্রাহ্মণত্বাদিঃ, দেশঃ তীর্থাদিঃ, কালঃ চতুর্দ্দশ্যাদিঃ, সময়ঃ ব্রাহ্মণপ্রয়োজনাদিঃ (জাতিশ্চ, দেশশ্চ, কালশ্চ, সময়শ্চ তৈঃ) অনবচ্ছিন্নাঃ অনিয়তীভূতাঃ সর্ব্বাসু চিত্তভূমিষু ভবাঃ সার্ব্বভৌমাঃ মহাব্রতং মহৎ ধর্ম্মানুষ্ঠানং ইতি।

অন্বয়ঃ। তে অহিংসাদয়ো যমা জাতিদেশ কাল সময়ানবচ্ছিনাঃ সার্ব্ব-ভৌমা শ্চেৎ তদা মহাব্রতং ইতি উচ্যন্তে ইতি শেষঃ।

ভাবার্থঃ। যদি তে অহিংসাদয়ো জাতি-দেশ-কাল-সময়ৈরবচ্ছিন্না ন ভবেয়ুঃ তত্র জাত্যবচ্ছিন্না অহিংসা যথা মৎস্য ঘাতকস্য মৎস্যেষেব হিংসা নান্যত্র দেশাবচ্ছিন্না যথা তীর্থে ন হনিষ্যামীতি, কালাবিচ্ছিন্না যথা চতুর্দ্দশ্যাং অন্যত্র, বা পুণ্যেহ হনি ন হনিষ্যামীতি, সময়াবচ্ছিন্না যথা দেব ব্রাহ্মণার্থমেব হনিষ্যামি নান্যথা, যা অহিংসা এবং অবচ্ছিন্না ন ভবতি সা অনবচ্ছিন্না এবং সত্যাদিষ্বপি যোজ্যম্। জাতিদেশ কাল সময়ৈঃ অনবচ্ছিন্নাঃ সর্ব্বমেব পরিপালনীয়া অহিংসাদয়ঃ সার্ব্বভৌমাঃ সর্ব্বথৈবাবিদিতব্যাভিচারাশ্চেত্তি মহাব্রতং উচ্যতে ইতি ভাবঃ।

অনুবাদ। সেই অহিংসা আদি যম, যদি জাতি, দেশ, কাল এবং সময় দ্বারা অবচ্ছিন্ন অর্থাৎ নিয়মিত না হয় এবং চিত্তের সমুদয় ভূমি অর্থাৎ অবস্থায় অবস্থিত হয়, তাহা হইলে উহাদিগকে মহাব্রত বলা যায়।

সমালোচন। যোগভ্যাসার্থীর স্বাভাবিক চঞ্চল চিত্তের স্থিরতা সম্পা-দনার্থ যম নিয়ম প্রভৃতি আট প্রকার অঙ্গের অনুষ্ঠান উপদিষ্ট হইয়াছে; তাহা-

দের মধ্যে আবার প্রথম অনুষ্ঠেয় যম অহিংসা আদি পঞ্চ। যম শব্দের অর্থ বন্ধন ইহা পুর্ব্বে বলা হইয়াছে; যে সর্ব্বতোভাবে বিশৃঙ্খল, সহসা তাহার হস্ত পদাদি-সর্ব্বাবয়ব বন্ধন করিয়া স্থিরতা সম্পাদন করিবার চেষ্টা, বালকের চেষ্টার মত, উপহাসাস্পদ, এই নিমিত্ত শাস্ত্রকারেরা অহিংসাদিকে নিয়মিত করিয়া উপদেশ দিয়াছেন। তাঁহাদের অভিপ্রায় সকল ব্যক্তি সকল সময়েই অহিংসাদির অনুষ্ঠান করুক কিন্তু মনুষ্যের শরীর ও মন এইরূপ উপাদানে গঠিত, যে তাহা ক্রমশ অভ্যাস না করিলে একেবারে সিদ্ধ হয় না। এই জন্য শাস্ত্রকারেরা নিয়ম করিয়াছেন যে অধম জাতির, মৎস্যজীবী ধীবরের, পশুঘাতী ব্যাধের, মৎস্য বা পশু হিংসা দোষাবহ নহে, ক্ষত্রিয় বীরের যুদ্ধে মনুষ্য হত্যা দোষাবহ নহে, চতুর্দ্দশী বা পুণ্য তিথিতে ব্রাহ্মণাদি শ্রেষ্ঠবর্ণ ভোজনের নিমিত্ত মৎস্যাদির হিংসা করিবে না, এতদ্ভিন্ন অন্যকালে মৎস্যাদি ভক্ষ্য জীবের হিংসা করিলে বিশেষ দোষ নাই; পবিত্র তীর্থ ভিন্ন অন্য দেশে আহারার্থ পশুহিংসা করিতে পারে, দেবকার্য্য পিতৃকার্য্য অতিথিসেবা এবং যাগ যজ্ঞাদির নিমিত্ত পশু হিংসা দোষাবহ নয়। এইরূপ সত্যাদির ও জাতি, কাল, দেশ ও সময়ের নিয়ম করিয়াছেন। ঐ সকল নিয়মের অনুসরণ করিয়া যাহারা চলে, তাহাদিগকেও যমী বলা যায়। কিন্তু যাহারা ঐ নিয়মের অতিরিক্ত স্থলেও যমাদির অনুষ্ঠান করে, শাস্ত্রে যে সকল কাল দেশ পাত্র প্রভৃতি ভেদে হিংসাদি উক্ত হইয়াছে, সেই সকল স্থানেও হিংসাদির অনুষ্ঠান না করে অর্থাৎ যাহারা সকল অবস্থায়, সকল দেশে, সকল কালে কোন প্রকার হিংসাদির অনুষ্ঠান না করে, তাহাদের সেই যম বা অহিংসাদির অনুষ্ঠানকে মহাব্রত বলা যায়।

শৌচসন্তোষতপঃস্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি নিয়মাঃ।৩২॥

পদচ্ছেদঃ। শৌচ, সন্তোষ, তপস্, স্বাধ্যায়, ঈশ্বর প্রণিধানাণি, নিয়মাঃ।

পদার্থঃ। শৌচং দ্বিবিধং বাহ্যমাভ্যন্তরঞ্চেতি, তত্র বাহ্য মৃজ্জলাদিভিঃ শরীরাদি প্রক্ষালনং আন্তরঞ্চ মৈত্র্যাদিভিশ্চিত্তমলানাং প্রক্ষালনং, সন্তোষঃ তুষ্টিঃ, তপোনাম চান্দ্রায়ণাদীনি ব্রতানি দ্বন্দ্ব সহনঞ্চ; দ্বন্দ্বশ্চ শীতোষ্ণাদি স্বাধ্যায়ো মোক্ষশাস্ত্রাণামধ্যয়নং প্রণবজপো বা, ঈশ্বরপ্রণিধানং তস্মিন্ পরমগুরো সর্ব্ব কর্ম্মার্পণং—নিয়মাঃ—নিয়ম শব্দবাচ্যা।

অন্বয়ঃ। শৌচঞ্চ সন্তোষশ্চ, তপশ্চ, স্বাধ্যায়শ্চ ঈশ্বর প্রণিধানঞ্চ তানি এতে শৌচাদয়ঃ নিয়মাঃ কথ্যন্ত ইতি শেষঃ।

অনুবাদ। শৌচ, সন্তোষ, তপস্যা, স্বাধ্যায় এবং ঈশ্বরপ্রণিধান ইহা-দিগের নাম নিয়ম।

সমালোচন। নি পূর্ব্বক যম ধাতুর অর্থ নিয়ম, যাহা দ্বারা চিত্ত অতিশয় রূপে আবদ্ধ হয় এইরূপ কার্য্য সকল। সেই কার্য্য কি কি,—(১) শৌচ, (২) সন্তোষ,(৩) তপস্যা,(৪) স্বাধ্যায়, এবং (৫) ঈশ্বর প্রণিধান; এই পাঁচটী কর্ম্ম। ইহাদের মধ্যে শৌচ দুই প্রকার বাহ্য এবং আভ্যন্তর; বাহ্যশৌচ মৃত্তিকা এবং জলাদি দ্বারা শরীর, বস্ত্র, আসন, শয্যা ও গৃহাদির মল অপনয়ন করা, পবিত্র বস্তু সকলের সেবা করা ইত্যাদি; আভ্যন্তর শৌচ চিত্তের মলিনতা দূর করিয়া তাহার পবিত্রতা সম্পাদন; সন্তোষ শব্দের অর্থ তুষ্টি আপনার যেরূপ সামর্থ্য তাহার অধিক কার্য্য করিতে অভিলাষ না করা, সামর্থ্যানুরূপ ফল লাভ করিয়াই পরিতৃপ্ত হওয়া। তপস্যা বলিতে—শীত, উষ্ণ,—ক্ষুধা, পিপাসা প্রভৃতি দ্বন্দ্বের সহন; এখানে দ্বন্দ্ব বলিতে যাহাদের একটি করে যোড়া আছে; কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণ, সান্তপনাদি প্রায়শ্চিত্তও তপস্যার মধ্যে পরিগণিত; স্বাধ্যায় বলিতে মোক্ষোপযোগী শাস্ত্র সকলের অধ্যয়ন অথবা প্রণবের জপ। ঈশ্বর প্রণিধান বলিতে সেই পরম পুরুষ পরমেশ্বরে সকল কর্ম্মফলের অর্পণ। এ বিষয়ে একটি শ্লোক আছে, যথা "শয্যাসনস্থোঽথে পথিব্রজন্ বা স্বস্থঃ পরি-ক্ষীণ বিতর্কজালঃ। সংসারবীজক্ষয়মীক্ষমানঃ স্যান্নিত্যমুক্তোঽমৃত ভোগভাগী।

যে ব্যক্তি শয়ন, উপবেশন, বা গমন করত আত্মনিষ্ঠ হয় অর্থাৎ আপনার অস্তিত্ব বিস্মৃত হইয়া পরমেশ্বরের সহিত ঐক্য ভাবনা করে, আপ-নার সমুদয় কর্ম্ম পরমেশ্বরে অর্পণ করে, তাহার সংশয় সকল ক্ষয় হয় এবং সেই ব্যক্তি নিত্যমুক্ত হইয়া অমৃতের ভাগী হয়।

বোম্বাই পরিদর্শন।

৯।

বোম্বেয়ে মহারাষ্ট্রীয়দিগকে আজ কাল ব্যবসা বাণিজ্য করিতে দেখা যায়। কিন্তু প্রাচীনকালে ইঁহারা বণিগ্‌বৃত্তির লোক ছিলেন না। গুজরাটীরাই ভারতের প্রধান বণিক জাতি। ভারতবর্ষের অধিকাংশ স্থানের ব্যবসা বাণিজ্য গুজরাটী ভাষাতেই চলিয়া আসিতেছে। মহারাষ্ট্রীয়েরা স্বভাবত চতুর, বুদ্ধিমান্, পরিশ্রমী ও ক্ষিপ্রকর্ম্মা। ইঁহাদের ভাষার সীমা বলিতে হইলে, উত্তরে বোম্বায়ের ১০৮ মাইল দূরে "দামান" নামক নদী তীর হইতে, দক্ষিণে গোয়া পর্য্যন্ত সমস্ত উপকূল ভাগেই এবং মধ্যে তাপ্তী ও কৃষ্ণার মধ্যস্থিত তাবৎ প্রদেশেই মহারাষ্ট্রীয় ভাষা প্রচলিত। "ডাক্তার উইলসন্" পশ্চিম ভারতের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৌদ্ধকীর্ত্তির ধ্বংশাবশেষ দেখিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, যে খৃষ্টীয় শাকের দুই শত বৎসর পূর্ব্বে সমস্ত মহারাষ্ট্রীয় প্রদেশে বৌদ্ধদিগের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। কিন্তু তথাপি, আজ কাল ভারতবর্ষে সেই মহারাষ্ট্রীয়দিগের ন্যায়, ব্রাহ্মণ অনুরক্ত জাতি আর নাই। শিবজীর পৌত্র "সাহুকে" যখন জনেক হিন্দু রাজা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, যে হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থানের জন্য মহারাষ্ট্রীয়েরা কি করিয়াছেন, তখন সাহু উত্তর করিয়াছিলেন, "দক্ষিণ ভারত হইতে যমুনা পর্য্যন্ত জয় করিয়া, আমরা ব্রাহ্মণদিগকেই দিয়াছি।" সাহুর এ গর্ব্ব মিথ্যা নহে; কারণ শিবজীর রাজত্ব, পরিণামে তাঁহার গুরুবংশ পেশোয়াদিগেরই হইয়াছিল। ইঁহাদের প্রধান তীর্থ গোদাবরী; এবং নাসীকের যে ত্র্যম্বক নামক স্থানের বিষয় পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, তাহাই ইঁহাদের প্রধান তীর্থ স্থান। ইঁহাদের মধ্যে জাতীয় ধর্ম্মভাবের লাঘব হইলে, মহারাষ্ট্রীয় কবি তুকারাম, প্রভৃতির দ্বারায় পুনরুত্থিত হইয়া, এখনো সঞ্জীবিত রহিয়াছেন। বহুদিবস হইল Nineteenth Century নামক বিলাতের সাময়িক পত্রে একবার পড়িয়াছিলাম, যে "God sent a poet to reform his earth" তুকারামের কার্য্য ভাবিলে, এ কথার সার্থকতা বুঝিতে পারি।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যে মহারাষ্ট্রীয়েরা ব্যবসা বাণিজ্যে তত পটু নহেন। ইংরাজ কর্তৃক ভারত অধিকারের পূর্ব্বে, যুদ্ধনীতিই ইঁহাদের প্রধান চর্চ্চা ছিল। এক্ষণে রাজনীতি, সমাজনীতি ও অধ্যাপনা প্রভৃতি বিষয়, এ অঞ্চলে প্রধানত ইহাদের ও পার্শীদের দ্বারায় আলোচিত হইতেছে। এখানে এই দুই জাতিই অধিকাংশ ব্যবহারজীবী, শিক্ষক, রাজ কর্ম্মচারী ও অন্যান্য কর্ম্মচারী। দেশীয় সংবাদ ও সাময়িক পত্রাদি, ইঁহাদের দ্বারাই সম্পাদিত হইতেছে। এই সকল পত্রে যে সকল মতামত প্রকাশিত হইতেছে তৎ-প্রতি গবর্ণমেণ্টেরও বিশেষ লক্ষ্য আছে। গবর্ণর জেনরল, কাউন্সিলের মেম্বর Gibbs সাহেব ইঁহাদের মতামত সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা আমি উদ্ধৃত করিতেছি।

"I think I may safely say,that in no city in India has public opinion so much force and so much value, as it has in Bombay. I am aware that a late able member of the Bar said, that public opinion is not to be found in India. It may not have been found to any great extent in his day, perhaps, but I think at the present time, it will be admitted by all, that public opinion in Bombay, has a very great effect. It has a great effect, in turn, on Govt, and on the people, and I am quite sure that, the effect of public opinion in Bombay, is certainly being felt in England."

বোম্বায়ের মুসলমানেরা অন্যান্য স্থানের ন্যায় প্রধানত সুন্নি ও সিয়া নামক দুই দলে বিভক্ত। তুর্কী ও আরবীরাই প্রধানত সুন্নী এবং পারশ্য প্রদে-শীয়েরা সিয়া শ্রেণীভুক্ত। বোম্বায়ে সিয়াই অধিক। এখানকার সিয়াদিগের মধ্যে বোরা বলিয়া এক শ্রেণী মুসলমান আছে, ইহারা দৃশ্যে, আচারে ও নৈপুণ্যে প্রায় য়িহুদীদিগের ন্যায়। খোজা মুসলমানেরাও সিয়া। বোম্বায়ে অনেক মুসলমানকে লোকে মোগল বলিয়া জ্ঞান করে, কিন্তু তাঁহারা মোগল নহেন, তাঁহারা পারস্যবাসী। মুসলমানদিগের মহাতীর্থ মক্কা যাতায়াতের পথ, আজ কাল এইখান দিয়া হইয়াছে, শীতকাল ইঁহাদের মক্কা যাত্রার সময়। এই সময়ে এইখানে দেশ দেশান্তর হইতে মুসলমানের সমাগম হইয়া থাকে। ভারতের ওহাবী মুসলমানদিগকে অনেকেই পাট-

নার আমীর খাঁর শিষ্য বলিয়া জানেন, কিন্তু বোম্বায়ের ১৮৭২ সালের Census তালিকায় এরূপ অনেক ওহাবীর নাম আছে, যাঁহারা কেহই তাঁহার শিষ্য বলিয়া স্বীকার করেন না।

পার্শী। সকলেই অবশ্য জ্ঞাত আছেন যে পার্শীদিগের আদিম বাসস্থান পারস্য দেশ, এবং ইঁহাদেরি নাম ইরাণী ছিল। সপ্তম শতাব্দীতে মুসলমানেরা পারশ্য জয় করিলে, ইরাণীদিগের মধ্যে যাঁহারা স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা পারশ্যেই রহিয়া গেলেন, এবং যাঁহারা স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিলেন না, তাঁহারা নির্ব্বাসিত হইয়া পারস্য উপসাগর কূলে অরমস্ প্রণালীর ধারে বাস করিলেন, এবং তথায় জাহাজ নির্ম্মাণ কার্য্যে রত হইয়া অচিরে সে কার্য্যে নিপুণতা লাভ করিলেন। পরে তথা হইতে ক্রমশ ছড়াইয়া পড়িয়া ভারত উপকূলে বিশেষত কাটিওয়ারে "ডিউ" নামক স্থানে উপনিবেশ করেন। উক্ত স্থানে কোন প্রকার উন্নতির আশা না দেখিয়া গুজরাটে সানজাম নামক স্থানে বাস করিতে যান। এই অবস্থায় ইঁহারা যেখানে যেখানে গিয়াছেন, সেই খানেই বহুকাল রক্ষিত উপাস্য অগ্নি সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছেন। ইঁহারা এক মাত্র অগ্নি উপাসক বলিয়া অনেকেরি বিশ্বাস, অন্য দেব দেবীর উপাসনা করেন না বলিয়া অনেকের ধারণা, কিন্তু এরূপ বিশ্বাস ভ্রান্তিমূলক। আমি সে বিষয় পরে বলিব, ইঁহাদের প্রত্যেকের বাটীতেই একটি ঘরে উপাস্য অগ্নি আছে; এ অগ্নি নির্ব্বাণ হইতে পারে না—কেহ কেহ বলেন যে পার্শীদের বাটীতে দেড়শত কি দুইশত বৎসরের অগ্নি রক্ষিত হইতেছে। ইঁহারা সান্‌জামে বাস করিতে ইচ্ছুক হইলে তথাকার হিন্দু রাজা রাণা যাদু ইঁহাদিগকে সাদরে, স্বীয় অধিকারে বাস করিবার, ও ইঁহাদের উপাস্য অগ্নি তথায় লইয়া যাইবার অনুমতি প্রদান করিয়াছিলেন। এই হিন্দুরাজের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন জন্য ইঁহাদের বিবাহ প্রভৃতি শুভকার্য্য, একবার পার্শী প্রথা ও একবার হিন্দু প্রথা অনুসারে এখনো সম্পন্ন হইয়া থাকে। ইঁহাদের যতই দল বৃদ্ধি হইতে লাগিল ততই ক্রমশ গুজরাটের প্রধান প্রধান নগরে ছড়াইয়া পড়িতে লাগিলেন এবং ক্রমশ গুজরাটী ভাষা ও হিন্দুর অনেক আচার ব্যবহার ইঁহাদের মধ্যে প্রচ-

লিপ্ত হইয়া পড়িল। ইংরাজের সংস্রব হইতেই ইঁহাদের প্রকৃত প্রস্তাবে সৌভাগ্য আরম্ভ হইল। বিজাতীয়দিগের সম্বন্ধে ইঁহাদের কোন প্রকার কুসংস্কার ছিল না, সুতরাং ইংরাজের কার্ কারবারের সহায়তা করিয়া শীঘ্রই ইংরাজের প্রিয় হইয়া উঠিলেন। এই সূত্রে ইঁহাদের যথেষ্ট ধনোপার্জ্জনও হইতে লাগিল। বোম্বাই যখন ইংরাজের হস্তে আইসে, তখন বোম্বায়ে এক জনমাত্র পার্শী ছিলেন। ইংরাজের অধিকারে বোম্বায়ের উন্নতি হইতে লাগিল, সুরাট অপেক্ষা বোম্বাই প্রসিদ্ধ স্থান হইয়া দাঁড়াইল; পার্শীরাও ইংরাজ অদৃষ্ট অনুসরণ করিয়া, দলে দলে বোম্বায়ে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন এবং এইরূপ প্রবাদ আছে যে জাহাজাদি নির্ম্মাণে পার্শীদিগের নৈপুণ্য দেখিয়া, Dockyard সংক্রান্ত কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য ইংরাজেরা ইঁহাদিগকে নিমন্ত্রিত করিয়া লইয়া যান। এক্ষণে ইঁহারা বোম্বায়ে দেশীয়দিগের মধ্যে প্রধান বাণিজ্য-ব্যবসায়ী ও সাধারণ হিতৈষী বলিয়া বিখ্যাত। ইঁহাদের কার্য্য-পটুতা ও ক্ষিপ্রকারিতা দেখিলে চক্ষু জুড়াইয়া যায়। ইঁহাদের মধ্যে ছোট জাতি যাহারা, তাহারাও অতি চতুর দোকানদার এবং অতি উত্তম কারিগর। ছুতারের কার্য্যে ইহারা বিশেষ পটু।

পার্শীরা যে ইংরাজের কতদূর প্রিয় হইয়া উঠিয়াছেন, তাহা বোম্বাই না দেখিলে ঠিক বুঝিতে পারা যায় না। সকলেই অবশ্য জানেন, যে প্রায় ২১ বৎসর পূর্ব্বে সর্ জেমশেট্জি জিজিভাই নামক জনৈক পার্শী ব্যারনেট পদে অভিষিক্ত হন এবং তাহার পর সর কাউয়াস, জি, জাহাঙ্গীর নাইট পদে অভিষিক্ত হইয়াছেন। আরো কয়েক জন পার্শী ঐরূপ উপাধি পাইয়াছেন।

পার্শীরা ইংরাজের বড় অনুকরণ করেন বলিয়া, বোম্বায়ের মহারাষ্ট্রীয় ও গুজরাটীরা ইঁহাদিগকে "Apes" অর্থাৎ বাঁদর কহেন। পার্শীদের, ইংরাজের অনুকরণ আশ্চর্য্য বটে, আমাদের বাঙ্গালিরা বিলাত যাইলে, বা স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া খৃষ্টীয় ধর্ম্ম গ্রহণ করিলে, আচার ব্যবহারে যেরূপ সাহেবের ন্যায় হইয়া পড়েন, পার্শীরা বিলাত না গিয়া, স্বধর্ম্ম ত্যাগ না করিয়া, জাতীয় পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন না করিয়া, পুরো সাহেব। টেবলে আহার, কাঁটাচাম্চ ব্যবহার, পার্শীদিগের মধ্যে নিত্য প্রচলিত। পুরুষেরা সর্ব্বদাই পায় জামা

পরিধান করেন। পার্শী রমণীরাও বিলক্ষণ পরিস্কার পরিচ্ছদাদি ব্যবহার করেন। তাঁহাদের পরিধান সাড়ী, গায়ে জামা এবং জামার উপর বিবিয়ানা একটি জ্যাকেট। গৃহে যখন কর্ম্ম কায করেন, তখন সূতার সাড়ী ব্যবহার করেন, নতুবা বায়ু সেবনের সময় অথবা কোথাও গমনাগমনের সময়, যিনি দরিদ্র, তিনিও একখানি রেসমী সাড়ী পরিধান করেন। এ সকল সাড়ী পার্শী রমণীদিগের জন্যই চীন হইতে প্রস্তুত হইয়া বোম্বায়ে আমদানি হয়। রেসমী সাড়ী পরিবার সময়, ইঁহারা ভিতরে সুতার ছোটসাড়ী অথবা পায় জামা পরিধান করেন। আমাদের যেমন যজ্ঞোপবীত, পার্শী পুরুষ রমণী উভয়েরি এক প্রকার সূতার উপবীত গ্রহণ প্রথা আছে। আমরা উপবীত গলায় ধারণ করি, ইঁহারা কি পুরুষ কি রমণী, উভয়েই কোমরে ধারণ করেন। পুরুষের পক্ষে উপবীত ধারণের সঙ্গে, মসলিমের হাঁটু পর্য্যন্ত একটি জামা পরিধান করিতে হয়, স্ত্রীলোকের উপবীতেও ঐরূপ হাঁটু পর্য্যন্ত মসলিনের জামা এবং শ্বেত বস্ত্রের একটি মস্তকের আবরণ ধারণ করিতে হয়। কলিকাতায় যদি কেহ পার্শী রমণী দেখিয়া থাকেন, তবে অবশ্যই লক্ষ্য করিয়াছেন, যে রুমালের ন্যায় একখান শ্বেত বস্ত্রে তাঁহাদের মস্তকের কেশ আবৃত থাকে, সে আবরণ শোভার জন্য নহে, দীক্ষার সময় তাঁহাদের উহা ধারণ করিতে হয়। পার্শীরা এই সকল দীক্ষার চিহ্ন স্নানের সময় ব্যতীত অঙ্গ হইতে পৃথক করে না। পার্শীরা প্রথমে সমুদ্রের উপকূলে বাস করিতেন, সেই জন্য পূর্ব্বকালে অশিক্ষিত লোকেরা, পার্শী রমণীদিগকে অপসরা মনে করিত এবং কহিত সমুদ্র হইতে ইঁহারা উদ্ভূত হইয়াছেন। অপসরা কথাটি পার্শী রমণীদিগেরই উপযুক্ত নাম বটে। ইঁহারা সন্ধ্যার পূর্ব্বে যখন নীল, পীত, লোহিত, হরিত, শ্যামল, পাটল প্রভৃতি বর্ণের রেসমী সাড়ী পড়িয়া সমুদ্র তীরে বায়ু সেবন করিতে আইসেন, তখন তোমার মনে হইবে, যেন তুমি ঘুম ঘোরে দেখিতেছ, যে চাঁদের এক একখানি জোৎস্না খসিয়া পড়িয়া স্বপ্নময়ী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া, সমুদ্র উপকূলে স্বর্গভ্রষ্ট অপসরার ন্যায় উদাসভাবে, কেহ বা বসিয়া, কেহ বা ধীরে ধীরে পাদচারণ করিতে করিতে, সাগর হৃদয়ে জন্মভূমি স্বর্গের প্রতিবিম্ব দেখিতেছেন। সিন্ধুসলিল, সে অপসরা মূর্ত্তির প্রতিবিম্ব বক্ষে করিয়া অতল গর্ভে, যেখানে বহুমূল্য রত্নাদি

রাখিয়াছে, সেই খানে রাখিয়া দিবার জন্য ছুটাছুটি করিতেছে। ইঁহাদের এমনি একটু শান্ত প্রকৃতি, যে সন্ধ্যার সময় বোম্বাই উপকূলে দাঁড়াইলে দেখিবে, আকাশে যেমন ধীরে ধীরে তারা ফোটে, বহুদিনের পুরাতন মধুর ভাবনাগুলি বুকের ভিতর যেমন ধীরে ধীরে আসে যায়, পার্শী রমণীরাও তেমনি ধীরে ধীরে, সন্ধ্যার সময় সমুদ্র তীরে ফুটিয়া উঠেন। বোম্বাইবাসীর কার্য্য কুশলতা ও ক্ষিপ্রকারিতা এদেশীয়ের পক্ষে প্রধান দেখিবার বস্তু তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহা পার্থিব দৃশ্য; বোম্বায়ের অপার্থিব দৃশ্য —সমুদ্র ও পার্শী রমণী।

পার্শীদের মধ্যে বাল্যবিবাহ নাই এবং বিধবা বিবাহ প্রচলিত আছে।

Towers of Silence. পার্শীদিগের মৃতদেহের দাহ করা হয় না এবং কবর অর্থাৎ সমাধিও হয় না। ইঁহাদের মধ্যে মৃতদেহ ধ্বংস করা সম্বন্ধে এক অপূর্ব্ব নিয়ম আছে। বোম্বায়ের এক অংশের নাম "ম্যালাবার" গিরি। এই গিরি অন্তরীপের ন্যায় সমুদ্রের কিয়দ্দূরে প্রবিষ্ট হইয়া পড়িয়াছে; উহার উপরে বড় বড় সাহেব ও বড় বড় ধনী লোকেরা বাস করেন। কলিকাতার যেমন চৌরঙ্গী, বোম্বায়ের তেমনি "ম্যালাবার" গিরি। এই গিরির উপর যে সকল বাঙ্গালা আছে, তাহা অধিকাংশই দেশীয়দিগের, কিন্তু যাঁহাদের এই সকল বাঙ্গালা, তাঁহারা সহরের ভিতরে, খোঁজের ভিতর বাস করেন, আর তাঁহাদের এই সকল সুখের আশ্রমে বসিয়া বিদেশী ইংরাজেরা সুখ সচ্ছন্দতা উপভোগ করেন। কলিকাতায়ও এইরূপ; চৌরঙ্গীর বড় বড় বাটীগুলি যাঁহাদের, তাঁহারা সহরের ভিতর অপরিষ্কার পল্লীতে বাস করেন এবং ইন্দ্রভবনের ন্যায় চৌরঙ্গী সাহেবদের উপভোগের জন্য ছাড়িয়া দিয়াছেন। ম্যালাবার গিরির উপর হইতে, বোম্বায়ের দৃশ্য অতি চমৎকার। পূর্ব্বে যে তুল্সী হ্রদের কথা বলিয়াছি, তাহা ইহারি উপরে। তুল্সী হ্রদ ছাড়াইয়া কিয়দ্দূর গিয়াই, পার্শীদিগের Towers of Silence এই সকল দেখিতে ইউরোপের দেশ দেশান্তর হইতে লোক সমাগম হয়। ম্যালাবারের উপর প্রায় এক মাইল স্থান প্রাচীর বেষ্টিত, ইহার ভিতর ৫টি Towers আছে; তাহার চারিধারে উত্তম উদ্যানও আছে। Towers গুলির গঠন প্রকৃতি এইরূপ;—পর্ব্বতের উপরে পাঁচটি কোয়া, প্রত্যেক কোয়ার চারিপার্শ্বে গোলা-

কার উচ্চ প্রাচীর ; প্রাচীর কোনটি দেড় তোলা, কোনটি দুই তোলা উচ্চ, ভিতর দেখা যায় না। প্রাচীরের উর্দ্ধভাগে ছাদ নাই—অনাবৃত। প্রত্যেক প্রাচীরের উপরে চারিধারে বিস্তর গৃধিনী সর্ব্বদা বসিয়া আছে। প্রাচীরের ভিতরে কোয়ার চতুষ্পার্শ্বে, তিনজন মানুষ শয়ন করিতে পারে, এতটা দীর্ঘ গোলাকৃতি স্থান আছে, এই স্থানটুকু তিন ভাগে বিভক্ত করা আছে। প্রত্যেক ভাগে চারিধারেই এক একটি মানুষ শয়ন করিবার উপযোগী স্থান বিভক্ত করা আছে। পার্শীদের পুরুষের মৃতদেহ প্রথম বিভাগে, অর্থাৎ বহির্দ্দেশ হইতে প্রাচীর মধ্যে প্রবেশ করিয়াই যে বিভাগ, তাহাতেই শায়িত করিয়া রাখা হয়, রমণীর মৃতদেহ, তাহার পরের বিভাগে স্থাপন করা হয় এবং শিশুর মৃতদেহ তাহার পরে অর্থাৎ কোয়ার পার্শ্বেই যে বিভাগ, তাহাতে স্থাপন করা হয়। মৃতদেহ ইহার ভিতর স্থাপন করিয়া দ্বার বন্ধ করিতে না করিতে, প্রাচীরের উপরে যে সকল গৃধিনী বসিয়া আছে, তাহারা ভিতরে নামিয়া আসে এবং সেই সকব মৃতদেহ ছিন্ন করিয়া আহার করে। পরে অস্থি প্রভৃতি যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহা এই সকল Towers সংক্রান্ত লোক দ্বারায়, কূপের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়। Towersএর ভিতরে দর্শকের, কি মৃত ব্যক্তির আত্মীয় বন্ধু, কাহারো প্রবেশ করিবার অনুমতি নাই। এই প্রাচীর বেষ্টিত গিরিখণ্ডের মধ্যে এক স্থানে মৃত ব্যক্তির আত্মীয়দিগের উপাসনা গৃহ আছে এবং আর এক গৃহে বহুকাল রক্ষিত উপাস্য অগ্নিও স্থাপিত আছে। এই গৃহের ছিদ্র দিয়া উপাস্য অগ্নির কিরণ, এই সকল Towersএ পতিত হয়। এই Towers of Silenceএর এক স্থানে এক গৃহে কাষ্ঠ নির্ম্মিত ছোট একটি আদর্শ Tower আছে। Towers সংক্রান্ত প্রধান কর্ম্মচারী দর্শকদিগকে ইহাই দেখাইয়া, Towers এর বৃত্তান্ত বুঝাইয়া দিয়া থাকেন এবং এইরূপ সৎকারের মর্ম্ম একখানি কাগজে ইংরাজিতে লেখা আছে, তাহাও দর্শকদিগকে পাঠ করিতে দেন। Towersএর তত্ত্বাবধারক দর্শককে সঙ্গে করিয়া অতি যত্ন সহকারে দেখাইয়া দেন এবং উহার সকল বৃত্তান্ত বুঝাইয়া দেন। পার্শীরা কহেন যে মৃতদেহ দগ্ধ করিলে অথবা কবর দিলে, জগতের কোন উপকারী করা হইল না, গৃধিনীদিগকে আহার করিতে দিলে, তবুও জগতের এক শ্রেণী জীবের আহার্য্যের সহায়তা করা হইল।

আমাদের দেশে মৃত দেহের সংকার করিবার লোকাভাব হইয়া উঠি-তেছে। কোন গৃহস্থের বাটীতে কাহারো মৃত্যু হইলে, প্রতিবেশীর সহায়তা আজকাল সহজে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। পার্শীদের মৃতদেহ, Towers of Silenceএ আনয়ন সম্বন্ধে অতি সুন্দর নিয়ম আছে। ইঁহাদের মধ্যে একটি কমিটি আছে, কমিটি হইতে বেতনভোগী বাহক আছে, পাড়ায় পাড়ায় নির্দ্দিষ্ট বাহকের বন্দোবস্ত করা আছে। গৃহস্থের বাটীতে মৃত্যু উপস্থিত হইলেই, তিনি এই সকল বাহককে সংবাদ দিবেন, বাহকেরা গিয়া মৃতদেহ স্পর্শ করিয়া চলিয়া যায়, বাহকেরা স্পর্শ করিয়া গেলে গৃহস্থের সে মৃতদেহ স্পর্শ করিবার আর অধিকার থাকে না। পরিবারবর্গের মৃতদেহের পার্শে বসিয়া জাতীয় প্রথা অনুসারে শোক তাপ বা উপাসনাদি করিবার জন্য, গৃহস্থের বাটীতে দেহ ২৪ ঘণ্টা স্থাপিত থাকে, তাহার পর বাহকেরা তান্-জামের ন্যায় এক শিবিকা করিয়া, মৃতদেহ এই Towersএ লইয়া আইসে। এই শিবিকার বর্হিভাগ কৃষ্ণবর্ণ, কিন্তু ভিতর দুগ্ধ ফেননিভ বস্ত্রাদিতে সুশো-ভিত। শবদেহও শুভ্রবর্ণ বস্ত্রে আবৃত করা হয়। এই শিবিকার পশ্চাতে পুরুষ আত্মীয় বান্ধবেরা, দুই দুই জনে দল বাঁধিয়া, সার দিয়া অনুগমন করেন। প্রত্যেক দলে, দুই জনে একখানি শ্বেতবর্ণ রুমাল, পরস্পরের মধ্যে ধারণ করিয়া চলে। Towers of Silenceএর ফটক ছাড়াইয়া গিরির উপর উঠিয়া, বিশ্রাম গৃহে শিবিকা স্থাপিত করে, তথায় উপাসনাদি হইলে বাহ-কেরা শিবিকা লইয়া যে কোন Towerএ স্থাপন করা হউক, তাহার ২০।৩০ ফিট দূরে দণ্ডায়মান হয়, আর এক দল বাহক আছে, ইহারা এই স্থান হইতে শিবিকা Towerএর ভিতর লইয়া যায়। এই বাহক দলের কেবল এই টুকুই বহন করিতে হয়। পূর্ব্বকথিত বাহকেরা Towerএর ভিতর প্রবেশ করিতে পারে না। তাহারা যে স্থান পর্য্যন্ত শিবিকা লইয়া যাইতে পারে, মৃত ব্যক্তির আত্ম বন্ধুরাও সেইখান পর্য্যন্ত গমন করিতে পারেন, তাহার অধিক অগ্রসর হওয়া নিষেধ। এইরূপ স্থানে sign বোর্ডে এইরূপ "নিষেধ বাক্য" লেখা আছে। Towersএর দ্বার, ভূমি হইতে প্রায় ৩ ফিট ঊর্দ্ধে, দরজা হইতে জমি পর্য্যন্ত ঢালু করিয়া দেওয়া আছে। দ্বিতীয় শ্রেণী বাহকেরা শিবিকা লইয়া এই ঢালু স্থানের উপর দ্বারের চৌকাটে শিবিকা স্থাপিত করে

এবং মৃত দেহের মুখের আবরণ একবার খুলিয়া লয়, আত্ম বন্ধুরা দূর হইতে সেই সময়ে অভিবাদন করিয়া লয়, তখনি মৃতদেহ আবৃত করিয়া Towerএর ভিতর লইয়া যায় এবং তথায় দেহ বস্ত্রহীন করিয়া, পূর্ব্বকথিত মত এক একটি শয়ন স্থানে, স্থাপিত করিয়া আইসে। বস্ত্রহীন করিয়া দেওয়া হয়, তাহার কারণ, পার্শীরা কহেন যে মনুষ্য বিবস্ত্র হইয়া পৃথিবীতে আসিয়া ছিল, তাহার বিবস্ত্র হইয়াই যাওয়া উচিত। মৃতদেহ স্থাপিত হইবার ঘণ্টা দুইয়ের মধ্যেই, গৃধিনীরা প্রায় সর্ব্বাঙ্গের মাংস ছিড়িয়া আহার করিয়া ফেলে অবশিষ্ট যাহা থাকে তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি কূপগর্ভে নিক্ষিপ্ত হয়। কূপে সকল সময় জল থাকে না; বর্ষার জল হইলে, অস্থির সঙ্গে যে একটু আধটু মাংস লাগিয়া থাকে, তাহাও ক্রমে খসিয়া পড়ে। এই সকল কূপের জল বাহিরে যাইবার নালা আছে, কিন্তু এ জল বিশুদ্ধ না হইলে মাতৃভূমি পৃথিবী বক্ষে পতিত হওয়া নিষিদ্ধ, এই জন্যই জল বর্হিগমনের পথে, কয়লা এবং বালি দেওয়া আছে এবং এই জন্যই পার্শীরা তাঁহাদের এই সকল Towers পর্ব্বতের উপর এবং যে স্থানে পর্ব্বত নাই, তথায় কোন উচ্চ স্থানে নির্ম্মাণ করেন। এইরূপে মৃতদেহ কূপে নিক্ষেপ করিবার আরো এক উদ্দেশ্য ইঁহারা উল্লেখ করেন। ইহারা কহেন যে মৃত্যুর পর, কি ধনী কি নির্ধন সকলেরই অস্থি একস্থানে নিহিত করা হয়, তাহাতে তাহাদের এই শিক্ষা হয়, যে ধনী ও নির্ধনি প্রভেদ করিতে নাই, মনুষ্যেরা সকলেই সমান।

আমাদিগের জাতীয় চরিত্র।

২।

এলফিনষ্টোন বলিয়া গিয়াছেন, "আমাদিগের দেশের (ইংলণ্ডের) বড় বড় নগরের নিম্নশ্রেণীর লোকেরা যেমন ভ্রষ্ট, হিন্দুজাতির মধ্যে সেরূপ ভ্রষ্ট নাই। সকল গ্রামের লোকেরাই প্রিয়দর্শন, পরিবারবর্গের প্রতি অনুরক্ত, শ্রেণী প্রতিবাসীগণের প্রতি সদয়, এবং অপর সাধারণের প্রতি সদ্ব্যবহার

করে। ঠগ এবং ডাকাইতদিগকে লইলেও ইংলণ্ড অপেক্ষা ভারতে কম অপরাধ ঘটে।"

অধ্যাপক ম্যাক্সমূলর বলেন, "হিন্দুদিগের সমস্ত সাহিত্যের মধ্যে সত্যের প্রতি ভালবাসার এবং সম্মানের জলন্ত নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়।" তিনি স্বীয় পরিচিত শিক্ষিত হিন্দুদিগের সম্বন্ধে বলেন, "আমি ইহা বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, আমরা ইয়ুরোপ এবং আমেরিকায় যেরূপ দেখিতে পাই, তাঁহারা (শিক্ষিত হিন্দুগণ) তদপেক্ষা সত্যের প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং সমধিক মনুষ্যত্ব ও উদার ভাব প্রদর্শন করিয়া থাকেন।"

যাঁহারা ভারতে আসিয়াছেন, ভারতে বাস করিয়াছেন, ভারতীয়গণের সহিত আলাপ করিয়া করিয়া সমস্ত তথ্য জ্ঞাত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে কয়জনের মত পূর্ব্ব প্রবন্ধে এবং উপরে উদ্ধৃত করা গেল। এখন আমাদিগের বিরুদ্ধে যাহারা বলিয়াছেন, তাঁহাদিগের দুইজন প্রধান নেতার উক্তি অবশ্য এস্থলে উদ্ধৃত করা কর্ত্তব্য।

জেমস মিলের নাম অনেকেই জানেন। তিনি স্বরচিত ব্রিটিস ভারতের ইতিহাস পুস্তকে হিন্দুজাতির সকল বিষয়েরই ভয়ানক নিন্দা করিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে তিনি এক স্থলে চীনবাসীদিগের চারিত্রের সহিত হিন্দুদিগের চরিত্রের তুলনায় সমালোচনা করিয়া বলিয়া গিয়াছেন, "উভয় জাতির আচার ব্যবহার এবং নৈতিক চরিত্রের প্রধান অঙ্গগুলির প্রবল সাদৃশ্য বিরাজমান। উভয় জাতিই সমতুল্য রূপে, সমান পরিমাণে অসরলতা, শঠতা, প্রতারণা, এবং মিথ্যাবাদিতারূপ পাপ সমূহে এরূপ কলঙ্কিত যে, তাহা অসভ্য সমাজকেও পরাজিত করে। উভয় জাতিই আপনাদিগের যে কোন বিষয় সম্বন্ধে অতিরিক্ত বর্ণনা করিতে ভাল বাসে; উভয় জাতিই ভীরু, এবং নির্ব্বোধ। উভয় জাতিই নিতান্ত আত্মম্ভরি, এবং অপরের প্রতি ঘৃণা প্রকাশকারী। উভয় জাতির শরীর এবং আবাস নিতান্ত ঘৃণ্যরূপে অপরিষ্কার।"

মিলের মনের ভাব উক্ত কয়টী কথায় অতি সুন্দররূপে প্রকাশ পায় নাই কি?

তাহার পর আমাদিগের পরম বন্ধু লর্ড মেকলে, বাঙ্গালী জাতি সম্বন্ধে

যাহা বলিয়া গিয়াছেন, শিক্ষিত বাঙ্গালী মাত্রেই যদিও তাহা জানেন, তথাপি প্রয়োজন বোধে এখানে দুই এক কথার উল্লেখ করা আবশ্যক। লর্ড মেকলে, ক্লাইবের জীবনী লিখিতে গিয়া বলিয়াছেন, "বাঙ্গালী যাহা কিছু করে, তাহা নিতান্ত অবসন্নভাবে করিয়া থাকে। আলস্যই তাহাদিগের প্রিয় অবলম্বনীয়। বাঙ্গালী শারীরিক শ্রমসাধ্য কোন কাজ করিতে চাহে না এবং যদিও বিবাদকালে খুব বাক্‌পটুতা দেখাইয়া থাকে, কিন্তু প্রায়ই তাহারা ব্যক্তিগত যুদ্ধে লিপ্ত হয় না এবং প্রায়ই সর্ব্বদা সৈন্যদল ভুক্ত হয় না। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সমস্ত সৈন্যদলের মধ্যে একশতটী খাঁটী বাঙ্গালী আছে কি না, আমরা এমত সন্দেহ করি। বাঙ্গালীরা স্বভাব চরিত্র দ্বারা বিজাতীয়দিগের অধীনে থাকিতে এত দূর সম্পূর্ণ উপযুক্ত যে, জগতে এরূপ কোন জাতিই কোন কালে ছিল না।"

লর্ড মেকলে, আর এক স্থলে কেবল বাঙ্গালী জাতি নহে, সমগ্র ভারতবাসীকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন, "তিনি (লর্ড ক্লাইব) জানিতেন যে, ইংলণ্ডে সুনীতির যে, উচ্চ সীমা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহার সহিত ভারতীয় দিগের নৈতিক চরিত্রের অসীম পার্থক্য বিরাজমান। তিনি জানিতেন যে, ইয়ুরোপে যাহাকে আত্ম সম্মান বলে, সেই আত্ম সম্মান বোধ হীন লোকদিগের সহিত এবং যে সকল লোক কিছুমাত্র দ্বিধা না করিয়া প্রতিজ্ঞা করে, কিছুমাত্র লজ্জিত না হইয়া প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে এবং যে সকল লোক আপনাদিগের উদ্দেশ্য পূরণ জন্য অবাধে প্রবঞ্চনা, প্রতারণা, জালিয়াতি এবং মিথ্যার আশ্রয় লয়, তাহাদিগকে লইয়া কাজ করিতে হইবে।"

এখন মিল এবং মেকলের কিঞ্চিৎ পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ের এক জন উচ্চপদস্থ ইংরাজ রাজপুরুষ কি বলিয়া গিয়াছেন তাহা দেখা যাউক। বিখ্যাত বাগ্মী বর্কের নাম সকলেই জানেন। তিনি ওয়ারেণ হেষ্টিংসের স্মরণীয় বিচার কালে এক স্থলে বলিয়াছেন, "এই জাতির অর্থাৎ হিন্দুজাতির দোষ থাকিতে পারে, কিন্তু এই যে, জাতি তাহাদিগের সমাজনীতি এবং বিধি প্রণালী আমাদিগের (ইংরাজদিগের) সে দিনকার উৎপত্তির বহু বর্ষ পূর্ব্বে সৃষ্টি করিয়াছে, ঈশ্বর না করুন, আমাদিগকে সেই জাতির উপর মন্তব্য প্রকাশ করিতে না হয়। হিন্দুদিগের স্বভাবে দোষ এবং বিধি প্রণালীতে ভ্রম থাকি-

লেও তাহাদিগের সমাজবিধি, যাহা তাহাদিগের স্বভাবের উপর প্রবলভাবে প্রভুত্ব করিতেছে, সেই সমাজ বিধির দুইটী মূল গুণ থাকায়, তজ্জন্য তাহাদিগকে সম্মানের পাত্র করিয়াছে—প্রথমটী সেই সমাজ বিধির প্রবল শক্তি ও দৃঢ় স্থায়িত্ব এবং দ্বিতীয়টী উৎকৃষ্ট নৈতিক সুফল-জনকতা।”

এখন বর্কের কিঞ্চিৎ পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ের আর একজন উচ্চপদস্থ ইংরাজ খ্যাতনামা শাসনকর্ত্তা মিঃ হলোয়েল কি বলিয়া গিয়াছেন দেখা যাউক। তিনি বাঙ্গালার বিভিন্ন জেলার বিষয়ে মন্তব্য প্রকাশ করিয়া শেষ বর্দ্ধমান জেলার লোকদিগের সম্বন্ধে বলেন, “সত্য বলিতে কি, এই সুখী প্রজাদিগকে উৎপীড়িত করা নিতান্ত নিষ্ঠুরতাজনক হইবে; কারণ এই জেলাটীই প্রাচীন হিন্দুশাসনের সৌন্দর্য্য, পবিত্রতা, দয়া, সুনিয়ম, সমতা, এবং ন্যায় বিচারের নিদর্শনস্বরূপ বিরাজমান। এখানে কাহাকেও লোকের ধন সম্পত্তি এবং শরীরের প্রতি আদৌ হস্তক্ষেপ করিতে দেখা যায় না। এখানে প্রকাশ্যে বা গোপনে আদৌ চুরির কথা শুনা যায় না। পর্য্যটক, বাণিজ্য দ্রব্য লইয়া যাইলে, বা না লইয়া যাইলেও, তাহাকে আশু রক্ষণাধীনে লওয়া হয় অর্থাৎ তাহার রক্ষার জন্য বিনা ব্যয়ে প্রহরী নিযুক্ত করিয়া এক গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে পৌঁছাইয়া দেওয়া হয়। ইহার দ্বারা জানা যাইতেছে যে, তাহাকে বাসা দান এবং তাহার ধনাদি নিরাপদে রক্ষা করিবার সমস্ত ব্যবস্থা করা হয়। এক গ্রাম পার হইয়া, তাহাকে অন্য গ্রামে লইয়া গিয়া ভদ্রতার সহিত অন্য প্রহরীর রক্ষণাধীনে অর্পণ করা হয়। প্রথম প্রহরী সেই পর্য্যটকের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিয়াছিল, তাহা পর্য্যটকের মুখে শুনিয়া, তাহা একখানি কাগজে লিখিয়া, তৎসহ পর্য্যটকের দ্রব্যাদির এক খানি প্রাপ্তিস্বীকারপত্র প্রথম প্রহরীকে দিয়া, দ্বিতীয় প্রহরী তাহাকে বিদায় দান করে। সেই কাগজ ও প্রাপ্তিপত্রখানি প্রথম গ্রামের অধ্যক্ষের হস্তে দেওয়া হয়। তিনি তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া নিয়মিতরূপে রাজার নিকট পাঠাইয়া দেন। যদি এই বর্দ্ধমান জেলার মধ্যে কাহারও কিছু হারাইয়া যায়, তাহা হইলে যে ব্যক্তি তাহা প্রাপ্ত হয়, সে তাহা নিকটবর্ত্তী বৃক্ষের উপর ঝুলাইয়া রাখিয়া নিকটবর্ত্তী থানায় তাহা জানায়। থানার অধ্যক্ষ

অবিলম্বে ঢোলের দ্বারা ঢেঁড়রা দিয়া, সেই বিষয়টী সকলকে জ্ঞাত করেন এবং যাঁহার দ্রব্য, তিনি আসিয়া লইয়া যান।"

এখন মিল মেকলের উক্তির সহিত আপনারা হলোয়েলের উক্তি মিলাইয়া দেখুন। অবশ্যই বুঝিতে পারিবেন, প্রথম দুই ব্যক্তি অনভিজ্ঞতা, এবং বিদ্বেষ বুদ্ধির বশম্বদ হইয়া বিষাক্ত উক্তি উদ্গীরণ করিয়াছেন কি না? মিলের ইতিহাসখানি আমাদিগের পরম বন্ধু হোরেস হেমান উইলসনের দ্বারা সম্পাদিত। সন্তোষের বিষয় যে, মুখের মত প্রতিষেধক ঔষধ তিনি ইতিহাসের প্রত্যেক গলিত পূতিগন্ধবিশিষ্ট স্থলে সংলিপ্ত করিয়া দিয়াছেন। উইলসনের দুই একটা কথা এখানে উদ্ধৃত করা কর্ত্তব্য।

সকলেই জানেন, উইলসন কলিকাতায় বাস করিতেন, বাঙ্গালী জাতির সকল শ্রেণীর সহিত মিশিতেন, সুতরাং বাঙ্গালী চরিত্র সম্বন্ধে তাঁহার যেরূপ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছিল, মিল মেকলের সেরূপ ছিল না, ইহা অভ্রান্ত সত্য। উইলসন উচ্চ শ্রেণীর বাঙ্গালীদিগের সম্বন্ধে লেখেন, "বিশুদ্ধ সত্য আচরণ এবং বিস্তৃত অভিজ্ঞান শক্তি, উদার ভাব এবং স্বাধীন নীতিকৃতির জন্য তাঁহারা জগতের যে কোন দেশে ভদ্রলোক বলিয়া গণ্য হইতে পারেন। এই শ্রেণীর কয়েক জনের সহিত আমার বন্ধুতা হইয়াছে, এবং আশা করি যে, আজীবন আমি সেই বন্ধুতা রাখিতে পারিব।"

বাঙ্গালার পণ্ডিতমণ্ডলীর চরিত্র সম্বন্ধে তিনি লেখেন "আমি ইহাঁদিগের মধ্যে সেইমত শ্রমশীলতা, বুদ্ধিমত্তা, সন্তোষ এবং সরলতা দেখিতে পাই।"

কলিকাতা মিণ্টের নিম্নশ্রেণীর শ্রমজীবী, কারিকর প্রভৃতির সহিত কার্য্যসূত্রে প্রত্যহ উইলসনের সাক্ষাৎ হইত। তিনি সেই নিম্নশ্রেণীর বাঙ্গালী সম্বন্ধে বলেন, "আমি সর্ব্বদাই তাহাদিগের মধ্যে সানন্দে শ্রমশীল, উপরিতন প্রভুদিগের আজ্ঞা পালনে সতত তৎপর, এবং যে কোন শ্রমসাধ্য কার্য্যে অগ্রসর দেখিতে পাই। তাহাদিগের মধ্যে মদ্যপানে উন্মত্ততা, কুৎসিত আচরণ এবং অবাধ্যতা দেখিতে পাই না।"

এখন মিল মেকলের উক্তির বিরুদ্ধে আমাদিগকে আর অধিক প্রমাণ হাজির করিতে হইবে না। এখন আমরা কবিবর ভারতচন্দ্রের একটী উক্তি

স্মরণ করিয়া, মিল মেকলেকে এই স্থলেই হাস্যের সহিত বিদায় দিতে পারি।

এখন আমাদিগের জাতির বর্ত্তমান চরিত্রগত অবস্থা সম্বন্ধে দুই চারি কথা বলিয়া প্রসঙ্গের উপসংহার করিতে হইবে। আমাদিগের জাতীয় চরিত্রের বর্ত্তমান অবস্থা কিরূপ, তাহা অপরের অপেক্ষা আমরা নিজে অবশ্য অধিক জানি।

বিধির বিধানে ব্রিটিশ জাতির কল্যাণে এখন নবীন ভারতে নবযুগের আবির্ভাব হইয়াছে। কঠোর যবন শাসনের ঘোর আঁধারের পর এখন ব্রিটিস শাসনে উন্নতি সুখ শান্তিরূপ উষা ধীরে ধীরে প্রাচ্যগগণে দেখা দিয়াছে। আমরা এখন সন্ধিস্থলে দণ্ডায়মান–আমরা এখন অতীতের অনেকগুলি বিষয়কে বিদায় দিয়া, অনেকগুলি নবীন ভাব, নবীন শিক্ষা, নবীন রুচি, নবীন কল্পনা, নবীন শাসনকে আলিঙ্গন দান করিতেছি। পাশ্চাত্য শিক্ষার সহিত প্রাপ্য জ্ঞানের যে, শুভ উদ্বাহ সাধিত হইয়াছে, আমরা তাহার শুভ ফল প্রত্যাশী, আমরা এখন নবীন মূর্ত্তিতে নবীন স্ফূর্ত্তিতে, নবীন উৎসাহে, নবীন উদ্যমে, জগতের সমক্ষে দণ্ডায়মান হইয়াছি। আমরা ভীরু, শঠ, প্রবঞ্চক, জালিয়াত, মিথ্যাবাদী, কাপুরুষ, দুর্ব্বল এবং সাহসহীন—এখনও উদয়াস্ত এই কথাগুলি আমাদিগের কাণে প্রবেশ করিতেছে। প্রত্যহ প্রভাতে উঠিয়াই ইংরাজ সম্পাদিত দৈনিকপত্রে আমাদিগের জাতির শ্রাদ্ধের মন্ত্র পাঠ করিতে পাই। যাঁহারা ঐ কথাগুলি সৃষ্টি করিয়াছেন, যাঁহারা আমাদিগের বিশেষণগুলি প্রদান করিয়া জগতের সমক্ষে আমাদিগের পরিচয় দান করিয়াছেন, তাঁহারা এখনও লয়ের সঙ্গে মিল রাখিবার জন্য সুর টানিয়া আসিতেছেন। জানি না কবে, তাঁহারা নীরব হইবেন।

ঢাকুর সমালোচনা।

২।

কায়স্থ জাতির ক্ষত্রিয়ত্ব বর্ণনের পরেই গ্রন্থকার স্বীয় সমাজের ইতিহাস লিখিয়াছেন। গ্রন্থকারের আদর্শ পদ্য ঢাকুরে লিখিত আছে যে, বারেন্দ্র কায়স্থ সমাজ সংস্থাপনকারী ভৃগুনন্দী, নরদাস ঠাকুর ও মুরারী দেব বাকী ইঁহারা তিনজনে বল্লান সেনের সময় সাময়িক। গ্রন্থকার বলেন যে "বারেন্দ্র কায়স্থ সমাজ সংস্থাপন কারীগণ যে বল্লালের সমসাময়িক নহেন, তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।" গ্রন্থকার এই স্থলে ভৃগুর অধঃস্তন কয়েক পর্য্যায়েরমাত্র উল্লেখ করিয়া একটী গুরুতর বিষয়ের মীমাংসা করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। গ্রন্থকার ভৃগুর অধঃস্তন চতুর্দ্দশ পর্য্যায়ের উল্লেখ করেন। কিন্তু আমরা ভৃগুর সমসাময়িক অন্যান্য ব্যক্তিগণের পর্য্যায়ের যে হিসাব সংগ্রহ করিয়াছি, তাহাতে বর্ত্তমান পর্য্যায়ের উর্দ্ধে ১৬। ১৭ পর্য্যায়ের নামের তালিকা পাইয়াছি। কিন্তু তাহাতেও ভৃগুর সমকালীয় ব্যক্তিগণের নাম পাই নাই। গ্রন্থকার কিরূপ উপায়ে, ভৃগুর বংশের বর্ত্তমান শেষ পর্য্যায়ের উর্দ্ধে ভৃগুকে সংস্থাপন করিলেন তাহা আমরা জ্ঞাত নহি। বরং এই বিষয়ে ভৃগুর বংশীয় কতিপয় প্রাচীন ব্যক্তির নিকট হইতে আমরা প্রতিবাদ প্রাপ্ত হইয়াছি। আর গ্রন্থকারের অবলম্বিত পদ্য ঢাকুরে আছে যে,—

চতুর্ব্বিংশতি পুরুষ ভৃগু অবধি করিয়া।
উত্তম মধ্যম কার্য্য যাইছে চলিয়া॥

গ্রন্থকার এ কথার বাদ প্রতিবাদ কিছুই করিলেন না কেন?

আমাদিগের গ্রন্থকার শৌলকুপ ও নন্দীগ্রামকে বরেন্দ্রভূমির অন্তর্গত নহে, বলিয়া একটী গুরুতর ভ্রমের কারণ করিয়াছেন। বরেন্দ্রভূমির ইতিহাস অনুসন্ধান করিতে যাইয়া, ঐ সকল স্থান যে বরেন্দ্র ভূমির মধ্যগত তাহা আমরা বিলক্ষণ রূপে অবগত হইয়াছি। আমরা অনুমান করি যে বল্লাল

সেনের উৎপীড়ন ভয়েই, সম্ভবত তৃগুনন্দী সর্ব্ব প্রথমে বরেন্দ্র ভূমির মধ্যগত নন্দীগ্রাম নামক স্থানে বাস করেন। এই সময় বরেন্দ্র ভূমিতে, পালবংশীয় রাজাদিগের রাজত্বের শেষাবস্থা। সুতরাং বল্লালসেনের পূর্ণ অধিকার না থাকাই সম্ভব। কারণ মহীপাল ও কতিপয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূস্বামিগণ সেই সময় প্রতাপ সম্পন্ন ছিলেন। সুবিজ্ঞ রাজা (ডাক্তার) রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও কনিংহাম সাহেব বিশিষ্ট-হেতুর দ্বারা এই কথা সপ্রমাণ করিয়াছেন।

আমরা এই ক্ষণ গোত্র ও প্রবর সম্বন্ধে গ্রন্থের অপরার্দ্ধ ভাগ আলোচনা করিব। বারেন্দ্র কায়স্থ সমাজে যে কয়েকটী বংশ আছেন, তাহার মধ্যে নন্দীবংশের কাশ্যপ গোত্র ও কাশ্যপ, অপ্‌সার ও নৈধ্রুব এই তিন প্রবর। চাকীবংশের গৌতম গোত্র ও গৌতম, আঙ্গীরস, বার্হস্পত্য, অপ্‌সার ও নৈধ্রুব এই পঞ্চপ্রবর। সিংহ বংশের বাৎস্য গোত্র ও নাগ বংশের সমান প্রবর। এই স্থলে বলিয়া রাখা কর্ত্তব্য যে কোন কোন দেববংশ নন্দীবংশের সহিত সমান গোত্র।

গ্রন্থকার বলেন যে "গোত্র শব্দে বাস্তবিক আদি পুরুষ বুঝায় এবং ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য কোন জাতির গোত্র প্রবর্ত্তক নাই; ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রাদির গোত্র পুরোহিত সম্পর্কেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আর্য্য ধর্ম্ম শাস্ত্রের এই বাক্য আমরাও অবনত মস্তকে স্বীকার করি।

সমান গোত্রে ও সমান প্রবরে অর্থাৎ সমান বংশে বিবাহ করা আর্য্যধর্ম্ম শাস্ত্রের মত নহে। ইহার কারণ অনেকেই অনুমান করেন, যে একইবংশের স্ত্রী পুরুষ দ্বারায় সন্তান উৎপন্ন হইলে, তাহারা হীনবল ও ক্ষীণমনা হইয়া থাকে। গ্রন্থকার ইহাতে আপত্তি করিয়া বলেন, "ইতিহাস পুরাণাদিতে দেখা যায়, বহুকাল যাবত ক্ষত্রিয় জাতি সবংশ বিবাহ করিয়া আসিয়াছেন অথচ তাঁহাদিগের মধ্যেই অধিকাংশই শৌর্য্য বীর্য্যশালী বীর পুরুষ এবং সেরূপ বীর-পুরুষ ব্রাহ্মণ জাতিতে নাই।" গ্রন্থকার শাস্ত্রবিদ্‌ ও পণ্ডিত। ইতিহাস ও পুরাণাদি বিলোড়ন করিলে তিনি পরিজ্ঞাত হইবেন, যে সময় ক্ষত্রিয়গণের মধ্যে সবংশ বিবাহ প্রথার পূর্ণ প্রসারণ হইয়াছিল, তখন তাহাদিগের বাস্তবিক গৌরবের সময় নহে। যদুবংশ প্রভৃতি মামাতু পিসাতু ভাই ভগিনীতে ও পাণ্ডবেরা এক পত্নীতে উপগত ছিলেন। ইহার কি কোনই মন্দ ফল

তাঁহাদিগের বংশধরগণ লাভ করেন নাই? বাস্তবিক ক্ষত্রিয়গণ এই সময় হইতেই ক্ষীণ বীর্য্য, হীন বল ও অল্পায়ু অপত্য উৎপাদন করিয়াছেন।

সবংশবিবাহ যে দূষণীয় তাহা উনবিংশ শতাব্দীর বিদ্যাভিমানী জার্ম্মন জাতিগণ সম্প্রতি উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইতেছেন। জার্ম্মণ রাজবংশীয় ব্যক্তিগণ যে হীনমনাদি হইয়া থাকেন তাহার কারণ, জর্ম্মাণ শারীর তত্ত্ববিদে-রাও সবংশ বিবাহকেই নির্দ্দেশ কবিয়াছেন। কিন্তু এই গুরুতর বিষয় সম্বন্ধে বহু কাল পূর্ব্বে সর্ব্বলোক দর্শী ত্রিকালজ্ঞ আর্য্য শারীরতত্ত্ববিদ্ মহর্ষিগণ বলিয়াছেন—

অতুল্য গোত্রাং বৃষ্যাঞ্চ প্রহৃষ্টাং নিরুপদ্রবাং।
শুদ্ধস্নাতাং ব্রজেন্নারীমপত্যার্থী নিরাময়ঃ॥

চরক-সংহিতা।

অতুল্য গোত্রা, বৃষ্যা, প্রহৃষ্টা ও শুদ্ধ-স্নাতা নারীতে গমন করিবার ব্যবস্থা দিয়াছেন। অবশ্য ইহার কারণ এই যে, বৃষ্যা প্রহৃষ্টাদি নহে, এরূপ নারীতে গমন করিলে পুরুষ দুর্ব্বল ও সন্তান হীনবল ও ক্ষীণ মস্তিষ্ক সম্পন্ন হইয়া থাকে। ইহা হইলে, তুল্য গোত্রাও যে ঐ ফল প্রসব করে, তাহা বরং অধিকতর যুক্তি সঙ্গত। অপিচ সবংশ বিবাহ করিবার নিয়মে ব্যাভিচারাদি অন্যরূপ অনর্থও ঘটে, এজন্যও বিপ্রগণ উহা পরিবর্জ্জন করিয়াছেন। যাহাই হউক, বিশাল আর্য্যধর্ম্ম-শাস্ত্র যাহাকে নিষিদ্ধ বলেন, তৎসম্বন্ধে ভ্রম প্রতিপাদন করিতে অগ্রসর হওয়া আমাদিগের পক্ষে ধৃষ্টতামাত্র। যাঁহারা পাশ্চাত্য জ্ঞান তরঙ্গে দোলায়মান, তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন যে, উনবিংশ শতাব্দীর আচার্য্য জার্ম্মণ বা 'শর্ম্মণগণ' কি বলিতেছেন।

গ্রন্থকার বলেন যে সগোত্র বিবাহ ব্রাহ্মণের পক্ষেই সর্ব্বথা নিষিদ্ধ। কেন না, ব্রাহ্মণের গোত্র ও বংশ অভিন্ন ও এক। ক্ষত্রিয় বৈশ্যের সেরূপ নহে। সুতরাং ইহাদিগের সগোত্র বিবাহ নিষিদ্ধ নহে। রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য মহাশয়, মনু ও শাতাতপ বচনে দ্বিজাতি শব্দের উল্লেখ দৃষ্টে, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য সম্বন্ধে উক্তরূপ বিবাহ নিষিদ্ধ বলিয়াছেন। ইহার মতে কেবল শূদ্রের সগোত্র বিবাহ দূষণীয় নহে। কিন্তু সপিণ্ড ও সমানোদক সম্বন্ধে দ্বিজাতি ও শূদ্রের কোন বিশেষ নাই।

বঙ্গীয় স্মার্ত্তদিগের মতে; বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণ ও শূদ্র ভিন্ন জাতি নাই। কায়স্থগণ ক্ষত্রিয় হইলেও পাতিত্য নিবন্ধন শূদ্রবৎ ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছেন। কিন্তু তাহা হইলেও, কায়স্থগণ আর্য্যবংশীয় নিবন্ধন, শূদ্রের ন্যায় সপিণ্ড ও সমানোদক বর্জ্জন করিয়া সবংশ বিবাহ কোন দিনই করেন না এবং এইরূপ বিবাহ যে সর্ব্বথা দূষণীয় তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, আমাদিগের গ্রন্থকার আর্য্য অভিমানী হইয়াও সবংশবিবাহ সম্বন্ধে স্বীয় মত ব্যক্ত করিয়াছেন। এই মত পরিব্যক্ত করায়, তিনি কেবল স্বকীয় সমাজে নহেন,সমগ্র কায়স্থ সমাজেই নিন্দিত হইয়াছেন।

বারেন্দ্র কায়স্থ সমাজে বহুকাল যাবৎ সবংশ বিবাহ প্রথা প্রচলিত নাই। বিপ্র জাতির অনুকরণে যে ইহাঁরা ঐরূপ প্রথা পরিহার করেন, তাহাতে গ্রন্থকারের আস্থা নাই। তিনি বলেন "ব্রাহ্মণ জাতির অনুকরণ করিলে কেবল সগোত্র নহে সমান প্রবর বিবাহও দূষণীয় হয়। * * * চাকী ও নন্দীবংশের অপ্‌সার ও নৈধ্রুব প্রবর সমান, বিশেষত নাগ ও সিংহ বংশ ভিন্ন গোত্র হইলেও সমান প্রবর। * * * বারেন্দ্র কায়স্থগণ সগোত্র বিবাহ করিবেন না কিন্তু সমান প্রবর বিবাহ করিবেন, ইহা শাস্ত্র ও যুক্তি উভয়েরই অনুমোদিত নহে। পরন্তু কোন কোন দেববংশ কাশ্যপ গোত্র আছেন। ইহাদিগের সহিত নন্দীবংশের কন্যা পুত্রের আদান প্রদান হইতেছে। এ স্থলে সগোত্র বিবাহ হইতেছে। শাস্ত্র ও যুক্তি অনুসারে এরূপ দূষণীয় নহে। অসপিণ্ড ও অসমানোদক স্থলে উভয় নন্দীবংশেও বৈবাহিক ক্রিয়া দূষণীয় হয় না।" গ্রন্থকার এই স্থলে স্বীয় বিচক্ষণতা ও পাণ্ডিত্য মলিন করিয়াছেন, এজন্য আমরা দুঃখিত হইলাম। বিপ্র স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যের আসন অধিকার পূর্ব্বক গুরুতর ব্যবস্থা প্রদান করত তিনি যে প্রগল্‌ভতা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা লজ্জার বিষয় বটে। তিনি সপিণ্ড ও সমানোদক স্থলটী বাদ না দিয়া জার্ম্মণি বা স্কন্দনেবিয়ান আর্য্যগণের অনুবর্ত্তী হইলেই পারিতেন। ফলে তিনি স্বকীয় ব্যবস্থার অনুগামী হইতে পারেন, কিন্তু তদীয় সমাজ তাহা কখনই গ্রহণ করিবেন না।

অনেকে কায়স্থগণকে বর্ণসঙ্কর রূপে প্রতিপাদন করেন। তাঁহাদিগের উক্ত রূপ সিদ্ধান্ত যে ভ্রান্তিমূলক ও বিদ্বেষজনক তাহা নিরপেক্ষ ভাবে পুরা-

ণাদি শাস্ত্রের আলোচনা করিলেই প্রতীয়মান হয়। কায়স্থগণ বর্ণসঙ্কর হই-লেও আর্য্যত্ব নিবন্ধন, এস্থলেও সবংশ বিবাহ করিবার অধিকারী নহেন। আরো একটী কথা এই যে, বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণ ও শূদ্র ভিন্ন জাতি প্রথমাবস্থায় না থাকায় শূদ্রবৎ শাসনাধীন জন্য যে কায়স্থগণ ক্ষত্রিয়ত্ব বা আর্য্যত্ব নষ্ট করিয়া সবংশ বিবাহ করিবেন ইহাও কোনরূপে সঙ্গত সিদ্ধান্ত নহে!

বারেন্দ্র কায়স্থ-সমাজ মধ্যে ঢাকী ও নন্দীবংশের সমান প্রবর অথবা কোন দেববংশের সহিত নন্দীবংশের সমান গোত্র কিম্বা নাগ ও সিংহবংশের সমান প্রবর থাকিলেও, ইঁহাদিগের বংশ কখনই এক নহে। এই সকল বংশ কর্ত্তার নাম স্বতন্ত্র এবং ব্যক্তিও স্বতন্ত্র ছিলেন। সুতরাং পূর্ব্বরূপ সমান গোত্র বা সমান প্রবর, ইহাদিগের মধ্যে যে বৈবাহিক ক্রিয়া চলিয়া আসিতেছে, তাহা, যে সমান বংশে হয়, এ কথা কখনই বলা যাইতে পারে না এবং এই জন্যই ঐরূপ ভাবে উক্ত সমাজে কন্যা পুত্রের আদান প্রদান বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। উত্তরকালে, সমান গোত্রীয় কিন্তু বংশে পৃথক, অথচ এক ঔপাধিক কতিপয় ঘর ঐ সমাজে প্রবেশ লাভ করে। এমত স্থলে, ঐ সকল ঘর বংশে যে পৃথক, সামাজিকগণ ইহার বিশদ প্রমাণ না পাওয়া হেতু সমান গোত্রীয় ও এক ঔপাধিক ব্যক্তিগণের মধ্যে বৈবাহিক সম্বন্ধ সংস্থাপন করেন না। এইরূপ ব্যবহারে সামাজিকগণের দূরদর্শিতা ও আর্য্যত্বাভিমানের সবিশেষ প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। সুতরাং আমা-দিগের গ্রন্থকার, বারেন্দ্র কায়স্থ সমাজে সবংশ বিবাহ প্রথা আছে বলিয়া যে বাক্য উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা নিতান্ত অশ্রদ্ধেয়। উক্ত সমাজে রূপরায় নামক এক ব্যক্তি সবংশ বিবাহ করিয়া হীন হইয়াছিলেন। পদ্ম ঢাকুর রূপ রায়ের অপকার্য্যের উল্লেখ করিয়া, তাহার অপর ভ্রাতাগণের আচরণ যে শ্রেষ্ঠ তাহা বর্ণন করিয়াছেন। ইহা ব্যতীত সামাজিক জনশ্রুতিও ঐ কথা সপ্রমাণ করে। পূর্ব্বকথিত ভাবে সগোত্র বিবাহ উক্ত সমাজে প্রচলিত থাকায় ঢাকুরে লিখিত "সগোত্র বিবাহ" দ্বারায় সবংশবিবাহই প্রমাণিত হইতেছে। ব্যক্তি বিশেষের কোন সামাজিক কুকীর্ত্তিই, যে কোন চেষ্টাতেও কখনই বিদূরিত হয় না। স্মৃতি তরঙ্গে যাহা উদ্বেলিত হয়, সমাজ মারুতে যাহা বহমান,তাহাকে বিনাশ করিবার আশা করা অসঙ্গত। গ্রন্থকার সদাচারকেই

আর্য্যত্বের কারণ এবং এই সদাচার যে আর্য্যাবর্ত্তের ব্রাহ্মণগণের নিকট শিক্ষণীয়, ইহা উল্লেখ করা সত্বেও যে বংশ-বিবাহ রূপ অসদাচরণের পোষকতা করিয়াছেন, তাহাতে আমরা দুঃখিত।

গ্রন্থকার দাস বংশের বিবরণের টীকাতে, দাস শব্দের অর্থ করিতে যাইয়া স্বীয় তত্বজ্ঞতার পরিচয় প্রদান করত, যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তজ্জন্য আমরা তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ হইলাম। ইহার দ্বারায় শাস্ত্রের মর্ম্ম পরিস্ফুট ও সাধারণের ভ্রম অপসারিত হইবেক। গ্রন্থকার বলেন সামাজিক কায়স্থগণ ক্ষত্রিয় হইলেও বঙ্গবাস নিবন্ধন শূদ্রবৎ দাসোপাধি প্রাপ্ত এবং ক্ষত্রিয়ের সংস্কার বর্জ্জিত হইয়াছেন। শূদ্রের দাসোপাধি নিমিত্ত জাতি মাত্রেই দাস্যপরায়ণ নহে। ঋগ্বেদের দাস শব্দের অর্থ শত্রু এবং দাস শব্দ কখনই শূদ্র পরিচায়ক নহে।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মত এই যে আর্য্যগণ অন্যত্র হইতে আসিয়া ভারতে উপনিবেশী হয়েন। কিন্তু বিশাল হিন্দুশাস্ত্রে একথার কোন বিন্দু বিসর্গ দৃষ্টিগোচর হয় না। আমাদিগেরও মত এই যে আর্য্যজাতি আর্য্যাবর্ত্তেই জাত এবং আর্য্যত্ব ঐ স্থানেই প্রসূত হইয়াছে। আর্য্যগণ অন্যত্র হইতে আসিয়া ভারতের উপনিবেশী হয়েন, এই অসার ও আজগবী মতের দ্বারা যাঁহাদিগের মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়াছে, তাঁহারা সমালোচ্য গ্রন্থকারের এই স্থলটী পাঠ করিলে অবশ্যই শিক্ষা লাভ করিয়া প্রকৃতিস্থ হইবেন। কি পরিতাপের বিষয়! আমরা স্বকীয় শাস্ত্রের আলোচনা না করিয়া, বৈদেশিকের অমৌলিক ও ভ্রান্ত মতের অনুসরণ করিতেছি। আমরাও গ্রন্থকারের সহিত বলিতেছি, যে বৈদিক জনগণই আর্য্য এবং ব্রহ্মাবর্ত্ত ও ব্রহ্মর্ষি দেশই যে আর্য্যজাতির আদি নিবাস স্থান, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

শ্রীকৃষ্ণচরণ মজুমদার।
বরেন্দ্রভূমি।

বৃন্দাবন।

চৈত্র, ১২৯৫।

আমরা রাত্রিশেষ মথুরা ষ্টেসনে পৌঁছিলাম। মথুরা হইতে বৃন্দাবন তিন ক্রোশ। একখানি ঘোড়ার গাড়ী করিয়া বৃন্দাবন চলিলাম। তখনও প্রভাত হয় নাই; বন, ঝোপ, অট্টালিকাতে অন্ধকার ঘনীভূত হইয়া রহিয়াছে। ষ্টেসন মথুরার পূর্ব্ব প্রান্তে; বৃন্দাবন যাইতে হইলে সমস্ত সহর ভেদ করিয়া পশ্চিমাভিমুখে যাইতে হয়। সেই অন্ধকারে [illegible] অট্টালিকা পরিপূর্ণ মথুরার মধ্য দিয়া চলিলাম। কিছুই দেখিতে পাইতেছি না, যেন কেবল অন্ধকার স্তূপ সকল শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দুই পার্শ্বে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। গাড়ী যে কতবার দিক্ পরিবর্ত্তন করিল অর্থাৎ নূতন রাস্তায় প্রবেশ করিল তাহার ইয়ত্তা নাই। শকট চালকের পার্শ্বস্থিত ব্রজবাসী মহারাজ মধ্যে মধ্যে আমাদিগকে স্থান বিশেষের পরিচয় দিতেছিলেন, কিন্তু সে অন্ধকারে কৌতূহল বৃদ্ধি ভিন্ন তাহাতে আমাদের বিশেষ কোন উপকার হয় নাই। যাহা হউক, সময়ে সময়ে অতি মধুর ধ্বনি আমাদের শ্রুতিগোচর হইতেছিল। স্ত্রীলোকেরা রাত্রিশেষে উঠিয়া গম, যব, দানা ভাঙ্গিতেছে এবং শ্রমলাঘব করিবার জন্য সেই মধুর স্বরে গলা মিলাইয়া গান ধরিয়াছে। সহর প্রায় নিস্তব্ধ; আমরা আগন্তুক বাঙ্গালী পরম কৌতূহলী; আমাদের অদ্ভুত আনন্দের উদ্রেক হইয়াছিল।

মথুরা ছাড়িয়া আসিলে, রাত্রি প্রভাত হইল। সম্মুখে কতকগুলি গরুর গাড়ী দেখিতে পাইলাম। আহা গরুগুলির কিবা রূপ। সুপুষ্ট দেহ, সুন্দর কান্তি, চর্ম্ম অতি মসৃণ, গলায় এক একটী ঘণ্টা বাঁধা। গাড়ীগুলিও ঠিক আমাদের দেশের ন্যায় নহে। চাকাগুলি আরও মজবুত, গাড়ীগুলি দ্বিগুণ ভার ধারণে সক্ষম। গরু সংযুক্ত করিবার প্রণালীও অন্যরূপ। দুইটী তিনটী চারিটী গরুও কোন গাড়ীতে সংযুক্ত রহিয়াছে। তাহারা অনায়াসে সারথি এবং তাঁহার রথস্থিত গুরুভার স্কন্ধে লইয়া মৃদুমন্দ গতিতে ঝুনুঝুনু

শব্দ করিয়া বৃন্দাবনের দিকে চলিয়া যাইতেছে। আমরা মুহূর্ত্ত মধ্যে গাড়ী গুলি ছাড়াইয়া চলিলাম।

ক্রমে বৃন্দাবনের নিকটবর্ত্তী হইলাম। প্রথমেই পথের বাম দিকে জয়পুরের মহারাজার 'মধোবিলাস' নামক দেবমন্দির প্রস্তুত হইতেছে দেখিলাম। পরে বৃন্দাবনের চিরপরিচিত বানরগুলি দেখা দিলেন। তাঁহাদের খর্ব্বাকৃতি রক্তিমাবর্ণ মুখ এবং বিদেশীদের সহিত কৌতুকপ্রিয়তা সকলেই জানেন। তখনও সূর্য্যোদয় হয় নাই। প্রভাতে অন্ধকার বিনষ্ট হইয়াছে, কিন্তু সূর্য্যের প্রখর রশ্মি দেখা দেয় নাই। সূর্য্য কিরণের মহৎ দোষ এই যে, ইহা ভাল মন্দ উভয়ই স্পষ্ট ভাবে, চক্ষুর সম্মুখে ধরিয়া দেয়। কিন্তু সে দিন প্রভাতে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে, কুৎসিত বস্তুও ঐন্দ্রজালিক রূপে নয়ন গোচর হইয়াছিল। আমরা কিছুই কুৎসিত দেখিতে পাই নাই, সকলই যেন মনোহর। কোন অপার্থিব শক্তি যেন রাত্রিকালে যেখানে যাহা কুৎসিত ছিল, স্থানান্তরিত করিয়া গিয়াছে। এইরূপ সময়ে, চিত্রপটস্থ ছবিখানির ন্যায় বৃন্দাবন ধাম গাড়ী হইতে আমাদের নয়ন গোচর হইল। কি চক্ষে বৃন্দাবন দেখিলাম বলিতে পারি না! অট্টালিকার পর অট্টালিকা, ছাদের উপর ছাদ, মাঝে মাঝে এক একটী দেব মন্দিরের চূড়া। চূড়াগুলি কোনটী শ্বেত, কোনটী লাল; গঠন প্রণালীও আমাদের দেশ হইতে বিভিন্ন। বিস্ময়াবিষ্ট চিত্তে আমরা সহরে প্রবেশ করিলাম। সম্মুখেই তৃণাচ্ছাদিত একটী ক্ষুদ্র ময়দান, চতুর্দ্দিকে বিবিধ অট্টালিকা শোভা পাইতেছে। পশ্চিমে গোবিন্দ জীউর ইতিহাসপ্রসিদ্ধ লাল মন্দির, উত্তরে শেঠজীর মন্দির, আরও উত্তরে লালাবাবুর মন্দির। শেঠজীর মন্দিরের মধ্যস্থলে সুবর্ণ স্তম্ভ দেখা যাইতেছে। দক্ষিণ পূর্ব্ব কোণে শেঠজীর বাগান, ঠিক্ দক্ষিণে বৃন্দাবনের বাৎসরিক মেলার গৃহাদি নির্ম্মিত হইতেছে। আমাদের দক্ষিণ পার্শ্বে পুলিষ এবং বামে সহরের অভ্যন্তরে যাইবার সুপ্রস্তুত পথ। ঐ পথ দিয়া আমরা সহরে চলিলাম।

বৃন্দাবন স্থানটী ক্ষুদ্র, কিন্তু ইহাতে দেখিবার ও শিখিবার অনেক আছে। 'বৃন্দাবন' নামটিতেই শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত লীলার কথা জড়িত হইয়া রহিয়াছে। লীলা মনে পড়িলেই বৃন্দাবন মনে পড়ে, বৃন্দাবন মনে পড়িলেই লীলা মনে পড়ে। আর বৈষ্ণব ধর্ম্মে যে সকল মধুর ভাব আছে, অন্য কোথাও না

হউক, বৃন্দাবনে তাহাদের জলন্ত দৃষ্টান্ত দেখিতে পাইব, আমরা এইরূপ আশা করিয়া থাকি। আমরা মনে করি বৃন্দাবন প্রেম, ভক্তি ও আনন্দময়। কুটিলতা, নিরানন্দ সেখানে স্থান পায় না। কিয়ৎ পরিমাণে এ আশা আমাদের ফলবতী হইয়াছিল।

এখানে লোকে জীবহিংসা করে না। যে দিন হউক, আপনি দেখিবেন, যমুনার তীরে অসংখ্য কচ্ছপ দুটা চানার আশায় ঘাটে আসিয়া জমিয়াছে। আমরা কেশীঘাটের উত্তরে নৌসেতুর নিকটে, জলের ধারে চানা ছড়াইয়া দিলাম, কচ্ছপেরা দল বাঁধিয়া মৃত্তিকার উপর উঠিয়া, আমাদের নিকট চানা খাইতে লাগিল। আমাদিগকে দেখিয়া অণুমাত্র ভীত হইল না। মনুষ্যেরা যে হিংসাপ্রিয়, কচ্ছপ [illegible]রিয়া [illegible]কে, [illegible]হাদের [illegible] স[illegible] না[illegible] বাঙ্গালায় পুষ্করণীর মধ্যস্থলে কোন কচ্ছপ জলমধ্য হইতে গ্রীবা উত্তোলন করিলে, দূরে মনুষ্য দেখিয়াই ডুব দেয়। বাঙ্গালায় কচ্ছপ ধরিবার জন্য কত কৌশল করিতে হয়। নদী তীরে গর্ত্ত করিয়া তন্মধ্যে ব্যাধ লুক্কায়িত থাকে এবং তথা হইতে একটী সূত্র জল পর্য্যন্ত অলক্ষ্য ভাবে রাখিয়া দেয়। কচ্ছপ ঐ সূত্রস্থ ফাঁদে পড়িলে তাহাকে টানিয়া তুলিয়া ফেলে। আমাদের যদি কচ্ছপ ধরিবার ইচ্ছা থাকিত, সে দিন বিনা ফাঁদে অনেক কচ্ছপ ধরিতে পারিতাম।

বৃন্দাবনবাসী কোন পরিচিত ভদ্রলোক বলিলেন চড়াই পাখীরা বৃন্দাবনে অসঙ্কোচে গৃহমধ্যে আসে এবং রুটীর টুকরা লইয়া যায়। তাহারাও বৃন্দাবনে মনুষ্যের ক্রূর স্বভাবের পরিচয় পায় নাই। এমন দেখা গিয়াছে, কোন ব্রজবাসী, বাড়ীতে সর্প বাহির হইলে না মারিয়া দূরে ছাড়িয়া দিয়া গিয়াছেন।

বৃন্দাবনে অতি নীচ জাতীয় হিন্দুরাও মৎস্য মাংস স্পর্শ করে না। শুনিলাম সহরের বহির্ভাগে দুই এক ঘর মুসলমান বাস করেন, তাঁহারা আবশ্যক হইলে মথুরা হইতে মৎস্য মাংস লইয়া আসেন। একজন নাবিক আমাকে বলিয়াছিল, বৃন্দাবনে কেহ জালফেলা ব্যবসায় করে না। সময়ে সময়ে বৃন্দাবনে বানরেরা অতিশয় উপদ্রব করে। বানরকুল ধ্বংস করিবার চেষ্টাও হইয়াছিল, কিন্তু ব্রজবাসীরা ঐরূপ জীব হত্যার একান্ত বিরোধী হওয়ায় তাহা স্থগিদ হইয়াছে। গবর্ণমেণ্টও লোকের এই অহিংসা প্রবৃত্তি

পোষণ করেন। মথুরা হইতে বৃন্দাবন আসিবার পথে, একখণ্ড প্রস্তরে রাজাজ্ঞা খোদিত হইয়া রহিয়াছে। ইংরেজ সৈনিক পুরুষেরা বড় শীকার প্রিয়, সেই জন্য আজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে, যদি কোন সৈনিক পুরুষ বৃন্দাবন অথবা চতুঃপার্শ্বস্থ গ্রামে কোন পশু পক্ষী গুলি করিয়া মারেন, তিনি আইনানুসারে দণ্ডনীয় হইবেন*। শুনিলাম মথুরায় একজন মাজিষ্ট্রেট ছিলেন, সংসর্গ গুণে তাঁহার চিত্ত এতদূর পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল যে, তিনি মৎস্য মাংসাহার একেবারে ত্যাগ করিয়াছিলেন। একালে এরূপ হিংসা-বিরত স্থান আছে ভাবিতেও বিস্ময় হয়। মনে হয়, এই কারণে, বৃন্দাবন অপেক্ষা পুণ্য স্থান পৃথিবীতে আর নাই। বৃন্দাবন বড়ই আনন্দের স্থান। এখানে [illegible]র স[illegible]য়া কেরাণী বাবু আফিস্ যাইতেছেন, অন্নচিন্তার সেই ভয়ানক দৃশ্য দেখিতে হয় না†। মথুরা ব্রজমণ্ডলের রাজধানী, আফিসাদি সমস্তই সেইখানে। সাধারণত বৃন্দাবনে তিন শ্রেণীর লোক দেখিতে পাওয়াযায়। ব্রজবাসী, প্রবাসী ও যাত্রী। ব্রজবাসীরা চাকরী করেন না। দেশ

---

* স্বর্গীয় রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের চেষ্টায়, এই নিয়ম প্রচারিত হইয়াছে। নবজীবন সম্পাদক।

† লেখক ভক্তির চক্ষে শ্রীবৃন্দাবন ধাম সন্দর্শন ও সমালোচন করিয়াছেন, তাঁহার ভক্তিবাদের আংশিক প্রতিবাদও আপাত দৃষ্টিতে পাষণ্ডকৃতি বলিয়া প্রতীয়মান হইবে, ইহা জানিয়াও আমরা লেখকের বর্ণনার এক অংশের প্রতিবাদে প্রবৃত্ত হইলাম। ভক্তি সর্ব্বত্রই সৌন্দর্য্য সন্দর্শন করেন, প্রীতির অশ্রুপাত করেন। করুণা কোথাও কোথাও দেখিতে পান—দুঃখ, তিনি সেই স্থলেই ঘুরিয়া বেড়ান, আর দয়ার অশ্রুপাত করিতে থাকেন। দুই জনের এইরূপ বিভিন্ন প্রকৃতি হইলেও, তাঁহাদের মধ্যে কিছুমাত্র বিরোধ নাই; পরন্তু করুণা ভক্তির নিতান্ত অনুগতা দাসী। ভক্তিও করুণাকে সহচরী রূপে ভগিনী ভাবে গ্রহণ করেন। আমরা যখন শ্রীবৃন্দাবন ধাম দর্শন করি, তখন ভক্তি সহচরী করুণা আমাদিগকে যাহা দেখাইয়া ছিলেন, তাহা সেই সময়ে আমরা সংবাদ পত্রে বলিয়াছিলাম, এখনও বলিতেছি;—

"এখানে স্ত্রীলোকের ভাগই অধিক। তাহাদের বৃত্তির বন্দোবস্ত নাই, অন্ন কষ্ট বিলক্ষণ আছে। পাঁচ সের গোম ভাঙ্গিলে দুপয়সা পায়; কোন কোন সবল স্ত্রীলোক সমস্ত দিবসে রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত খাটিয়া দশ সের ভাঙ্গিতে পারে। মাসে ২৲ টাকা দিলে, কোন ছত্র হইতে ভোগ পায়। দাতার ইচ্ছার বিপরীতে এখানে ভোগ সচরাচর বিক্রীত হইয়া থাকে!

বিদেশ হইতে যাত্রী লইয়া আসেন, তাঁহাদিগকে বাসা দেন, ঠাকুর দর্শন করান এবং তজ্জন্য দক্ষিণা লয়েন। দক্ষিণা সম্বন্ধে বিশেষ জুলুম দেখিলাম না। তবে গয়ালীদের অনুকরণে ইহঁারাও 'সফল" দিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এবং তদুপলক্ষে দুটাকা আদায়ও করেন। সুতরাং ব্রজবাসীরা বেশ সুখে আছেন। প্রবাসীদিগকে দুই দলে বিভক্ত করা যাইতে পারে। এক দলের দেশ হইতে টাকা আসে, অপর দলে ভিক্ষা করেন। সেখানে ভিক্ষুকের তত লাঞ্ছনা নাই, এক টুকরা রুটী অনেক বাড়ীতে মিলে। অনেক অনাথা বৃদ্ধা স্ত্রীলোক একবারে কোন কুঞ্জে কিছু টাকা দিয়া রাখেন, সেইখানেই তাঁহারা

[illegible] নাই [illegible] এগুলির শীঘ্র প্রতিবিধান করা যাইতে পারে।" [১৮৭৭ সাল ১২ই জানুয়ারি, শ্রীধা[illegible] [illegible] সালের ২১শে জানুয়ারির সাধারণীতে ভ্রমণকারীর পত্রে প্রকাশিত।]

পূর্ব্বে যাহা সংক্ষেপে বলিয়াছিলাম, এখন তাহা বিস্তারে বলিতেছি।

আমি মধ্য ভারত, দাক্ষিণাত্য, উড়িষ্যা, অযোধ্যা প্রদেশ এবং খাস পঞ্জাব দেখি নাই, বঙ্গ, বেহার, উত্তর পশ্চিম, এবং রাজপুতানার অনেক গ্রাম নগর পল্লী দেখিয়াছি। অন্য কোন জনাকীর্ণ জনপদে বা লোক বিরল পল্লীতে, শ্রীবৃন্দাবনের মত প্রাত্যাহিক অন্ন কষ্ট আমি দেখি নাই। কেহ বা বৈষ্ণব ধর্ম্মের আন্তরিক আকর্ষণে, কেহ বা যৌবনের অপবিত্রতা প্রৌঢ় বয়সে ক্ষালনার্থ, নানা কারণে, শত শত দুঃখিনী বাঙ্গালিনী, দুই শত, এক শত টাকা লইয়া শ্রীবৃন্দাবনে বাস করিতে যায়। আছেও। কিন্তু তাহাদের অধিকাংশ পথের কাঙ্গালিনী। ভণ্ড আখড়াধারীরা তাহাদের সর্ব্বস্ব প্রথমে গচ্ছিত রাখিয়া পরে, অপহরণ করে। এ সকল কেবল শুনা কথা নহে। আমরা বৃন্দাবন ধামে তিন দিবসমাত্র বাস করিয়াছিলাম, তাহারই মধ্যে চুচঁড়ার দেপাড়ার ঐরূপ অবস্থাপন্ন দুইটি স্ত্রীলোক আমাদিগকে চিনিতে পারিয়া নিতান্ত কাতরভাবে, তাহাদের দুর্দ্দশার কথা আমাদিগকে বলে, আমরা মঠধারীকে নানাভাবে বলিয়া কহিয়া স্ত্রীলোকদের ন্যস্ত বস্তুর অধিকাংশ উদ্ধার করত তাঁহাদিগকে অধিকতর বিশ্বাস যোগ্য কুঞ্জে রাখিয়া দিয়াছিলাম। এই কার্য্যের জন্য কাজেই কিছু অনুসন্ধান করিতে হইয়াছিল, সেই অনুসন্ধানের ফলই বলিতেছি।

যে সকল অভাগিনী আখড়া ধারীদের বা অন্য কাহারও প্রতারণায় পথের কাঙ্গালিনী হয়, তাহাদের জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য শ্রীবৃন্দাবন ধামে দ্বিবিধ উপায় মাত্র আছে। (১) ঐ গোম ভাঙ্গা। (২) মাধুকরী বৃত্তি। লেখক বলিয়াছেন, "সেখানে (বৃন্দাবনে) ভিক্ষুকের তত লাঞ্ছনা নাই, এক

প্রসাদ পান, ভিক্ষা করিতে হয় না। প্রবাসীদের ঠাকুর দর্শন করা এবং ভজন সাধন করাই প্রধান কার্য্য। প্রত্যহ প্রাতে ও বৈকালে দেখিতে পাই-বেন, অসংখ্য নরনারী পরিক্রমণ অর্থাৎ দেব দর্শনে বহির্গত হইয়াছেন। তাঁহাদের হস্তে হরিনামের থলি, সর্ব্বাঙ্গে তিলক এবং গাত্রে লুই অথবা মোটা চাদর। প্রবাসীদের মধ্যে বাঙ্গালী স্ত্রীলোক অনেক। যাত্রীরা কিছুদিন থাকে, আনন্দ করে, দেশে ফিরিয়া যায়।

ব্রজবাসীদের আনন্দের অভাব নাই। হোলির পূর্ব্ব কয়েক দিন দেখি-লাম, ব্রজবাসীরা দলে দলে সং সাজিয়া বাহির হইয়াছেন। একজন পাদ্রী সাহেব সাজিয়া সঙ্গীসহ ধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন। অপরে বিবিধ বেশ ভূষা

[illegible]

জীবন ধারণ জন্য এইরূপ রুটিকা খণ্ড সংগ্রহ অপেক্ষা আর অধিক লাঞ্ছনা হইতে পারে না। যে রুটীর অন্তত চারি খানা না খাইলে একরূপ ক্ষুন্নিবৃত্তি হয় না, সেই রুটি খানাকে ৩০।৪০ টুকরা করা হয়, এবং তাহাই ভিক্ষা দেওয়া হয়। সুতরাং অন্তত দেড় শত কুঞ্জ ভ্রমণ না করিলে, আর জীবন ধারণের উপযোগী আহার্য্য সঞ্চয় হয় না। তাহাও কিছু নিকটানিকটি বাড়ীতে ঘুরিলে মিলিবে না। ১নম্বর কুঞ্জ হইতে ভিক্ষুক রুটী টুকরা লইল; দেখিল, ২।৩।৪ নম্বরে ভিক্ষুকের মহা ভীড়; তাহাদের সকলের পশ্চাতে লইতে গেলে সময় থাকে না। কাজেই তাহাকে ৫নং কুঞ্জে যাইতে হইল। এইরূপে দেড় শত কুঞ্জে ভিক্ষার জন্য সহস্র কুঞ্জের পথ পরিক্রমণ করিতে হইবে; তবেই সমস্ত বৃন্দাবন পরিক্রম অর্থাৎ ৫।৬ ক্রোশ পথ পর্য্যটন করিতে হইবে। দুর্ব্বল বাঙ্গালিনীদের পক্ষে প্রত্যহ এই রূপ লাঞ্ছনা কি ভয়ঙ্কর, এখন মনে করুন। আমি বঙ্গদেশের অতি প্রসিদ্ধ দানশীলা মহারাণীর কুঞ্জে অবস্থান করিয়া প্রত্যহ অন্তত দুই শত কাঙ্গালিনীকে অন্ন কষ্টে কাঁদিতে দেখিয়াছি। এই দারুণ দারিদ্রের আংশিক প্রতীকার করণোদ্দেশে তাঁহার তাৎকালিক প্রধান কর্ম্মচারীকে সেই সময়েই জানাইয়াছিলাম। কোন প্রতীকার হয় নাই।

এক্ষণে ভক্তিমান্ ভাগবতবৃন্দ ভক্তি সহচরী করুণার কাতর কণ্ঠরব শুনিয়া শ্রীধামের এই দারুণ দারিদ্রের প্রতীকারার্থ একটু চেষ্টা করিলেই অনেক সুবিধা হইতে পারে; প্রথম কার্য্য—প্রসাদ বিক্রয় বন্দ করা। নতুবা এখন যেরূপ দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে অন্ন কষ্টের প্রপীড়নে ও প্রসারণে ভক্তির প্রধান পাট টলমল করিতেছে; রসেশ্বরের রাসমণ্ডল ক্ষুধাতুরের উষ্ণ অশ্রুপাতে এবং অস্ফুট হাহাধ্বনিতে—সম্পূর্ণ বিভীষিকাময়! হরি হে তোমার ইচ্ছা!

নবজীবন সম্পাদক।

করিয়া দল বাঁধিয়া নৃত্য গীত করিয়া বেড়াইতেছেন। সকলেই যেন সদানন্দ; হোলির দিন ব্রজবাসীদের আনন্দের সীমা নাই। প্রতি গৃহস্থ বাড়ীতেই, স্ত্রীলোকেরা নৃত্য গীত করিতেছে, তাঁহাদের মধুর কণ্ঠধ্বনি দূর হইতে শুনা যাইতেছে। লাল ফাকে পথ লাল হইয়া গিয়াছে, কোন পথিকেরই অব্যাহতি নাই। শুনিলাম এই উপলক্ষে অনেক কুরীতি প্রচলিত আছে, সৌভাগ্য ক্রমে কিছুই আমাদের চক্ষে পড়ে নাই।

হোলির সময় শেঠেদের মেলা হয়। এই সময় বৃন্দাবনের বাৎসরিক মেলাও হয়। অনেক লোকে আসিয়া থাকে। প্রত্যহ প্রাতে ও রাত্রে শেঠেদের ঠাকুর রঙ্গলাল জীউ মন্দির হইতে শেঠেদের উদ্যানে মহাসমারোহে [illegible] এ[illegible] [illegible]হ. নৃ[illegible] যানে গমন করেন। কয়েক দিন রাত্রে অনেক টাকার বাজীও পুড়িয়া থাকে। বৃন্দাবনে ঝুলনেই সর্ব্বাপেক্ষা আমোদ হয়।

বৃন্দাবন বড় আনন্দের স্থান, সেখানে জীবহিংসা নাই, ইহাতে মনে করিবেন না, বৃন্দাবনে কোন পাপ নাই। ততদূর আত্মসংযমের ক্ষমতা মনুষ্যের আর নাই। অধিকন্তু বৃন্দাবনের ব্যভিচারের কথা শুনিলে সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠে। কিন্তু এত সুন্দর জিনিষ থাকিতে আমাদের পাপের দিকে দৃষ্টি করার আবশ্যক কি? একটী বাঙ্গালী যুবকের সহিত আমাদের আলাপ হইয়াছিল, তিনি বৃন্দাবনের পাপের খবর অনেক রাখেন, কিন্তু বৃন্দাবনের একটীও সৌন্দর্য্য তিনি দেখিতে পান নাই; মনুষ্যের রুচি বিভিন্ন।

কিছুদিন পশ্চিমে ভ্রমণ করিলেই সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে বোধ হয় আমাদের একটু মতান্তর উপস্থিত হয়। পশ্চিমে পুরুষদের লম্বাকৃতি, প্রশস্ত বক্ষঃস্থল এবং তেজোসম্পন্ন মুখশ্রী দেখিলে, তাঁহাদিগকে যেন বল বীর্য্যের আধার বলিয়া মনে হয়। পুরুষের মুখশ্রীতে মধুরতার সহিত তেজোভাবের যোগ না হইলে, যে যথার্থ সুন্দর দেখায় না, এই সকল স্থান ভ্রমণে আমাদের তাহা উপলব্ধি হয়। বাঙ্গালার কোন সুন্দর পুরুষের মুখশ্রীতে যেন কেবলই মধুরতা; মধুরতায় যেন তাঁহার পুরুষত্বের লোপ করিয়াছে। আর পশ্চিমে স্ত্রীলোকের মুখশ্রীতে কেমন কোমলতার সহিত দৃঢ়তা মিশিয়াছে। প্রস্ফুটিত পদ্মটী কোমলতার আদর্শ। কোমলতা মধুরতা ভিন্ন তাহাতে আর কিছুই নাই। আর কিছুই

থাকিবার আবশ্যকও নাই। কারণ সেটী পুষ্প, পুষ্পটী যথার্থই সুন্দর। কিন্তু মনুষ্যের রক্ত মাংসের শরীর, কেবল কোমলতা থাকিলে সুন্দর দেখাইবে কেন? রক্তমাংসে বল উৎপন্ন করে, মনুষ্য শরীরে বলেরও চিহ্ন চাই। স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষ বলীয়ান্, পুরুষের শ্রীতে বল অথবা তেজের স্ফূর্ত্তি পাওয়া আবশ্যক। স্ত্রী, পুরুষ অপেক্ষা হীন বল, কিন্তু পুষ্প নহে। স্ত্রী শরীরেও কিছু দৃঢ়তার পরিচয় আবশ্যক। সেই জন্য কৃশাঙ্গিনীকে আমাদের তত ভাল লাগে না। বাঙ্গালার স্ত্রীলোকদিগের কোমলতা অতিশয় হওয়াতে, যেন দোষে পরিণত হইয়াছে। বৃন্দাবনে পুরুষেরা যে সুন্দর, একথা বলিতে পারি না, কিন্তু তাঁহাদের অনেকেই বলিষ্ঠ। ব্রজমায়ীরা গৌরাঙ্গী, স্থূলাঙ্গী ও লাবণ্যময়ী। তাঁহাদের [illegible], হাতে [illegible], পরিধানে কোর্ত্তা ও ঘাঘরী, তদুপরি একখানি ওড়না বদনমণ্ডল ও গাত্র আবরণ করিয়া রহিয়াছে। আমাদের দেশে যদিও কোর্ত্তা প্রচলিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে, কিন্তু তাহা 'বডি' রূপে পরিণত হইয়া বিলাস সামগ্রী হইয়াছেমাত্র। যতদিন কোর্ত্তা অবশ্য পরিধেয় মধ্যে পরিগণিত না হইবে, ততদিন এইরূপ অপব্যবহার হইবারই সম্ভাবনা। ঐ বেশে ব্রজমায়ীদিগকে মন্দ দেখায় না, কিন্তু এত পোষাকের বোঝা বহন করিতে বাঙ্গালী স্ত্রীলোকেরা অক্ষম। ব্রজমায়ীদিগকে দুই তিনটী জলপূর্ণ কলস মস্তকে করিয়া যাইতে দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। পদতলে নূপুর বাজিতেছে, তাঁহারা স্থির মস্তকে কোন দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া, ওড়নায় মস্তক আবৃত করিয়া গম্ভীরভাবে চলিয়া যাইতেছেন। ভার-জনিত ক্লেশের কোন লক্ষণই নাই।

শুনিলাম নববধূরা শাশুড়ী ঠাকুরাণীর সম্মুখেও নৃত্যগীত করিতে লজ্জা বোধ করেন না, কিন্তু গুরু জনের সমক্ষে বদন অনাবৃত করিতে ও আহার করিতে তাঁহাদের বিশেষ আপত্তি। ইংরেজেরা যেরূপই ভাবুন, স্ত্রীলোক-দিগকে গুরু জনের সম্মুখে আহার করিতে দেখিলে আমাদের চক্ষুঃশূল হয়। স্ত্রীসুলভ নম্রতার বিরোধী কার্য্য বলিয়া মনে হয়। হোলির দিবস অনেক স্ত্রীলোককে দল বাঁধিয়া ফাক্ ছড়াইয়া রাজপথে গান করিয়া বেড়াইতে দেখিলাম। দুই একটী প্রাচীনা ভিন্ন সকলেরই মুখ অবগুণ্ঠন দ্বারা আবৃত। একদিন মথুরায় কতকগুলি স্ত্রীলোক শস্যের বোঝা মাথায় করিয়া, সন্ধ্যাকালে

ঠিক গোধূলি লগ্নে মাঠ হইতে ফিরিয়া আসিতেছিল, তাহারা মনের আনন্দে মধুর স্বরে গান ধরিয়াছিল। একে সন্ধ্যাকাল, তাহাতে এই অভিনব দৃশ্য। আমাদের মনেও আনন্দের উচ্ছ্বাস উঠিল। গানটী কি বুঝিতে পারিলাম না, কিন্তু সে স্বর এখনও আমাদের কার্ণে প্রতিধ্বনিত হইতেছে।

আর এক কারণে নব্য বৃন্দাবন অতি মনোহর হইয়াছে। ইহাকে প্রাসাদ পুরী বলা যাইতে পারে। যত হিন্দু রাজা আছেন, প্রায় সকলেই বৃন্দাবনে একটী কুঞ্জ অথবা মঠ স্থাপনা করিয়াছেন। সেখানে প্রত্যহ ঠাকুরের সেবা হয় এবং অতিথি অভ্যাগতেরা প্রসাদ পায়। রাজারা কেহই মঠ নির্ম্মাণ সম্বন্ধে সাধ্যানুসারে ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হয়েন নাই এবং দৈনিক সেবারও যথোপযুক্ত বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছেন। বৃন্দাবন রাজা মহারাজাদের কীর্ত্তি স্থান।

বৃন্দাবনের পথগুলি পাথরের। কলিকাতায় যেরূপ কুচা পাথর দিয়া পথ বাঁধান হয়, সেখানেও তাহাই, কিন্তু গাড়ী ঘোড়া বেশী না থাকায় এত কাদা হয় না। ২।১টী পথ পাথরের ইট দিয়া বাঁধান। বৃন্দাবনে মিউনিসিপালিটী আছে, কিন্তু শুনিলাম গৃহস্থকে মিউনিসিপাল টেক্স দিতে হয় না। আমদানি দ্রব্যজাত কর হইতে মিউনিসিপালিটীর খরচ চলে। বাঙ্গালার ন্যায় বৃন্দাবনে খড়ের চাল নাই। দরিদ্র লোকেরা মৃত্তিকার প্রাচীর দিয়া, তাহার উপর কাষ্ঠ বিছাইয়া, মৃত্তিকার ছাদ তৈয়ার করিয়া ঘর করিয়াছে। মাটীর ঘরের সংখ্যা বৃন্দাবনে অতি অল্প। সহরের ভিতরে আদৌ নাই।

আপনি যদিও তীর্থযাত্রী না হয়েন, একবার বৃন্দাবনে যাইলে আপনার দর্শনস্পৃহা অনেকটা তৃপ্ত হইবে। আমরা বাঙ্গালী, সামান্য গৃহে বাস করি, আমাদের পক্ষে সে মঠগুলি যে কি অপূর্ব্ব সামগ্রী তাহা আর কি বলিব? আপনি যে রাস্তায় যাইবেন, কোন মহারাজার একটী কুঞ্জ দেখিতে পাইবেন। সম্মুখেই উচ্চ দরজা। দরজার উপরেই নহবৎখানা। নহবৎখানাগুলি সমস্তই এক রকমের। যেন তিনখানি প্রকাণ্ড চতুর্দ্দোল পাশাপাশি সাজান রহিয়াছে। দরজার নিম্নদেশ হইতে, নহবৎখানার উপর পর্য্যন্ত কারুকার্য্যে পরিপূর্ণ। ভাস্কর বুঝি দেব সেবার জন্য তাঁহার সমস্ত বিদ্যা বুদ্ধি খরচ করিয়াছেন। কোথাও ফুলগুলি ফুটিয়াছে, পুষ্প পত্রগুলি গণনা করা যাইতেছে। কোথাও

ফুলগুলি অর্দ্ধ বিকশিত হইয়া আপন ভরে নিম্ন মুখ হইয়া রহিয়াছে। দরজা দিয়া প্রবেশ করিয়াই প্রস্তর দিয়া বাঁধান প্রাঙ্গণ। তাহার চতুর্দ্দিকে ঘর। কোন কুঞ্জের প্রাঙ্গনে নাটমন্দিরও আছে। তাহার সম্মুখেই ঠাকুরঘর। সমস্তই কারুকার্য্য মণ্ডিত। একটী কুঞ্জে কাল ও সাদা প্রস্তরের কয়েকটী ক্ষুদ্র হস্তী ও মুরদ দেখিয়া পরিতৃপ্ত হইলাম। গোয়ালিয়রের মহারাজা তাঁহার গুরুজীর নিমিত্ত একটী কুঞ্জ করিয়া দিয়াছেন, সেটীও অতি সুন্দর।

শেঠেদের মঠ সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। শেঠেদের মথুরায় বাস; ইঁহাদের অতুল ঐশ্বর্য্য। গুরুর উপদেশানুসারে এই মঠ প্রস্তুত করিয়াছেন। মঠে রঙ্গলাল জীউর সেবা আছে। মঠে প্রবেশ করিতে চারিটা দরজা। পূর্ব্ব মুখ হইয়া প্রথম দরজায় প্রবেশ করিতে হইলে বামদিকে একটী রথ রহিয়াছে দেখিতে পাইবেন। প্রথম দরজার উপরে নহবৎখানা নাই। ফটক দিয়া প্রবেশ করিলেই দুই পার্শ্বে অনেক গুলি ঘর দেখিবেন। দ্বিতীয় ফটকটী অতিশয় উচ্চ, উপরের নহবৎখানাটিও বিচিত্র। তাহার পর তৃতীয় ফটক। ইহার উপর নহবৎখানা নাই। রথের চূড়ার ন্যায় একটী অতি উচ্চ চূড়া, দেখিলে বৌদ্ধ কারখানা বলিয়া ভ্রম হয়; ইহাকে পাগোদা বলে। তৃতীয় ফটকের সম্মুখেই চতুর্থ দরজা, ইহার চূড়াও তৃতীয় দরজার ন্যায়। তৃতীয় দরজা পার হইয়া আপনি চারিদিকে প্রদক্ষিণ করিতে পারেন। দেখিবেন দুই পার্শ্বেই প্রাচীর, একটী বাহিরের প্রাচীর, অপরটী চতুর্থ দরজার সহিত সংলগ্ন ভিতরের প্রাচীর। এই প্রাচীর দ্বারা ঠাকুর বাড়ীকে বহির্বাটীর সহিত পৃথক্ করা হইয়াছে। মন্দিরের পূর্ব্বদিকে, এই দুই প্রাচীরের মধ্যে, একটী প্রস্তর-দ্বারা-বাঁধান পুষ্করণী ও একটী বাগান আছে। বোধ হয় রাসের সময় রঙ্গলাল জীউর এই পুষ্করিণীতে নৌকা বিহার হইয়া থাকে। পশ্চিম মুখ হইয়া ঠাকুর বাড়ীতে প্রবেশ করিলেই সম্মুখে সুবর্ণস্তম্ভ দেখিতে পাইবেন। স্তম্ভটী মন্দিরের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে, দেড়তালা সমান উচ্চ হইবে। একটী তাল গাছের ন্যায় মোটা। ভিতরে কাঠ, উপরে স্বর্ণের পাত দ্বারা মণ্ডিত। লোকে ইহাকে সোণার তালগাছ বলে। স্তম্ভটীতে অনেক টাকার সোণা লাগিয়াছে। স্তম্ভের সম্মুখেই নাটমন্দির এবং তাহার সহিত সংলগ্ন রঙ্গলাল জীউর মন্দির। শেঠজীর মঠ প্রস্তুত করিতে বোধ হয় একটী গোটা পাহাড়

লাগিয়াছে। বাহির হইতে এই মঠের চূড়াগুলি ও সুবর্ণস্তম্ভ দেখিতে অতি সুন্দর। শেঠেদের মন্দিরের নিকটেই লালাবাবুর মন্দির। মন্দিরের চূড়াটী অতি উচ্চ। মন্দিরস্থ বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণজী ৩। ৪ বৎসরের শিশুর ন্যায় উচ্চ হইবেন। এখানে সেবার উত্তম বন্দোবস্ত আছে। মন্দিরটী যমুনা পুলিনের সন্নিকট।

নূতনের মধ্যে আর দেখিবার উপযুক্ত 'সা'জীর মন্দির। দরজাটী অতি উচ্চ এবং নূতন ধরণের। এই মন্দিরের অভ্যন্তর অতি সুন্দর শ্বেত ও কাল মর্ম্মর প্রস্তর দ্বারা বাঁধান। থামগুলি শ্বেত মর্ম্মর প্রস্তরের, স্ক্রুর ন্যায় বক্রাকৃতি হইয়া উর্দ্ধে উঠিয়াছে। মন্দিরের দেয়ালে কয়েকটী মূর্ত্তি আছে। প্রথম দেখিলেই মনে হয়, মূর্ত্তিগুলি চিত্রিত, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে, কাল এবং অন্যান্য বর্ণের প্রস্তর সন্নিবেশিত করিয়া এই সকল মূর্ত্তি অঙ্কিত হইয়াছে। বর্ত্তমান সাজী লক্ষ্ণৌয়ের বড়ই একজন ধনী মহাজন।

পুরাতনের মধ্যে মদনমোহনের পুরাতন মন্দির এবং গোবিন্দজীর লাল মন্দির বিশেষ দ্রষ্টব্য। মদনমোহনের মন্দির সহরের দক্ষিণ পশ্চিম প্রান্তে, যমুনার সন্নিকট। শুনিলাম একজন বণিক, তাঁহার মানস পূর্ণ হওয়ায় এই মন্দিরটী প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন। মন্দিরটী লাল প্রস্তরের, দেখিতে অনেকটা বৌদ্ধ ধরণের। চূড়াটী উচ্চ, কিন্তু মধ্যভাগ স্ফীত নহে এবং অগ্রভাগ চ্যাপটা। মন্দিরটী একটী অতি উচ্চ স্থানে অবস্থিত। এক্ষণে ইহার ভগ্ন দশা। পার্শ্বস্থ একটী নূতন মন্দিরে এক্ষণে মদনমোহন জীউ আছেন।

গোবিন্দজীর লাল মন্দির, জয়পুরের রাজা মানসিংহ প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন। কাশীর মানমন্দিরও এই রাজার কীর্ত্তি। ইহার চূড়া এত উচ্চ ছিল, যে আগ্রার তাজমহল হইতে দেখা যাইত। দিল্লীর সম্রাট বাহাদুর এই অপরাধে চূড়াটী ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন এবং শুনিলাম অত্যাচারের চূড়ান্তও করিয়াছিলেন। মন্দিরের উপরে গোহত্যা করা হইয়াছিল, এবং একটী মুসলমানকে গোর দিয়া রাখা হইয়াছিল। মুসলমানেরা এইরূপ দৌরাত্ম্য করায় গোবিন্দজীকে মহারাজা জয়পুর লইয়া গিয়াছিলেন। সে চূড়াটী আর কেহই প্রস্তুত করিয়া দেন নাই। মধ্যে মন্দিরের বড়ই জীর্ণদশা হইয়াছিল, গবর্ণমেণ্ট নিজ ব্যয়ে অনেক মেরামত করিয়া দিয়াছেন। বর্ত্তমান মন্দিরটী চারিতালা, আমরা সর্ব্বোপরি উঠিয়াছিলাম। ছাদ হইতে মথুরা

দেখা যায়। মন্দিরের মধ্যস্থলে একটী লম্বা হল, তাহার এক প্রান্তে ঠাকুর ঘর এবং অন্য তিন দিকে তিনটী বারান্দা বাহির হইয়াছে। সমস্তই লাল প্রস্তরের। চূড়াটী হলের উপর হইতে উঠিয়াছিল বোধ হয়। দেখিতে অতীব সুন্দর। সেরূপ ধরণের মন্দির আর কোথাও দেখি নাই। নিকটস্থ একটী মন্দিরে এক্ষণে বৃন্দাবনের গোবিন্দজী আছেন। হোলির সময় দর্শন করিলাম। আমার যথার্থ ভক্তি হইল। এত রূপ আমি কখন দেখি নাই!

একদিন আমরা জয়পুরের রাজার নূতন মন্দির দেখিতে গিয়াছিলাম। ভরতপুরের পাহাড় হইতে বিস্তর লাল পাথর আনয়ন করা হইয়াছে। অনেক ভাস্কর খাটিতেছে। আমরা অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম, যাহারা সূক্ষ্ম ভাস্কর কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছে, তাহাদের অধিকাংশই মুসলমান এবং বাস আগ্রার নিকটে। আগ্রা, জয়পুর, ভরতপুর ও দিল্লীতে যেরূপ ভাস্কর পাওয়া যায়, এরূপ আর কুত্রাপি মেলে না। এখনও একতালা সম্পূর্ণ হয় নাই, ইতিমধ্যে কয়েক লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে।

বৃন্দাবনের অধিকাংশ বাড়ী প্রস্তর নির্ম্মিত। এদেশের লোকের সক আছে। সামান্য দরজাতেও দেখিবেন, পাথরের উপর কত লতাপাতা কাটা। লতা পাতাগুলি অতি পরিষ্কার।

যমুনা বৃন্দাবনের পশ্চিম, উত্তর ও পূর্ব্ব দিক বেষ্টন করিয়া মথুরাভিমুখে চলিয়াছে। যমুনা প্রশস্ত অধিক নহে, কিন্তু গভীর। যমুনার উপর অনেক ঘাট বাঁধা আছে, এক ঘাট হইতে অন্য ঘাটে যাইবার পথ আছে, সুতরাং ঘাটে ঘাটে বৃন্দাবনের পশ্চিমদিকস্থ সমস্ত যমুনাকূলই ভ্রমণ করা যায়। আমরা একদিন রাত্রে যমুনা কূলে গিয়াছিলাম। রাত্রি জ্যোৎস্নাময়ী। প্রস্তর নির্ম্মিত সোপান শ্রেণী জলমধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। প্রতি সোপান শ্রেণীর দুই পার্শ্বে দুইটী উচ্চ অলিন্দা। প্রতি অলিন্দার উপর থাম বিশিষ্ট একটী বিশ্রাম স্থান। সোপানের দুই পার্শ্বে আলিন্দার গায়, সাধু সন্ন্যাসী-দের বসিবার স্থান, তাহাও ভাস্করদিগের গুণপণার পরিচয় দিতেছে। ঘাটের উপর এক একটী বৃক্ষ। বৃক্ষ পত্রের মধ্য দিয়া চন্দ্রালোক সোপানে ও চতুঃপার্শ্বে শতধা বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। যমুনাস্রোত আলিন্দায় বাধা প্রাপ্ত হইয়া বর্দ্ধিত বেগে শব্দ করিয়া বহিয়া যাইতেছে। অধিকাংশই এইরূপ।

মদন-মোহনের পুরাতন মন্দিরের কিঞ্চিৎ উত্তর হইতে কেশীঘাট ঘাট পর্য্যন্ত এইরূপ বাঁধা ঘাট চলিয়া গিয়াছে। কিঞ্চিদধিক একপোয়া পথ হইবে। মধ্যে মধ্যে এক একটী বৃহৎ অট্টালিকা ব্যবধান আছে। কোনটী দ্বিতল, কোনটী ত্রিতল, কোনটী চৌতল। নিম্নতলের ভিত্তি জলমধ্যে প্রোথিত। চৈত্র মাসেও দেখিলাম ভিত্তির অধিকাংশ যমুনা গর্ভে নিমগ্ন রহিয়াছে। বোধ হইতেছে যেন বাড়ীগুলি জলমধ্য হইতেই উঠিয়াছে। অট্টালিকাগুলি হিন্দু রাজাদিগের বৃন্দাবনের বাসস্থান। উচ্চ দ্বিতল, ত্রিতল, চতুর্থতল হইতে ঠিক জলের উপর বারান্দা বাহির হইয়াছে। সেই বারান্দায় বসিয়া রাজপুরুষগণ সান্ধ্য সমীরণ সেবন ও যমুনা মায়ীর শোভা সন্দর্শন করেন। পশ্চিমে হিন্দুরা যমুনাকে অতি পবিত্র জ্ঞান করেন। যমুনা স্নান তাঁহাদের অতি পুণ্য কার্য্য। রাজমহিষীদের স্নানের জন্য সোপান শ্রেণী অন্দর হইতে যমুনা গর্ভে অবতরণ করিয়াছে। পাছে নৌকাযাত্রীরা সেই অর্যস্যুম্পশ্যা রমণীদের প্রতি দৃষ্টিপাত করে, এই ভয়ে, সছিদ্র প্রস্তর ফলকের দ্বারা একটী অন্দরের ঘাট ঢাকিয়া দেওয়া হইয়াছে, দেখিলাম। সেই ছিদ্র দিয়া যমুনাবারি ভিতরে প্রবেশ করে, সেইখানে তাঁহারা স্নান করেন। এইরূপে সমস্ত ঘাট বেড়াইয়া আমরা কেশী ঘাটের অলিন্দার উপর বসিলাম।

স্থান বৃন্দাবন, তাহাতে কত স্বাভাবিক ও কৃত্রিম সৌন্দর্য্যের সমাবেশ হইয়াছে দেখুন। নিম্নে যমুনা, উপরে লছমী রাণীর প্রাসাদ, সম্মুখে ঘাটের পর ঘাট চলিয়া গিয়াছে। চন্দ্রের জ্যোৎস্না পড়িয়া সকলই যেন সুন্দর হইতে সুন্দরতম দেখাইতেছে। আমরা পুষ্করিণীতে দুই একটী বাঁধা ঘাট দেখিতে পাই, নদীতে বাঁধা ঘাট নাই বলিলেও দোষ হয় না। একটী বৃহৎ অট্টালিকা দেখিলে, আমাদের মনে হয় কতকগুলি টাকা অপব্যয় করা হইয়াছে। এক্ষণে আমার সে ভ্রম ঘুচিল। যে অতুল আনন্দ অনুভব করিলাম, তাহাতে মনে হইল যদি সহস্র মুদ্রা খরচ করিয়াও আসিয়া থাকি, সমস্তই সার্থক হইয়াছে। কোন ইংরেজ দার্শনিক বলিয়াছেন যে পূর্ব্বস্মৃতিই সৌন্দর্য্যের কারণ। কোন বস্তু দেখিলে যদি আমাদের কোন মনোরম ভাব বা প্রিয় কথা মনে পড়ে, সেই বস্তুকেই আমরা সুন্দর বলি। সে মুহূর্ত্তে আমার চতুর্দ্দিকে কত যে মনোহর ভাব উদ্দীপক পদার্থ ছিল, বলিতে পারি না।

প্রথমত লছমী রাণী। 'রাজা' 'রাণী' এই দুইটী কথার সহিত আমাদের কত মনোহর ভাব জড়িত রহিয়াছে। বাল্যকাল হইতে আমরা কত রাজা রাণীর গল্প শুনিয়া আসিতেছি। মনুষ্য শরীরে যাহা কিছু সুন্দর, সমস্তই আমরা রাজা রাণীতে দেখিতে পাইব, আশা করি। ঐশ্বর্য্য সম্পদে যাহা কিছু মহত্ত্ব উৎপন্ন করে, সমস্ত রাজা রাণীতেই সম্ভবে। সেই জন্য রাজারা নরদেবতা। তাহার পর কত রাজা রাণীর কথা ইতিহাসে পড়িয়াছি, সেগুলি মনে পড়িল। যুধিষ্ঠির রাজা হইয়া রাজসূয় যজ্ঞ করিয়াছিলেন, দ্বার ভ্রমে দুর্য্যোধনের মস্তক দর্পণে আহত হইয়াছিল, তাহাও মনে পড়িল। তাঁহারা কত বড় রাজা ছিলেন, তাঁহাদের প্রাসাদই বা কি অপরূপ ছিল! তাঁহারা এক্ষণে কোথায় গিয়াছেন, সে প্রাসাদগুলিই বা কোথায়! ভাবিয়া মন বড় চিন্তিত হইয়া পড়িল।

তাহার পর লছমী রাণীর প্রাসাদ। প্রাসাদটী যত উচ্চ,প্রশস্তও তদনুরূপ। যেন কোন মহাবীর যমুনা তীরে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। গাম্ভীর্য্যের কি সুন্দর উদাহরণ স্থল। আবার চন্দ্র কিরণ পড়িয়া প্রাসাদটী কি মনোহর দেখাইতেছে। গাম্ভীর্য্যের সহিত মধুরতা মিশিয়াছে। রাজা রাণীর উপযুক্ত প্রাসাদই বটে।

নদীকূলে ঐরূপ সোপান শ্রেণী দেখিলে আমাদের একটী আনন্দের কারণ হয়। উহাতে প্রকৃতির উপর মনুষ্যের প্রভুত্ব জ্ঞাপন করিতেছে। যে নদীস্রোত কত বড় বড় রাজ্য, নগর, জীব গ্রাস করিয়াছে, তাহাতে নামিবার জন্য মনুষ্য মহা গর্ব্বে এই উপায় করিয়া রাখিয়াছে, ইহাতে আনন্দ হইতেই পারে। আর এ সোপানগুলিই বা কি অপূর্ব্ব, দুই পার্শ্বে অলিন্দ, উপরে সুন্দর বসিবার স্থান। যমুনা বৃথা রোষভরে সোপানে আস্ফালন করিয়া বহিয়া যাইতেছেন। মনুষ্যের বাহাদুরী বটে আমাদের সোপান! দেখিয়াই পুষ্করণী মনে হইল। পুষ্করিণীতে পদ্ম ফুটে। জলের উপর পত্র বিছাইয়া ঊর্দ্ধ মুখে পদ্মগুলি ফুটিয়া থাকে। মধ্যে মধ্যে মৃদু বাতাস কাণে কাণে কি বলিতে থাকে, পদ্মেরা অঙ্গ দোলাইয়া কত রঙ্গ করে। সে দৃশ্যটী মনে পড়িল। আর মস্তকোপরি চন্দ্র শোভা পাইতেছেন। পদ্মের অপেক্ষা তাঁহার ছবি আরও সুন্দর, পদ্মের মধু অপেক্ষা তাঁহার কিরণ আরও

সুমিষ্ট। আবার সম্মুখে ঐ ঘাটে রাজমহিষীরা স্নান করেন। তখন মনে হইল যেন কোন সরোবরে বিবিধ পদ্ম ফুটিয়া রহিয়াছে, তাহার অপূর্ব্ব সোপানে রাজমহিষীরা অবতরণ করিয়াছেন, চন্দ্র অনিমিক লোচনে তাকাইয়া রহিয়াছেন এবং অনবরত অমৃত বর্ষণ করিতেছেন। সে শোভা ভাবিয়া মন আনন্দে আপ্লুত হইল।

নিম্নে যমুনা। যদি সেখানে কেবল যমুনা থাকিত, ভাবের কোন অভাব হইত না। ইহার প্রত্যেক তরঙ্গ এক একটী প্রলয় উপস্থিত করিতে পারে। এই যে কুল্ কুল্ শব্দ, ইহা কি শ্রীকৃষ্ণের বংশীর অনুকরণ? ঐ যে সম্মুখে কদম্ব বৃক্ষযুক্ত ঘাট, ঐ স্থানে তিনি কি গোপীদিগের বস্ত্র হরণ করিয়াছিলেন? দূরে যে কালিন্দী ঘাট, ওখানে কি হইয়াছিল? হরি হরি! আমি কোথায় বসিয়া রহিয়াছি?

এইরূপ আত্মহারা হইয়া আমি কত কথা ভাবিতেছিলাম। সঙ্গীগণ ডাকিলেন, আমি জাগরূক হইয়া, বাসায় ফিরিয়া আসিলাম।

সৌন্দর্য্য ও প্রেম।

যাহা প্রকৃত সুন্দর তাহা সকলের চক্ষেই সুন্দর। তবে যে "রূপ চক্ষে" কথাটা একেবারে অসঙ্গত, তাহাও বলিতেছি না, স্থান বিশেষে ও ব্যক্তি বিশেষে বরং উহাই প্রযুজ্য। কিন্তু ঐ সৌন্দর্য্য প্রকৃত সৌন্দর্য্য পদবাচ্য নহে; ইহা অতি সঙ্কীর্ণ এবং ইহার স্থায়িত্বকালও অতি অল্প। সহজ কথায়, ইহাকে 'রূপ' না বলিয়া 'রূপজ মোহ' বলিলেই সমস্ত গোলযোগ মিটিয়া যায়। কথাটা আরও একটু পরিষ্কার করা যাইতেছে।

প্রধানত স্ত্রী পুরুষের মধ্যেই ঐ কথাটা ব্যবহৃত হইয়াছে। একজন আর একজনের রূপে মোহিত হইল, তাহাকে দেখিয়া প্রাণ আকৃষ্ট হইল, অথচ তোমার আমার জগৎ-সাধারণের চক্ষে সে কিছুই নহে—বরং কুৎসিত মাত্র। ইহাতে কি বুঝা গেল?—বুঝা গেল এই যে, সে তাহার শিক্ষা,

রুচি ও হৃদয়ের ভাব অনুসারে তাহার রূপে মুগ্ধ হইয়াছে, বা তাহার একটি বিশেষ গুণ দেখিয়া তাহাতে আকৃষ্ট হইয়াছে। কিন্তু এ সৌন্দর্য্যে উদারত্ব ও সার্ব্বভৌমিকত্ব ভাব কিছুই নাই—ইহা অতি সঙ্কীর্ণ, অনুদার ও ক্ষণস্থায়ী। ব্যক্তি বিশেষ, জাতি বিশেষ বা স্থান বিশেষের যে সৌন্দর্য্য সাধারণ নিয়মে খাটে না—প্রকৃতির আদর্শস্থানীয়ও হইতে পারে না। কোন রূপ বিশেষত্ব দেখিয়া, ভাল মন্দ গুণাগুণ বিচার করিয়া, যে সৌন্দর্য্য দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার মূলে আকাঙ্ক্ষা, লক্ষ্য ও স্বার্থের ছায়া বিদ্যমান থাকে,—তাহা অতি সঙ্কীর্ণ, সীমাবদ্ধ ও পরিমিত গণ্ডীর মধ্যে অবস্থিতি করে। উহার উদ্দেশ্য সাধিত হইলেই, বা মধ্যে কোন অন্তরায় উপস্থিত হইলেই, এ সৌন্দর্য্য আপনা হইতেই অন্তর্হিত হয়—তখন সেই রূপ বা গুণের আর কোন বিশেষত্ব থাকে না—উহার অস্তিত্ব এককালে লোপ পায়—মোহ ভাঙ্গিলেই সেই রূপ-পিপাসা মিটিয়া যায়। কিন্তু যাহা প্রকৃত সুন্দর, তাহা সকলের চক্ষে সকল সময়ে সুন্দর বোধ হইবে। এ সৌন্দর্য্যের লক্ষ্য অনন্ত এবং ইহার স্থায়িত্বকালও অনন্ত। ইহাতে ব্যক্তিগত, জাতিগত, স্থানগত কোন একটি নির্দ্দিষ্ট বিশেষত্ব নাই, তবে ইহাতেও শিক্ষা, রুচি, ও হৃদয়ের ভাব অনুযায়ী ফল মিলিয়া থাকে। এ সৌন্দর্য্য আদর্শ স্থানীয় ও ভাবমূলক (Ideal)। ভাব-চক্ষে এ সৌন্দর্য্য দেখিতে পারিলে, অতি মনোহর ও অনির্ব্বচনীয় বোধ হয়। বহিশ্চক্ষে যে ইহা দেখিতে পাওয়া যায় না, তাহা বলিতেছি না—তবে তত্টা নহে। অনন্ত সৌন্দর্য্যের আধার স্বরূপ আদর্শ বস্তু দেখিতে হইলে, ভাব-চক্ষে দেখাই প্রশস্ত।

ভাব-চক্ষু লাভ করিতে হইলে প্রেম-সাধনার আবশ্যক হয়। প্রেম লাভ না করিতে পারিলে, আদর্শ সৌন্দর্য্য সম্যক্‌রূপে দেখিতে পাওয়া যায় না—হৃদয়ে সে ভাবও উপলব্ধি হয় না। যেখানে সৌন্দর্য্য-বোধ, সেই খানেই অগ্রে প্রেম,—যেখানে প্রেম, সেইখানেই সৌন্দর্য্য। একের অভাব হইলে আর একটি মলিন হয়—তাহার পূর্ণস্ফূর্ত্তি থাকে না। সৌন্দর্য্যের পরাকাষ্ঠা—প্রেমে, প্রেমের পরিচয়—সৌন্দর্য্য-বোধে। দুয়ের সংযোগ না হইলে কোনটিরও পূর্ণ বিকাশ হয় না। অতএব সৌন্দর্য্য দেখিতে হইলে প্রেমের আবশ্যক হয়, প্রেমলাভ করিতে হইলে সৌন্দর্য্য দেখিবার শিক্ষা আবশ্যক করে।

সৌন্দর্য্যের মূর্ত্তি নানাপ্রকার, প্রেমের স্ফূর্ত্তিও নানাভাবে বিকশিত। সৌন্দর্য্য ভিতরে বাহিরে সর্ব্বত্রই—প্রেম ও অন্তরে প্রকাশ্যে বিরাজিত। প্রেমের স্ফূর্ত্তি, সৌন্দর্য্যে, সাকার মূর্ত্তি ধারণ করে,—সৌন্দর্য্য-বোধও প্রেমে মিলিয়া সংসারে স্বর্গরাজ্যের প্রতিষ্ঠা করে। সৌন্দর্য্য প্রেমের সাহায্য করে,—প্রেম সৌন্দর্য্যের স্থান অধিকার করিয়া থাকে। যেন দুয়ের প্রাণ এক হয়, দুয়ের প্রাণই যেন মহামিলনে একীভূত হইয়া যায়। এ এক মহা-যোগ; ইহার উপরেও সৌন্দর্য্য ও প্রেমের আর একটি স্তর আছে, সে কথা ক্রমে বলিতেছি।

জড়-রাজ্যে যেমন সৌন্দর্য্য আছে, মনোরাজ্যেও তেমনি সৌন্দর্য্য বিরাজিত। জড়-জগতের সৌন্দর্য্য দেখিতে হইলে যেমন প্রেমের আবশ্যক হয়, মনোজগতের সৌন্দর্য্য দেখিতেও সেই মত প্রেমের সাহায্য আবশ্যক করিয়া থাকে। তবে ইহাতে প্রভেদ এই, জড়-জগৎ—রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ, দর্শন-স্মৃতি-বুদ্ধি-যুক্ত, আকার-বিশিষ্ট, সাকার-মূর্ত্তি—আর অন্তর্জ্জগৎ নির্গুণ, নির্ব্বিকার, নিরাকার-মূলক, ভাবযুক্ত। একটিতে সাকার, সগুণ, সকামভাব বিদ্যমান,—অন্যটিতে নিরাকার, নির্গুণ, নিষ্কাম ভাব নিহিত। একটি ত্রিগুণাত্মক—সৃষ্টি-স্থিতিপ্রলয় ভাবাপন্ন,—অন্যটি ত্রিগুণাতীত, সচ্চিদানন্দ ভাবে বিভোর। একটি জগদীশ্বর,—অন্যটি ব্রহ্ম। একের ভাব,—এই কার্য্য কারণ সংযুক্ত লীলা-বৈচিত্র্য,—অন্যের ভাব,—বিশুদ্ধং শান্তং শিব মদ্বৈতং; অনন্ত বিশাল বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড আভাসমান থাকিতেও যে ভাব, বিশ্ব বিধ্বংসী মহাপ্রলয়ের সময়ও ব্রহ্মের সেই ভাব।

বৈষ্ণবের বৈকুণ্ঠে, গোলোকে রাসমণ্ডলে, সৌন্দর্য্য ও প্রেমের মহামিলন। রাসেশ্বর সুন্দর পুরুষ, হ্লাদিনী রাধা প্রেমময়ী প্রকৃতি; রাধা কৃষ্ণের যুগল মিলনে, প্রেম সৌন্দর্য্যের মহামিলন। রাধা পদানুসরণে কৃষ্ণ মিলে; অর্থাৎ মহা প্রেমে মহা সৌন্দর্য্যের উপলব্ধি হয়। একটা হ'লে, আর একটা জিনিস পাওয়া যায়, এ দুটার কোনটা বড়? কৃপণ বলিবেন টাকাই বড়, পেটুক বলিবে, সন্দেশই বড়। শুক বলে কৃষ্ণ বড়, সারী বলে, রাধা বড়। শুক বলে, আমার কৃষ্ণ মদনমোহন, সারী বলে, আমার রাধা বামে যতক্ষণ, নহিলে শুধুই মোহন। প্রশ্নের এই একরূপ উত্তর। আর এক রূপ উত্তর

নন্তুর মুখে। নন্তুর পিতা মাতা বসিয়া আছেন, নন্তু খেলা করিতেছে; হঠাৎ নন্তুর মাসী জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাঁ রে নন্তু তুই তোর বাপকে বেশী ভাল বাসিস্, না মাকে বেশী ভাল বাসিস্?" নন্তু বড় গোলে পড়িল, মায়ের মুখের দিকে তাকাইল, দেখিল, মা টিপি টিপি হাসিতেছেন; মায়ের বসনাচ্ছাদিত স্তনের দিকে তাকাইল, দেখিল, স্তনদুটী কাঁপিতেছে; তাহার পর বাপের দিকে তাকাইল, দেখিল পিতা এক দৃষ্টিতে হাস্য বদনে তাহাকে লক্ষ্য করিতেছেন; তখন সাহস পাইয়া মায়ের স্তনে বাম হাতের চড় মারিয়া, দক্ষিণ হস্তে পিতার গোঁফ ধরিয়া টানিল, আর মাসীকে উত্তর দিল—"দুজনকেই।"

সৌন্দর্য্যের মূর্ত্তি নানা প্রকার। এই জড়-জগৎ ও অন্তর্জগতের সর্ব্বত্রই সৌন্দর্য্য বিরাজিত। ফলে ফুলে, জলে স্থলে, অনলে অনিলে, চন্দ্রে সূর্য্যে, গ্রহে উপগ্রহে, সমুদ্রে বোমে সর্ব্বত্রই সৌন্দর্য্য। প্রকৃতি সৌন্দর্য্যময়ী— অনন্ত সৌন্দর্য্যের ভাণ্ডার। নিত্য নূতন সৌন্দর্য্যের উৎস —জীব জন্তু, পশু পক্ষী, কীট পতঙ্গ প্রাণী মাত্রেরই প্রাণে অবিরাম গতিতে বহিতেছে। প্রেমের মন্দাকিনী ধারা এই সৌন্দর্য্যের সহিত মিশিয়া একই উদ্দেশ্যে—চরম-লক্ষ্যে খরতর বেগে ছুটিতেছে। প্রকৃতির সন্তান সে সুধা পান করিয়া অমর হইতেছে। এই প্রভাত হইল, মৃদুল মলয় বায়ু ধীরি ধীরি বহিতে লাগিল, বিহঙ্গমকুল ললিতস্বরে প্রভাতীগানে অনন্ত জগৎ মাতাইয়া তুলিল, মধুকর দল গুন্ গুন্ রবে প্রস্ফুটিত কুসুমের মধুপানে মত্ত হইল, দিনকর স্বর্ণকর ঢালিয়া আরক্তিম লোচনে চাহিতে লাগিলেন, অনন্ত সুনীল আকাশ দেখিতে দেখিতে জ্যোতির্ম্ময় হইয়া উঠিল, চারিদিক কোলাহল-পূর্ণ হইতে লাগিল। আবার মধ্যাহ্নে সে ভাবের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন; এখন আর প্রকৃতির সে স্ফূর্ত্তি নাই, বৃক্ষরাজী, তরুলতার এখন আর সে হাস্যময় ভাব নাই—এখন জীব জন্তু, পশু পক্ষী সকলেই যেন ক্লান্ত সকলেই যেন অবসন্ন, মার্ত্তণ্ডের খর কিরণে সকলেই যেন এক্ষণে বিশ্রামভাবে লালায়িত। গোধূলি সমাগমে, আবার সে ভাবের পরিবর্ত্তন। সুনীল আকাশ এখন বিচিত্ররূপ ধারণ করিয়াছে। চারি দিক নীল, পীত, শ্বেত, লোহিত, কৃষ্ণ, ধূসর নানাবর্ণে রঞ্জিত হইয়াছে, তটিনী কুল কুল স্বরে আপন মনে বহিতেছে, পশু পক্ষী স্ব স্ব বৃক্ষ-নীড়ে ফিরিতে লাগিল। দেখিতে

দেখিতে সন্ধ্যাদেবী তিমির বসন পরিধান করিয়া ধরা উদ্যানে বিচরণ করিতে আসিলেন। আকাশে অসংখ্য নক্ষত্ররাজী ফুটিয়া তাঁহার মস্তকে হীরক খণ্ডের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল, চাঁদ উঠিল, চকোর চকোরী চাঁদের সুধাপান করিতে লাগিল, চাঁদের আলোয় দিক আলো হইল। বিমল জ্যোৎস্না একটু একটু করিয়া ফুটিতে লাগিল। ক্ষণপরে আবার সে দৃশ্যের পরিবর্ত্তন। স্থির, গম্ভীর, প্রশান্ত পৃথিবী ক্রমেই অধিকতর প্রশান্ত হইতে লাগিল। গভীর নিস্তব্ধ ভাবের মধ্যে কেমন এক সুমৃদু গম্ভীর ঝিম্ ঝিম্ রব শ্রুত হইতে লাগিল; নিদ্রার বিশ্রাম ক্রোড়ে সকলেই সুপ্ত—কোথাও কিছু সাড়া শব্দ নাই; মধ্যে মধ্যে সুদূর আকাশ হইতে দেব দেবীর পূজোপকরণ অপূর্ব্ব ঘণ্টার মৃদু মধুর রব ভক্তের মন প্রাণ বিমুগ্ধ করিতে লাগিল; সংসারের পাপী তাপী, দীন দুঃখী, অনুতপ্ত জন, সন্তপ্ত অশ্রু ফেলিয়া স্ব স্ব ভারবহ জীবন লঘু করিতে লাগিল; দেখিতে দেখিতে আবার সে ভাবের পরিবর্ত্তন,—এই বার সুখময়ী উষাদেবীর আবির্ভাব হইল। এইরূপে অনন্ত সৌন্দর্য্যময়ী প্রকৃতি আবাহমানকাল আপনার অনন্ত সৌন্দর্য্য বিস্তার করিয়া আসিতেছেন। গ্রীষ্মের দুর্দ্দমনীয় উত্তাপ, বর্ষার অবিশ্রান্ত জলধারা, শরতের মেঘ রাশি, হেমন্তের নীহার, শীতের শৈত্য, বসন্তের মলয় বায়ু—ষড় ঋতুর পর্য্যায়ক্রমে আবির্ভাব অন্তর্ধানে প্রকৃতি রাজ্য নিত্য নূতন শোভায় শোভিত হইতেছে—অনুক্ষণ সৌন্দর্য্যের ডালি মাথায় লইয়া প্রকৃতি দূতি জীব জগতকে উপহার দিতেছেন। এ সৌন্দর্য্য সকলকেই মোহিত করে—সকলের হৃদয়ে আনন্দ বর্দ্ধন করে। এ সৌন্দর্য্যের মূলে প্রেম নিহিত;—প্রেমই সুখ। হৃদয়ের তারতম্যানুসারে এ সুখ সকলেরই উপভোগ্য হয়। তারপর অন্তর্জগতের সৌন্দর্য্যের কথা। দয়া, শ্রদ্ধা, ভক্তি, শান্তি, প্রীতি, স্নেহ, ভাল বাসা প্রভৃতি কমনীয় গুণ সমষ্টিতে এ সৌন্দর্য্যের উৎপত্তি। প্রেমই ইহার মূলাধার, ভালবাসাই ইহার প্রাণ। এ সৌন্দর্য্য হৃদয়ে উপলব্ধি করিতে পারিলে, মানুষের দেবত্ব লাভ হয়। বহির্জগতের ন্যায় ইহার জড়রূপ নাই, ইহার রূপ, বাসনায়। বাসনায় মূর্ত্তি গড়িয়া এ জগৎ সৃষ্টি করিতে হয়। এ জগৎ সৃষ্টির ক্ষমতা জন্মিলে মানুষ অসাধ্য সাধন করিতে পারে—সৌন্দর্য্য ও প্রেমের প্রতিভায় ধরায় স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হয়।

কিন্তু প্রেম ভিন্ন জড়-জগতের সৌন্দর্য্যও সম্যক উপলব্ধি করা যায় না। প্রকৃতি রাজ্যেই ইহার যথেষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়। আকাশ, সমুদ্র, পর্ব্বত, নদী, অরণ্য, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, উপগ্রহ, তোমার আমার চক্ষে একরূপ বোধ হইবে, আবার একজন প্রেমিক, ভক্ত, সাধক বা কবির চক্ষে ভিন্ন রূপ বোধ হইবে। তুমি আমি সহজ দৃষ্টিতে যাহা দেখিবার তাহাই দেখিব, কিন্তু ইঁহারা সাধনার অন্তর্দৃষ্টিতে অনেক অধিক ও উচ্চ ভাব দেখিতে পাইবেন। ইহাতে এই বুঝা যাইতেছে যে, শিক্ষা, রুচি ও মনের উদার অনুদার ভাব অনুসারে, সৌন্দর্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু কেহই নিরাশ হইবে না—অবিনশ্বর অনন্ত-সৌন্দর্য্য সকলকেই একটু না একটু দেখা দিবে। অল্প হোক, বিস্তর হোক সাধনা সকলেরই আছে। তাহাতেই বলিতেছিলাম, যাহা প্রকৃত সুন্দর, তাহা সকলের চক্ষেই সুন্দর বোধ হইবে।

প্রকৃতি-রাজ্য ছাড়িয়া আরও সহজ পথে অগ্রসর হইতেছি। একখানি সুবৃহৎ অতি শিল্প নৈপুণ্যযুক্ত বিচিত্র ও মনোহর চিত্রপট দর্শন কর;—নানা বর্ণে রঞ্জিতে বৃক্ষ, লতা, গুল্ম, নদ, নদী, পাহাড়, পর্ব্বত, অরণ্য, সমুদ্র, আকাশ প্রভৃতি অঙ্কিত রহিয়াছে;—চিত্রকরের দক্ষতা গুণে চিত্রখানি বড়ই সুন্দর ফুটিয়াছে। তুমি আমি সকলেই এক দৃষ্টে দেখিতেছি, দেখিয়া মুগ্ধ হইতেছি ও মুক্ত অন্তরে চিত্রকরের ক্ষমতার ভূয়সী প্রশংসা করিতেছি। তুমি আমি, চিত্রপটের বাহ্যিক সৌন্দর্য্যে মোহিত হইতেছি, বিবিধ বর্ণের চাকচিক্যময় বৃক্ষ লতা, অরণ্য প্রভৃতি দেখিয়া স্থির দৃষ্টে হাঁ করিয়া তাহার প্রতি চাহিয়া আছি—কিন্তু ভিতরের ভাব কিছুই বুঝিতে পারি নাই, হয়ত তাহার বিশেষ দোষ গুণ বিচার করিতে পারিতেছি না, অথচ কিছু না কিছু সৌন্দর্য্য দেখিতে পাইতেছি। কিন্তু সেই চিত্রকরের সমকক্ষ আর একজন চিত্র-সমালোচক যদি সেই চিত্রপট খানি দর্শন করেন, তবে তিনি তন্ন তন্ন করিয়া পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সেই চিত্র দর্শন করিয়া কতই না সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিতে পারেন। এই স্থলে শিক্ষার উপর এই সৌন্দর্য্য-দর্শন নির্ভর করিতেছে।

গান সকলেই শুনে, মিষ্ট লাগিলে সকলেই "আহা মরি" করে; কিন্তু প্রকৃত সুর, তান, লয় বুঝে কয়টা লোকে? মহাকাব্য সকলেই পড়ে, কিন্তু প্রকৃত রস বিচার বোধ কয়জনের আছে? গ্রন্থ লিখে অনেকে, পাঠযোগ্য

হয় কয় খানা? এ সকল বিষয়ের সৌন্দর্য্য দেখিতে হইলে সংশিক্ষার আবশ্যক করে; তারপর রুচিও কতকটা পরিমার্জ্জিত হওয়া আবশ্যক।

সাহিত্য ও কাব্য জগতের সৌন্দর্য্যও বড় একটা সহজ ব্যাপার নয়। স্থূল জগৎ ছাড়িয়া অন্তর্জগৎ সৃষ্টি করা, বড় প্রতিভাবান্ ব্যক্তির কাজ। যখন তখন সে শ্রেণীর লোকও বড় একটা জন্মগ্রহণ করে না। সাহিত্য জগতের অমর কবি বাল্মীকির রামায়ণ, ব্যাসের ভারত—রসের সপ্ত সমুদ্র বিশেষ। মানব-চরিত্রের বিশ্লেষণ ও ঘটনা পরম্পরার এমন সুকৌশল সংযোগ অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। কালিদাসের অভিজ্ঞান-শকুন্তল প্রভৃতিও রত্ন বিশেষ। কিন্তু এ সকল কাব্যের সৌন্দর্য্য দেখিতে জানে কয় জন? সেক্ষপিয়রের গ্রন্থ ত অনেকেই পড়ে, কিন্তু হ্যামলেট, ম্যাকবেথ্ ওথেলো নাটকের সৌন্দর্য্য বুঝিতে পারে কয়জন? আর আজ বাঙ্গালী লেখকের শীর্ষ-স্থানীয় প্রতিভাবান্ বঙ্কিমচন্দ্রের উপাখ্যানাবলী পঠিত হয় ত বাঙ্গালার ঘরে ঘরে—স্ত্রী পুরুষ, বালক বালিকারও মধ্যে—কিন্তু কপাল কুণ্ডলার সৌন্দর্য্য বুঝিয়াছে কয়জন? তাহাতেই বলিতেছিলাম, কাব্য-জগতের সৌন্দর্য্যও বড় একটা সহজ জিনিষ নয়। প্রভূত প্রতিভা-শক্তি না থাকিলে আদর্শ চরিত্রের অঙ্কনে কৃতকার্য্য হওয়া যায় না—সৌন্দর্য্য পূর্ণ মাত্রায় প্রস্ফুটিত হয় না। কার্লাইল্ বলেন, কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিবার প্রবৃত্তির নাম প্রতিভা (genius); আমরা বলি তাহারই নাম প্রেম। প্রতিভায় শক্তির স্ফূর্ত্তি। প্রেমে প্রতিভার স্ফূর্ত্তি।

আদর্শ চরিত্রের পূর্ণ সৌন্দর্য্য বিকশিত করাই প্রতিভা সম্পন্ন ব্যক্তির কাজ—কিন্তু প্রত্যক্ষ প্রকৃত চিত্র অঙ্কনে সে ক্ষমতার প্রয়োজন হয় না—এমন কথা বলিতেছি না। আপাত দৃষ্টিতে যাহাকে আমরা প্রকৃত বলিতেছি, সময়ে তাহাই পরাকৃত হয়,—আবার উপস্থিত যাহা পরাকৃত মনে হইতেছে, প্রত্যক্ষ ঘটনায় তাহাই আবার প্রকৃত দেখিতে পাই। অতএব প্রকৃত পরাকৃতের বিশেষ মীমাংসা ঠিক হয় না। তবে এই অবধি, বলিতে পারা যায়, প্রকৃত হোক আর পরাকৃত হোক—এ উভয় চিত্র অঙ্কিত করিতেই প্রভূত প্রেমের প্রয়োজন।

যাহা প্রতিনিয়ত দেখিতেছি, শুনিতেছি, বলিতেছি, লিখিতেছি, পড়ি-

তেছি, অনুভব করিতেছি, তাহাই প্রকৃত প্রত্যক্ষ-সত্য। ইহাতে যে সৌন্দর্য্য নাই, এমন কথা কে বলিবে? তবে কথা এই, যে জিনিসটা অনায়াস-লভ্য, আমাদের নিকট তাহার আদর কম। সংসারের এই গতিই কেমন। যাহা বহু আয়াস-লব্ধ—সংসারে সচরাচর মিলে না, আমরা তাহারই অধিক আদর করিয়া থাকি। মানুষের স্বভাব, শিক্ষা ও রুচি অনুসারে সৌন্দর্য্য দর্শনের তারতম্য হয়। সুতরাং যে বস্তু বা যাহাকে প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, তাহার প্রতি তত আস্থা বা ভক্তি শ্রদ্ধা নাই; কেননা, তাহাতে "লুকান ছাপান কোন না কোন খুঁত থাকিতে পারে।" তুমি সমস্ত সৎগুণের আধার স্বরূপ হইলেও, লোকে আর একজনকে আশীর্ব্বাদ করিবার সময়, তোমার আদর্শ দেখাইবে না,—যাহা সৌন্দর্য্যের শীর্ষস্থানীয়, এমন আদর্শ চরিত্রের উল্লেখ করিবে। তুমি আজ হয়ত ভাল আছ, কাল হয়ত না থাকিতে পার, দুই দশ দিনে বা দশ বৎসরে হয়ত তোমার কিছু না কিছু পরিবর্ত্তন ঘটিতে পারে—তোমার চরিত্রে একটু না একটু কলঙ্কের দাগস্পর্শ করিতে পারে, সুতরাং কাহাকেও আশীর্ব্বাদ করিবার সময় লোকে বলিবে,—"রামচন্দ্রের মত সত্য-নিষ্ঠ ও পিতৃ-ভক্ত হও,—যুধিষ্ঠিরের মত ধর্ম্ম-পরায়ণ হও।" যদি স্ত্রীলোক হয়, ত বলিবে,—"এস মা, সীতা সাবিত্রীর মত পতিব্রতা হও।" এখানে এ আদর্শ চরিত্রের উল্লেখ করিবার কারণ এই "ইঁহারা পরাকৃতি; ইঁহাদের চরিত্রে ত খুঁৎ থাকিতে পারেনা;—আর পরিবর্ত্তন—তাহাও অসম্ভব"। তাহাতেই বলিয়াছি যে, আদর্শ-সৌন্দর্য্যই প্রকৃত সৌন্দর্য্য। প্রেমেই তাহার সৃষ্টি, প্রেমেই তাহার অনুভাবনা।

সৌন্দর্য্য ও প্রেমের ব্যভিচার—রূপজ-মোহ যে কিছুই নয়, এক্ষণে তাহাই বলিতেছি। একটি পরম লাবণ্যবতী অসমা সুন্দরী বারাঙ্গনার সৌন্দর্য্য দেখিয়া পাঁচজনের মনে পাঁচ রকম ভাবের উদয় হইল। যে ইন্দ্রিয়পরায়ণ, সে তাহাকে দেখিয়া কেবলই পশুবৃত্তির উত্তেজনায় অন্ধ হইল;—দ্বিতীয় ব্যক্তি তাহাকে দেখিয়া কেবলই "আহা মরি" বলিয়া তাহার রূপের ও অঙ্গ সৌষ্ঠবের ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিল;—তৃতীয় ব্যক্তি তাহাকে দেখিয়া "আহা, এমন সৌন্দর্য্য-প্রতিমা এ কলুষিত স্থানে কেন আসিল?" বলিয়া তাহার ঘৃণিত বেশ্যা-জীবনের জন্য দুঃখ করিতে লাগিল। চতুর্থ ব্যক্তি

তাহার সৌন্দর্য্য দেখিয়া প্রেম-বিগলিত নেত্রে জগদীশ্বরের মহিমা চিন্তা করত কহিলেন,—"আহা, বিধাতার কি অপূর্ব্ব সৃষ্টি! এমন রূপের প্রতিমা গড়া কেবলই তাঁহাকেই শোভা পায়!" পঞ্চম ব্যক্তি সৌন্দর্য্য ও প্রেমে আত্মহারা,—তিনি ভাবের পূর্ণোচ্ছ্বাসে বিভোর হইয়া কহিলেন,—"আহা, কি অপরূপ রূপ! কি কমনীয় মূর্ত্তি! এ হেন অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য-প্রতিমাকে যিনি সৃজন করিয়াছেন, না জানি তিনি কতই সুন্দর!"

এখন রূপজ-মোহে এবং সৌন্দর্য্য ও প্রেমের দৃষ্টিতে কত প্রভেদ দেখিলে? এখন জানিলে, প্রকৃত সৌন্দর্য্য ও প্রেম কি? এখন স্পষ্টরূপে দেখান হইল যে, যাহা প্রকৃত সুন্দর, তাহা সকলের চক্ষেই সুন্দর বোধ হইবে। বারাঙ্গনার সৌন্দর্য্য কাহাকেও বঞ্চিত করিল না। যাহার হৃদয়ে যে ভাব, যেমন রুচি, যেরূপ শিক্ষা, সে, সেই ভাবেই তাহাকে দেখিল—তাহার সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিল।

যাহারা রূপে মজিয়া সৌন্দর্য্যের কল্পনা করে, প্রকৃত সৌন্দর্য্য তাহারা দেখিতে পায় না। প্রেমের পূজা না করিলে প্রকৃত সৌন্দর্য্য দেখা দেয় না। মনের কালিমা না ধুইলে জ্ঞান-চক্ষু ফুটে না। সত্য, ন্যায় ও ধর্ম্মের মহিমা হৃদয়ে উপলব্ধি না করিলে, প্রকৃত সৌন্দর্য্য বহু দূরে অবস্থিতি করে। সৌন্দর্য্যের পূর্ণ বিকাশ—প্রেমে; আর প্রেমের পূর্ণস্ফূর্ত্তিই সেই সৌন্দর্য্য বোধ। সত্য অপেক্ষা সৌন্দর্য্যময় ও প্রেমময় বস্তু আর কিছুইনাই—সুতরাং সত্যই সৌন্দর্য্য ও সত্যের ধারণাই প্রেম। ধর্ম্ম অপেক্ষা সত্য আর কিছুই নাই—সুতরাং ধর্ম্মই সৌন্দর্য্য ও ধর্ম্মের ধারণাই প্রেম।

রূপজ-মোহে মানুষকে আদর্শ-পথে লইয়া যাওয়া দূরের কথা—তাহাকে অধঃপথে নরকের দিকে আকর্ষণ করে, ভস্মীভূত করিয়া ফেলে। সাধ্বী সতী সুন্দরী রমণীর দীর্ঘশ্বাসে এবং সৌন্দর্য্য ও প্রেমের অমানুষী মহিমায় অতি শীঘ্রই আক্রমণকারী পশুকে চিরদিনের মত ইহ সংসার ত্যাগ করিতে হয়। ইতিহাস স্বর্ণাক্ষরে উজ্জ্বলরূপে ইহার সাক্ষ্য দিতেছে। যে রূপের আগুণে পুড়িয়া ট্রয় নগর এককালে ভস্মীভূত হইয়াছিল, রোমের সাধারণ বিচার-তন্ত্র সংস্কৃত হইয়া রোমবাসীর হৃদয়ে একতা ও সহানুভূতির বীজবদ্ধমূল করিয়া-লুক্রেশিয়া নাম অক্ষয় অক্ষরে খোদিত করিয়াছে—ইহা সেই সতী-

বিক্রম; যাহার জন্য প্রবল-পরাক্রমশালী, প্রচণ্ড তেজা, লঙ্কাধিপতি দশানন সবংশে নিহত হইয়াছিল, বিপুল কুরুকুল যে কারণে এককালে নির্ম্মূল হয়, যে আগুণের অলৌকিক তেজে সর্ব্ববিধ্বংসী মহাকালও বিকম্পিত হইয়াছিল—সত্যবানের দেহ স্পর্শ করিতেও সাহসী হয় নাই, তাহা কেবল প্রেমের মহিমা, সতীত্বের সৌন্দর্য্য।

কিন্তু সৌন্দর্য্য ও প্রেমের এই চরম অবস্থা ইহ সংসারে অতি বিরল। ঈশ্বরের কৃপা ভিন্ন এ সৌভাগ্য কেহ লাভ করিতে পারে না। সৌন্দর্য্য ও প্রেমের পূর্ণ অধিকারী হইতে পারিলে, মানুষের দেবত্ব লাভ হয়। তখন শত্রু মিত্র,—পণ্ডিত, মূর্খ—ধনী, দরিদ্র—পাপী তাপী,—সকলকেই ভ্রাতৃভাবে আলিঙ্গন করিতে প্রাণ ব্যাকুল হয়, ইহ সংসারে আর কোন বিষয়ের ভেদাভেদ জ্ঞান থাকে না। নর চক্ষে সৌন্দর্য্য ও প্রেমের এ গভীর উদার ভাব দৃষ্টিগোচর হয় না। চর্ম্ম চক্ষু বিনষ্ট হইয়া যখন মানুষের মনশ্চক্ষু প্রস্ফুটিত হইতে থাকে, তখনই এ ভাব উপলব্ধি হয়। তখন প্রেমময় ভগবানের প্রেমচ্ছবি সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়। জলে স্থলে, অনলে অনিলে, গৃহে বনে, পর্ব্বতে অরণ্যে, শত্রুপুরে কারাগারে, সম্মুখে পশ্চাতে, বামে দক্ষিণে, উর্দ্ধে নিম্নে—সর্ব্বত্রই সকল স্থানেই মূর্ত্তিমান ঈশ্বরের বিরাট সাকার মূর্ত্তি এই পরিদৃশ্যমান্ জগতের সর্ব্বত্র পরিলক্ষিত হয়। চরাচর অনন্ত বিশ্ব তখন সর্ব্বদা আনন্দের পূর্ণ বিকাশে আলোকিত হইয়া উঠে। বিশাল ব্রহ্মাণ্ড তখন সৌন্দর্য্য ও প্রেমের ভাণ্ডার হয়। সৌন্দর্য্যের অন্ত নাই, সে প্রেমেরও অন্ত নাই। তাহা অনন্ত—অক্ষয়। এই প্রেমের সৌন্দর্য্যে বিমোহিত হইয়া মহাপ্রভু গৌরাঙ্গদেব "হরিবোল হরিবোল" রবে এক দিন ভারত মাতাইয়াছিলেন; মহামতি শাক্যসিংহ এই ভাবে বিভোর হইয়া একদিন জীবের মুক্তির উদ্দেশে "অহিংসা পরমোধর্ম্মঃ" প্রচার করিয়াছিলেন; বৈদিক কর্ম্মকাণ্ড ও হিন্দু ধর্ম্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য অদ্বৈতবাদী ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য একদিন এই প্রেমে উন্মত্ত হইয়া সুদূর হিমালয় হইতে কন্যাকুমারী পর্য্যন্ত "সচ্চিদানন্দ রূপ শিবোহং শিবোহং" রবে ধর্ম্ম জগৎ বিকম্পিত করিয়াছিলেন; আর ধ্রুব প্রহ্লাদ এই আলোকে হৃদয় আলোকিত করত মরণ-ভয় তুচ্ছ করিয়া স্ব স্ব গন্তব্য লক্ষ্য পথে ছুটিয়াছিলেন। এই সৌন্দর্য্য

ও প্রেমের অপূর্ব্ব প্রতিভায় অনুপ্রাণিত হইয়া খ্রীষ্ট ক্ষমা গুণের অসাধারণ মহত্ত্ব দেখাইয়াছিলেন; মহাত্মা সক্রেটিস্ এই সত্যের মহিমায় বিষপান করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই; মিবাররাজ মহারাণা প্রতাপ এই সৌন্দর্য্য প্রেমে বিমোহিত হইয়া স্বাধীন হৃদয়ের আদর্শ স্থানীয় হইয়াছেন। আর সেই ভক্তি তীর্থ বৃন্দাবনে ভক্তের মেলায় স্ত্রী পুরুষ সকলেই একদিন এই প্রেম লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন; স্রোতস্বতী যমুনা একদিন এই সৌন্দর্য্য ও প্রেমের আকর্ষণে তাহার স্বভাব গতিও রোধ করিত; সৌন্দর্য্য ও প্রেমের পূর্ণ অবতার—যখন সেই মোহন বাঁশরী মোহন করে লইয়া অনন্ত প্রেমের মহিমা আলাপ করিতেন, কুলবধূ তখন কুল ত্যাগ করিতে সঙ্কুচিত হইত না, সতী রমণী পতিকে ছাড়িয়া আসিত, জড় জগতেরও তখন স্বাভাবিক বিপর্য্যয় ঘটিত। এই ত সৌন্দর্য্য—এই ত প্রেম। এই ত পরিণাম, এই ত জড়জীবের প্রাণ। ইহা জগতের সার—ইহা চরাচর বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম।

শ্রীহারাণচন্দ্র রক্ষিত।

মাকবেথ্ ও হামলেট্।

দ্বিতীয়াংশ।

বহুকাল পরে আমরা শেক্সপীয়রের অদ্বিতীয় নাটকদ্বয় সমালোচনার দ্বিতীয়াংশে হস্তক্ষেপ করিতেছি। মাকবেথ নাটকের সমালোচনা শেষ হইয়াছে, হামলেট সমালোচনা আরম্ভ করিতেছি। পাঠক হয়ত এতদিনে, আমাদের কর্ত্তৃক ঐ দুই নাটকের মজ্জা-সমালোচন ভুলিয়া গিয়াছেন, সুতরাং এই স্থলে সেই সকল কথার পুনরুল্লেখের প্রয়োজন।

১। মাকবেথ—মহাপাপ; হামলেট—মহাদুঃখ।

২। লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু।

৩। লোভের মধ্যে কামজ লোভ অতি ভয়ঙ্কর।

৪। কামজ পাপের পরিণাম সংক্রামক।

৫। দুরাকাঙ্ক্ষা ও প্রবৃত্তি পাপের ধাত্রী ও পোষয়িত্রী।

৬। ভক্তিহীন চিন্তা দুঃখের ধাত্রী ও পোষয়িত্রী।

৭। পাপে দুঃখে বড় ঘনিষ্ঠতা।

৮। কামজ পাপে অন্যকে দারুণ দুশ্চিন্তায় পতিত করিয়া মহাদুঃখী করে, সেই দুঃখে আবার পাপের উৎপত্তি, সেই পাপে ক্রমে মহাদুঃখ।

মাকবেথ নাটকে শেক্সপীয়র বলেন, পাপ পাপীকে পোড়ায়। হাম্‌লেট্ নাটকে বলেন, তাত পোড়ায়ই, সঙ্গে সঙ্গে দুঃখ বিস্তার করিয়া পাপ ছড়াইয়া, চতুষ্পার্শ্বস্থ পাপী ও নিষ্পাপকে সমানে দগ্ধ করিয়া ফেলে।

দুই খানি নাটক একটি নক্‌সায় এইরূপে দেখান যাইতে পারে;—

মাক্‌বেথ

পাপের উৎপত্তি, পরিপুষ্টি, আধিপত্য, দুঃখজনকতা, সংক্রমণ, পরিণাম।

হামলেট্

পাপের পরিণাম প্রদর্শন উভয় নাটকেরই মুখ্য উদ্দেশ্য। মাক্‌বেথ নাটকে পাপের উৎপত্তি, পরিপুষ্টি, আধিপত্য সম্পূর্ণরূপে দেখান হইয়াছে; দুঃখজনকতা গৌণ ভাবে আছে। হামলেট্ নাটকে পাপের আধিপত্য, দুঃখজনকতা, সংক্রমণ বিশেষরূপে দেখান হইয়াছে—পরিপুষ্টি গৌণভাবে আছে। আধিপত্য উভয়েই সমান, পরিণাম একরূপ হইয়াও,—স্বতন্ত্র।

উভয় নাটকেই আদিতে বিদেশী রাজা কর্ত্তৃক স্বদেশ আক্রমণের কথা আছে। উভয়ত্রই নরওয়ে রাজ আক্রমণকারী। মাক্‌বেথ নাটকে নরওয়ে রাজকে পরাভূত করিয়াই মাকবেথের মনে দুরাকাঙ্ক্ষার উদয় হয়, তাহাতেই পাপের সূত্রপাত—কিন্তু পরিণামে স্কটলণ্ডের সিংহাসনে প্রকৃত উত্তরাধিকারী মাল্‌কোম অধিষ্ঠিত; দেশে শুভকর শান্তি বিরাজিত। হামলেটের আরম্ভে নরওয়ে রাজের আক্রমণ সূচনা; পরিণামে সেই নরওয়ে রাজ কর্ত্তৃক দিনামার ভূমির অধিকার; দিনামারগণের স্বাধীনতা চ্যুতি। ক্লডিয়সের পাপ সংক্রামক বলিয়া সেই পাপের পরিণাম অতি ভয়ঙ্কর।

হামলেট্ নাটকে রাজহত্যা, অগ্রজ হত্যা, সুপ্তহত্যা, গুপ্তহত্যা প্রভৃতি মহাপাপের সহিত গুর্ব্বিনী গমন রূপ আর একটি মহাপাপ মিলিত হইয়াছে। সেই মহাপাপের সংক্রামকতা অতি ভয়ঙ্কর। পিতৃহন্তা অবাধে পিতৃবৈভব অধিকার করিয়াছে, বিষয়ী লোকের পক্ষে এদুঃখ মহাদুঃখ সন্দেহ নাই কিন্তু এ ক্ষতির আংশিক পূরণ হয়। পিতাকে পাওয়া যায় না, কিন্তু পিতৃবৈভব পাওয়া যাইতে পারে; আর পিতৃ হন্তাকে দণ্ডিতও করা যায়। কিন্তু সেই পিতৃহন্তা বৈভবাপহারী আবার মাতাকে স্বীয় শয্যাভাগিনী করিয়াছে;—এই শেষ ক্ষতির কি কিছু পূরণ আছে গা! মাতা দুশ্চারিণী বলিয়াই ধীর, স্থির, গম্ভীর প্রকৃতির হামলেট দুশ্চিন্তায় অবসন্ন। পিতৃব্যের দুষ্কৃতি, ও মাতার দুশ্চরিত্র ভাবিয়া ভাবিয়া হামলেট্ পাগল বল, চিন্তাপ্রিয় বল, দার্শনিক বল, কবি বল, পাপী বল, অকর্ম্মণ্য বল, mystic বল, দুজ্ঞের্য় বল, বিশ্বাসহীন বল, যাহা বল, তাহাই হইয়াছেন।

মহাপাপের পরিণাম সর্ব্বত্র একরূপ হইলেও, মূলের বিভিন্নতা বশত প্রসরে ও বিস্তারে পরিণামের বিভিন্ন মূর্ত্তি হয়। এই কথাটি বুঝাইবার জন্য শেক্স্পীয়র একই রূপ কাহিনী লইয়া দুই খানি পৃথক্ নাটক লিখিয়াছেন।

ম্যাক্‌বেথ্ ও হামলেট নাটকের একই মূল কথা—রাজ্যলোভে রাজহত্যা। ম্যাক্‌বেথ সমালোচনায় দেখাইয়াছি, যে মূল কাহিনীতে আরও ঐক্য ছিল, শেক্সপীয়র তাহা পরিত্যাগ করিয়াছেন। আদি কাহিনীদ্বয়ের মূল কথা—রাজ্য লোভে রাজহত্যা, পরে কাম মোহে গুর্ব্বিণীগমন। * কিন্তু মাকবেথ নাটকে কবি এই শেষ ভাগ পরিত্যাগ করিয়াছেন। মূলে বিভিন্ন করিয়াছেন, কাজেই পরিণাম বিভিন্ন হইয়াছে। একটী কথা ভাগাভাগী করিয়া দুই নাটকে দেখান হইয়াছে।

এক ভাগ দেখাইয়াছি, আর এক ভাগের কথা বলিব। পূর্ব্বে বলিয়াছি, পাপের উৎপত্তি ও পরিপুষ্টির বিবরণ হামলেট নাটকে মুখ্যভাবে দেখান হয় নাই, গৌণভাবে হইয়াছে। অমুগৃহীত অনুজ রাজ্যের উপর

---

* ৪র্থ ভাগ নবজীবনে ৩৫৪ পৃষ্ঠা।

লোভ পরবশ হইয়া, রাজ মহিষীর উপর কাম পরবশ হইয়া অগ্রজ সহোদর রাজাকে সুপ্তাবস্থায় হত্যা করিয়া রাজ্য করগত এবং রাজমহিষীকে শয্যাভাগিনী করিল। সেই সাঙ্গোপাঙ্গ পূর্ণাবয়ব পাপ দিনামার ভূমির রাজমূর্ত্তিতে সিংহাসন অধিষ্ঠিত হওয়ার পরে, হামলেট নাটকের আরম্ভ।

মাক্‌বেথ নাটকের প্রথমেই তিনটা ডাকিনী বা প্রেতিনীর আবির্ভাব। সেই গুলাকে আমরা মাক্‌বেথের মূর্ত্তিমতী দুরাকাঙ্ক্ষা বলিয়া বুঝিয়াছি, হামলেট্ নাটকের ঠিক প্রথমেই না হউক, প্রথমাঙ্কের প্রথম দৃশ্যেই প্রেতের আবির্ভাব।—কি বালাই!

ভূত প্রেত,—কুসংস্কারাবিষ্টা, বর্ণজ্ঞান-বিরহিতা, একমাত্র বস্ত্রা, বর্ব্বর-জননী ঠাকুরমার—গল্পেই থাকিবে, অজ্ঞান অন্ধকারাচ্ছন্ন বঙ্গপল্লীর শ্মশান নিকটস্থ বটতলায়—থাকিবে, মহামতি মেকলে কর্ত্তৃক বিশদ বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায় প্রমাণীকৃত অধম যে বাঙ্গালী, তাহাদিগের অন্ধ বিশ্বাসে—থাকিবে,—এ হেন সুসভ্য ইংরাজ জাতি যে শেক্‌সপীয়রের এখনও গৌরব করেন, আপনাদের জাতীয় ধন বলিয়া যাহার নাটকের পরিচয় দেন, সেই শেক্সপীয়রের মহামহা নাটকের গোড়াতেই ভূত প্রেতের কাণ্ড—কি বালাই গা—লজ্জা করে যে;—

তা লজ্জা হইলে, আর কি করা যায়, ভূতের কথা, প্রেতের আবির্ভাব যখন শেক্সপীয়রের নাটকে রহিয়াছে, তখন সেই গুলার বিষয় আমাদের ভাবিয়া চিন্তিয়া দেখিতেই হইতেছে।

প্রথম ভাবনা—যে সকল ভূত প্রেত ডাকিনীর কথা শেক্সপীয়রের নাটকে আছে—সে গুলা কি কেবল আধ্যাত্মিক পদার্থ (Merely subjective) বা তাহাদের মধ্যে আধিভৌতিকতাও (Objectivity) আছে? অন্য নাটকগুলি এখন বাদ দিয়া যে দুই খানি লইয়া আমরা এখন বিব্রত, সেই দুই খানি হইতেই ঐ প্রশ্নের মীমাংসা করিবার চেষ্টা করা যাউক।

দেখা যায়, যে সমালোচ্য নাটক দুই খানিতে শেক্সপীয়র প্রধানত দুই ভাবে ভূত প্রেতের আবির্ভাব করিয়াছেন;—

(১) যেমন ব্যাঙ্কোর ভূত। এই প্রেতমূর্ত্তি কেবল মাকবেথ চক্ষেই দৃশ্যমান। কথা কহে না, কোন কার্য্যই করে না—হয়ত কেবল ঘাড় নাড়ে। কিন্তু সমস্তই কেবল মাক্‌বেথের দৃষ্টিপথে; উপস্থিত অন্য সকলে কিছুই দেখিতে পায় না।—কাজেই

যে ভূত দেখিতে পাইতেছে, সে খেয়াল দেখিতেছে মনে করে। এইরূপ দৃশ্য সম্বন্ধে আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি—বিশেষ পুণ্যাত্মাগণ এবং অতি বড় পাপাত্মারা অলৌকিক ভাবে চক্ষুষ্মান হন। একের পক্ষে অলৌকিক দৃশ্য সকল, পুণ্যের পরিণাম এবং সুখের আবহ। অন্যের পক্ষে সেইরূপ ঐ সকল দৃশ্য—পাপের পরিণাম এবং যাতনার বিভীষিকা। এই সকল অলৌকিক দৃশ্য, তোমরা খেয়াল বলিতে চাও, কল্পনা বলিতে চাও, বল, কিন্তু কিছু নয় বলিও না। স্পষ্টত বিশেষ পুণ্যে বা পাপে যাহার উৎপত্তি এবং পুরস্কার বা দণ্ডদানের জন্য যে সকলের বিধান, সে গুলি কিছুই নয় কেমন করিয়া বলিব! পাপের সঙ্গে সঙ্গে তাহার দণ্ডবিধান আছে। বাঙ্কোর ঐ প্রেতমূর্ত্তি সেই দণ্ড বিধানের অঙ্গীভূত; উহা যে কিছুই নয়, তাহা কেমন করিয়া বলিব? এই সকল দৃশ্য, সকলের ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য নয় বলিয়া তোমরা যদি ঐ গুলি আধিভৌতিক (objective) নহে, বলিতে চাও, বল; কোন বিশেষ ব্যক্তির ভাল বা মন্দ আবেগ হইতে উদ্ভূত মনে করিয়া, এবং তাহারই মনের উপর সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কার্য্য করে, ইহা দেখিয়া ঐ গুলিকে আধ্যাত্মিক (subjective) বলিতে হয় বল; অথবা পাপ পুণ্যের দণ্ড পুরস্কারের দৈববিধানের অঙ্গীভূত বুঝিয়া ঐ গুলিকে আধিদৈবিক (divine dispensation) বলিতে হয় বল, কিন্তু ও গুলি যে বিশেষ কিছু, তাহা বলিতেইহইবে।

(২) যেমন হামলেটের পিতার প্রেতমূর্ত্তি। তাহা বিশেষ সময়ে বিশেষ স্থানে আবির্ভূত হয়, কথা কহে, চোখ রাঙ্গায়, হাতছানি দিয়া ডাকে. নিভৃতেআলাপ করে এবং এ গুলি সকলেই দেখিতে পায়। ইহাকে যদি আধিভৌতিক না বলিবে, তবে তোমার আমার ভিতরেও আধিভৌতিকতা নাই। এইরূপ ভূতের ব্যাপার ও ব্যাখ্যা হামলেট নাটকের সমালোচনায় আমাদিগকে সবিস্তারে বলিতে হইবে; এখন কেবল একটী কথা বলিয়া রাখি; এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান ভূতই আবার তৃতীয় অঙ্কের চতুর্থ দৃশ্যে হামলেটের মাতার ইন্দ্রিয়গোচর নহে; তিনি সে ভূত দেখিতে পান না—তাহার কথাও শুনিতে পান না—কেন এই রূপ হইয়াছে, তাহা সেই স্থলে বুঝিবার চেষ্টা করা যাইবে।

এই দুই প্রকারের মধ্যবর্ত্তী আর এক রূপ ব্যাপারও শেক্সপীয়রে দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন ম্যাকবেথ নাটকের ডাকিনীগুলা—আমরা বলিয়াছি, সে গুলা মূর্ত্তিমতী দুরাকাঙ্ক্ষা। আর ম্যাকবেথ ও বাঙ্কো সমধর্ম্মী বলিয়াই, তাহাদের ইন্দ্রিয়গোচর হইয়াছিল, কিন্তু তাহাদের ভবিষ্যদ্বাণীও কি কেবল দুরাকাঙ্ক্ষার ফল,? তাহা কে বলিবে?

উহাদের মুখ নিঃসৃত ভবিষ্যদ্বাণীর কথা ভাবিলে, ঐ গুলাকে কিয়ৎ পরিমাণে দৈবশক্তি সম্পন্ন বলিয়াই বোধ হয়; এবং সে হিসাবে উহারা আধিদৈবিক পদার্থ বলা যাইতে পারে। এইরূপ শ্রেণী বিভাগে ভূতপ্রেতিনী তিন রূপ হইল—সেই সাবেক দার্শনিক বিভাগ—আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক। এইরূপ দার্শনিক নাম করণ হইল বলিয়া কেহ যেন মনে না করেন, যে যাহাকে আমরা আধ্যাত্মিক ভূত বলিতেছি, তাহাতে আধিভৌতিকতা নাই, অথবা আধিভৌতিক ভূতে আধ্যাত্মিকতা নাই। সকল ভূতই দেখা যায়, বা দেখা না গেলেও তাহাদের কথা শুনা যায়, সুতরাং সে হিসাবে সকল ভূতই আধিভৌতিক। অমনই করিয়া বুঝিলে, সকল ভূতই আধ্যাত্মিক এবং হয়ত আধিদৈবিকও হয়। বিশেষ প্রকৃতি দেখিয়া নাম করণ হয়—সামান্য ভাবে সকলই এক—পৃথক্ নাম করণ হয় না। বারাসতের শ্রীযুক্ত কালিকৃষ্ণ মিত্র একটি আধ্যাত্মিক লোক বলিলে এমন বুঝায় না যে তাঁহার ভৌতিক দেহ নাই—এই বুঝায় যে আধ্যাত্মিকতা তাঁহাতে খুব বেশী। ভাষার ব্যবহার এই রূপেই হইয়া থাকে।

শেক্সপিয়ারের আধিভৌতিক ভূতের ব্যাখ্যা শেক্সপিয়র স্বয়ং করিয়াছেন—আমাদিগের মত পাণ্ডিত্যাভিমানী ভূয়োদর্শন-বিহীন মূর্খদিগের জন্য। সে এক বড় বিচিত্র মুন্সীয়ানা। নাটকের ঘটনা স্রোত চলিয়াছে—তাহাতে নাটকোপযোগী চরিত্র গঠিত হইতেছে,—আর এই মহা নাটকের মহোপকরণ আধিভৌতিক ব্যাপারের অল্প অল্প ব্যাখ্যা হইতেছে—অথচ ব্যাখ্যা যে চলিয়াছে তাহা ধরা যায় না।

সকল ব্যাখ্যার সার কথা প্রথমাঙ্কের শেষ ভাগে আছে;—

There are more things in Heaven and earth, Horatio,
Than are dreamt of in your philosophy.

স্বর্গে মর্ত্তে কত বস্তু দেখ বিদ্যমান,
স্বপ্নেও বিজ্ঞান তার না পায় সন্ধান।

যে philosophy, দর্শনই বল, আর বিজ্ঞানই বল, যে অপরা বিদ্যাকে লক্ষ্য করিয়া ঐ কথা বলা হইয়াছে, আমাদের মত লোকে যাহারা সেই বিদ্যার অভিমানী, তাঁহাদের পক্ষে মহাদার্শনিক শেক্সপিয়রের ঐ গভীর উপদেশ নিত্য জপের মন্ত্র হওয়া উচিত। সমস্ত অপরা বিদ্যাই মোহজড়িত, অভিমানের আশ্রয়স্থলী, অহঙ্কারের সরণি। তাহার উপর য়ুরোপীয় নীতি মিশ্রিত য়ুরোপীয় দর্শনবিদ্যা, অভিমানের, অহঙ্কারের, বাচালতার, চঞ্চলতার মায়াময়ী ধাত্রী। আমরা এই ধাত্রীর নিকট নাই পাইয়া, এখন এমনই বিগড়িয়া উঠিয়াছি, যে এখন স্বয়ং মাতা ক্রোড়ে করিতে চাহিলে, তাঁহার কাছে যাইতে চাহি না, ধাই মায়ের গলা জড়াইয়া কাঁদিতে থাকি, মাকে গালি দি, পা ছুড়িয়া মারিতে যাই। কিন্তু মার চেয়ে যে ভালবাসে তারে বলি ডাইন। এই ডাইনের ক্রোড় হইতে আমাদিগকে ক্রমে সরিয়া পড়িতে হইবে। কিন্তু যেমন ডাইন তাহার তেমনই ওঝা যাই। য়ুরোপীয় দর্শনের মায়া মোহ, য়ুরোপীয় কাব্য নাটকের গভীর উপদেশে, বোধ হয় কিছু কমিতে পারে। বোধ হয়, পাঠক এতদিনে ধরিতে পারিয়াছেন, যে শেক্স-পিয়রের নাটকের উপলক্ষ্য করিয়া, আমরা বিলাতী ওঝার সাহায্যে বিলাতী ডাইনের হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার চেষ্টায় আছি। চেষ্টাটা যদি ভাল হয়, আমাদের বিশ্বাস, তাহাতে কখন না কখন ভাল ফল ফলিবেই।

আপাতত সেক্সপিয়রের ঐ মূলমন্ত্র মনে রাখিলে আমরা য়ুরোপীয় দর্শনবিদ্যা রূপিনী ডাইনীর রক্ত শোষণ হইতে কথঞ্চিৎ রক্ষা পাইতে পারি।

মন্ত্রটি আবার বলি;—

স্বর্গে মর্ত্তে কত বস্তু দেখ বিদ্যমান,
স্বপ্নেও বিজ্ঞান তার না পায় সন্ধান।

নবজীবন।

৫ম ভাগ। ভাদ্র ১২৯৬ সাল। ১২শ সংখ্যা।

পাতঞ্জল যোগসূত্রম্।

বিতর্ক বাধনে প্রতিপক্ষভাবনং ॥ ৩৩ ॥

পদচ্ছেদঃ। বিতর্ক—বাধনে, প্রতিপক্ষ ভাবনং।

পদার্থঃ। বিতর্ক্যন্তে ইতি বিতর্কাঃ হিংসাদয়ঃ, তৈর্বাধনে সতি প্রতিপক্ষ-ভাবনং উত্তরসূত্রে বক্ষ্যমাণং।

অন্বয়ঃ। বিতর্ক বাধনে (সতি) প্রতিপক্ষভাবনং কুর্য্যাদিতি শেষঃ।

ভাবার্থঃ। যদা বিতর্কা হিংসাদয়ো বাধেরন্ তদা বক্ষ্যমাণরীত্যা প্রতিপক্ষভাবনং কুর্য্যাৎ।

অনুবাদ। হিংসাদি বিতর্ক দ্বারা বাধা উপস্থিত হইলে, পর সূত্রোক্ত প্রতিপক্ষভাবন করিবে।

সমালোচন। যখন যোগার্থীর হিংসাদি দ্বারা বাধা উপস্থিত হয় অর্থাৎ যখন তাহার মনে হয় আমি অবশ্যই আপনার স্বার্থ সিদ্ধির জন্য জীবহত্যা করিব, মিথ্যা কথা বলিব, পরের দ্রব্য অপহরণ করিব, পরস্ত্রীর সহিত ব্যভি-চার করিব, পরের নিকট হইতে উত্তম উত্তম ভোগ্য বস্তু গ্রহণ করিব, "পরের ধনে বরের বাপ" হইয়া বসিব,—এইরূপে যখন অত্যন্ত প্রবল হিংসাদির মোহিনী শক্তি দ্বারা চিত্ত বিমোহিত হওয়ায় উন্মার্গগমনে প্রবৃত্তি হইতে থাকে,

তখন আত্মরক্ষার্থ হিংসাদির প্রতিপক্ষের চিন্তা করিবে অর্থাৎ তখন মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিবে যে, "ওঃ আমি কি নরাধম! আমি এই ঘোর সংসারাগ্নিতে দগ্ধ হইয়া হিংসাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক সর্ব্বভূতের অভয়প্রদ যোগধর্ম্মের শরণ লইয়াছি, আজ আবার হিংসাদিকে ভাল বিবেচনা করিয়া তাহাদের সেবায় প্রবৃত্ত হইয়াছি! তবে আমাতে আর কুক্কুরে ভেদ কি? কুক্কুরেরা যেমন উদ্গার করিয়া উদ্গীর্ণ বস্তুর পুনঃ আস্বাদন করে, আমার এই কার্য্যটি ঠিক সেইরূপ হইতেছে।" মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিলে প্রতিপক্ষ ভাবন হয়। অথবা প্রতিপক্ষভাবন কিরূপে হয়, তাহা গ্রন্থকার স্বয়ং পরসূত্র দ্বারা ব্যক্ত করিতেছেন।

বিতর্কা হিংসাদয়ঃ কৃতকারিতানুমোদিতা লোভক্রোধ-মোহপূর্ব্বকা মৃদুমধ্যাধিমাত্রা দুঃখাজ্ঞানানন্তফলা ইতি প্রতি-পক্ষভাবনম্। ৩৪ ॥

পদচ্ছেদঃ। বিতর্কাঃ, হিংসাদয়ঃ, কৃতাঃ-কারিতা-অনুমোদিতাঃ, লোভ-ক্রোধ-মোহপূর্ব্বকাঃ, মৃদু-মধ্য-অধিমাত্রাঃ, দুঃখ-অজ্ঞান-অনন্তফলা, ইতি প্রতিপক্ষভাবনং।

পদার্থঃ। বিতর্কাঃ বিতর্কশব্দপ্রতিপাদ্যাঃ কে তে ইত্যাহ হিংসাদয়ঃ হিংসা আদির্যেষাং তে, তেহি ত্রিবিধাঃ কৃতাঃ, স্বয়ংকৃতাঃ, কারিতাঃ প্রয়োজকভাবেন, নিষ্পাদিতাঃ, অনুমোদিতাঃ অন্যেন ক্রিয়মাণাঃ সাধুসাধ্বিত্যঙ্গীকৃতাঃ, লোভ-স্তৃষ্ণা, ক্রোধঃ কৃত্যাকৃত্যাবিবেকোন্মূলক জ্বলনাত্মকশ্চিত্তস্য ধর্ম্ম-বিশেষঃ, অজ্ঞানং, মোহঃ তৎপূর্ব্বিকাঃ তৎকারণকাঃ, মৃদবোমন্দাঃ, মধ্যা ন মন্দা ন তীব্রা, অধিমাত্রা তীব্রা, তথা দুঃখাজ্ঞানাস্ত্বর্ফলা, দুঃখং প্রতিকূলতয়া বেদনীয়োরাজসশ্চিত্তধর্ম্মঃ অজ্ঞানং ভ্রান্তিঃ, তএব অনন্তংর্ফলং যেষাং তে, ইতি অনেন প্রকারেণ প্রতিপক্ষভাবনং বিপরীত চিন্তা।

অন্বয়ঃ। কুর্য্যাদিতি শেষঃ।

অনুবাদ। বিতর্ক হিংসাদি, তাহারা তিন প্রকার স্বয়ংকৃত, অন্যদ্বারা কারিত এবং অনুমোদিত, লোভ, ক্রোধ এবং মোহ এই তিন প্রকার কারণ হইতে উৎপন্ন, তাহাদের প্রকারও ত্রিবিধ মৃদু, মধ্য এবং তীব্র; তাহাদের

ফল অনন্ত দুঃখ এবং অনন্ত অজ্ঞান;—এইরূপে চিন্তা করত হিংসাদি হইতে নিবৃত্ত হইয়া অহিংসাদির স্মরণের নাম প্রতিপক্ষভাবন।

সমালোচন। প্রতিপক্ষ ভাবন—বিরোধীর চিন্তা; যখন হিংসাদি আসিয়া চিত্তকে অধিকার করিবে, তখন হিতার্থী ব্যক্তি উহাদিগের হাত হইতে রক্ষা পাইবার নিমিত্ত উহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া উহাদের বিপক্ষের স্মরণ করিবে। কোন বস্তু পরিত্যাগ করিতে হইলে তাহার দোষ দর্শন করিতে হয়, বস্তুর দোষ দর্শন করিলে তাহার উপর বিরক্তি হয় কাযেই সহজে উহা পরিত্যাগ করা যায়। এই নিমিত্ত প্রথমে চিন্তা করিবে, হিংসাদি কত রকমে হইতে পারে, তাহার পর ঐ হিংসাদিই বা কত প্রকার, তাহার পর উহাদের কারণ বা মূল কি? পরিশেষে তাহাদের ফলের বিষয় চিন্তা করিবে। এইরূপ চিন্তায় যদি তাহারা হেয় বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, তবে তাহাদের বিপক্ষের চিন্তন সহজেই হইয়া উঠে। হিংসাদি সামান্যত স্বহস্তে অনুষ্ঠান, পরকে প্রেরণ, অথবা অপরের হিংসাদির অনুমোদন—এই তিন রকমে হইতে পারে, কেবল নিজে মাছ ধরিলে যে হিংসা হইবে তা নয়, জেলের দ্বারা মাছ ধরাইলেও হিংসা হইবে, অথবা কাহাকে একটা বড় মাছ ধরিয়া তুলিতে দেখিয়া সাবাস বলে বাহবা দিলেও হিংসা হইবে। হিংসাদির প্রকারও ত্রিবিধ—মৃদু (অল্প), মধ্য এবং অধিমাত্র (অধিক বা তীব্র)। কেহ কেহ বলেন ইহাদের প্রত্যেকে আবার মৃদু, মধ্য, অধিমাত্র, ভেদে তিন প্রকার অর্থাৎ মৃদু মৃদু, মৃদুমধ্য, মৃদু অধিমাত্র, মৃদুমধ্য, মধ্য মধ্য, অধিমাত্র মধ্য, মৃদু অধিমাত্র, মধ্য অধিমাত্র এবং অধিমাত্র অধিমাত্র। ফল কাল দেশ, পাত্র অনুসারে কার্য্যমাত্রেরই অবস্থা নানাবিধ হইতে পারে। এক্ষণে দেখ ঐ হিংসাদি যে রকমেই অনুষ্ঠিত হউক, আপনার দ্বারা, পরের দ্বারা, অথবা অনুমোদন করিয়া, ইহারা কখন সদভিপ্রায় মূলক নহে; উহারা নয় লোভমূলক, নয় ক্রোধ মূলক, না হয় অজ্ঞান মূলক; যেখানে হিংসা, মিথ্যা-কথা, পর-দ্রব্য-অপহরণ ইত্যাদি কার্য্য অনুষ্ঠিত হইতে দেখিবে, সেই খানেই জানিবে, সেই সেই কার্য্যের অনুষ্ঠাতা হয় প্রবল বিষয় তৃষ্ণায় অভিভূত হইয়া, কিম্বা অত্যন্ত প্রদীপ্ত ক্রোধে অধীর হইয়া, না হয় ঘোর অজ্ঞানে অভিভূত হইয়া, ঐরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেছেন। তিনি কখন সৎ অভিপ্রায় বা বৃত্তির বশীভূত হইয়া এরূপ কার্য্যের

অনুষ্ঠান করিতেছেন না। একণে দেখা গেল, যখন নিন্দনীয় লোভাদি বৃত্তির বভূশীত মনুষ্যই হিংসাদির অনুষ্ঠান করে, তখন হিংসাদিও নিন্দনীয় কার্য্য সে বিষয় সন্দেহ নাই। দেখা যাউক উহাদের ফল কি? ফল অনন্ত দুঃখ এবং অনন্ত অজ্ঞান। এইরূপ আলোচনা দ্বারা হিংসাদিকে পরিত্যাগ করিয়া উহাদের প্রতিপক্ষ অহিংসাদির অনুষ্ঠান করা উচিত,—এইরূপ বিবেচনার নাম প্রতিপক্ষভাবন।

অহিংসা প্রতিষ্ঠায়াং তৎসন্নিধৌ বৈরত্যাগঃ। ৩৫ ॥

পদচ্ছেদঃ। অহিসা-প্রতিষ্ঠায়াং, তৎ-সন্নিধৌ, বৈর-ত্যাগঃ।

পদার্থঃ। অহিংসা উক্তরূপা, তস্যাঃ প্রতিষ্ঠায়াং স্থিরতায়াং সত্যাং তৎসন্নিধৌ অহিংসা প্রতিষ্ঠাসমীপে বৈরত্যাগঃ সহজকৃত্রিমোভয়বিধশক্রতা পরিহারঃ।

অন্বয়ঃ। ভবতীতি শেষঃ।

অনুবাদ। অহিংসার স্থিরতা হইলে শক্রতার উন্মূলন হয়।

সমালোচন। আমাদের চিত্তে যতক্ষণ হিংসা বৃত্তির প্রবলতা থাকে, ততক্ষণ শক্রতাও প্রবল থাকে। এমন কি বিনা কারণেও শক্রতা উৎপন্ন হয়। পরে হিংসার নিবৃত্তি হইয়া অহিংসা স্থিরতা লাভ করিলে, শক্রতা আপনা হইতেই উন্মূলিত হয়।

সত্যপ্রতিষ্ঠায়াং ক্রিয়াফলাশ্রয়ত্বং। ৩৬ ॥

পদচ্ছেদঃ। সত্য-প্রতিষ্ঠায়াং ক্রিয়া-ফল-আশ্রয়ত্বং।

পদার্থঃ। সত্যশ্চ পূর্ব্বোক্তস্বরূপস্য প্রতিষ্ঠায়াং স্থৈর্য্যে সতি ক্রিয়াধর্ম্মঃ তস্যাঃ ফলং স্বর্গাদিঃ তয়োরাশ্রয়ত্বং।

অন্বয়ঃ। সর্ব্বপ্রাণিনাং সত্যনিষ্ঠস্য বচনাদ্ভবতীতি শেষঃ।

অনুবাদ। সত্য স্থিরতা প্রাপ্ত হইলে ক্রিয়ার সফলতা হয়।

সমালোচন। পতঞ্জলির ভাষ্যকার এবং বৃত্তিকার (ভোজরাজ) এই সূত্রের ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা করেন। আমরা ভাষ্যকারের ব্যাখা অনুসারে পদার্থাদি দেখাইলাম; ভাষ্যকার বলেন, সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তির বাক্য অনুসারে লোক ক্রিয়া বা তাহার ফল প্রাপ্ত হয়; তিনি যাহাকে বলেন, 'তুমি ধার্ম্মিক হও' অমনি সে

ধার্ম্মিক হয়, তিনি যাহাকে বলেন 'তুমি ধর্ম্মের ফল স্বর্গাদি প্রাপ্ত হও' অমনি সে স্বর্গাদি প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তির বাক্য অব্যর্থ হয়। বৃত্তি-কার বলেন ক্রিয়া শব্দের অর্থ যজ্ঞাদি, তাহার ফল স্বর্গাদি সত্যনিষ্ঠ মনুষ্য নিজে কোন কার্য্য না করিলেও, তাহার ফল প্রাপ্ত হয়।

আমরা বলি, এখানে যদি ক্রিয়া শব্দের অর্থ বাক্য উচ্চারণ ক্রিয়া ব ল যায় তাহা হইলে অর্থটি অতি বিশদ হয় অর্থাৎ তাহার বাক্য উচ্চারণ ক্রিয়া ফলবতী হয়, সে যাহা বলে তাহাই সিদ্ধ হয়। ভাষ্যকারও পরিশেষে, এইরূপ ব্যাখ্যা যে তাঁহার সম্মত, তাহার আভাসও দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন "অমোঘা চাস্য বাগ্‌ভবতীতি।" তাহার বাক্য অব্যর্থ হয়। আর এইরূপ ব্যাখ্যা অপেক্ষাকৃত সঙ্গত, কারণ সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তির বাক্যের সফলতা লাভই মুখ্য ফল; তবে সফলতা জন্য ধার্ম্মিকতা বা স্বর্গাদি লাভ নিজের ও পরেরও হইতে পারে। তিনি ক্রিয়া অনুষ্ঠান ব্যতীত নিজের বা পরের জন্য যেরূপ ফল কামনা করিবেন, তাহাই সিদ্ধ হইবে।

অস্তেয় প্রতিষ্ঠায়াং সর্ব্ব রত্নোপস্থানম্‌। ৩৭ ॥

পদচ্ছেদঃ। অস্তেয় প্রতিষ্ঠায়াং, সর্ব্ব রত্ন উপস্থানম্‌।

পদার্থঃ। অস্তেয়স্য উক্ত রূপস্য প্রতিষ্ঠায়াং স্থৈর্য্যে সতি সর্ব্বেষাং রত্না-নাং উপস্থানং উপস্থিতির্ভবতি। অথবা সর্ব্বাভ্যাদিগ্‌ভ্যো রত্নান্যস্যোপ তিষ্ঠন্তে ইতি সর্ব্ব রত্নোপস্থানং।

অন্বয়ঃ। ভবতীতিশেষঃ।

অনুবাদ। অস্তেয় স্থিরতা লাভ করিলে, সকল দিক্‌ হইতে রত্নেরা আপনিই উপস্থিত হয়।

সমালোচন। কি ভাষ্যকার কি বৃত্তিকার, সকলেই এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন;—অভ্যাস বশত যোগী যখন অস্তেয়ে স্থিরতা লাভ করেন, আর কখনই স্তেয়ের দিকে তাঁহার মন ধাবিত হয় না, তখন তাঁহার নিকট সকল দিক্‌ হইতে রত্ন সকল আসিয়া উপস্থিত হয়। বাস্তবিক কি তাই? আমাদের বোধ হয়, ইহা একটু রূপকে বলা হইয়াছে; অস্তেয়ের দিকে মন না যাওয়া—এক প্রকার তৃষ্ণা শূন্য হওয়া; কারণ যতক্ষণ বিষয় তৃষ্ণা বলবতী থাকিবে, ততক্ষণ

ছলে বলে কৌশলে, কোন না কোন রূপে, পরের বস্তু আত্মসাৎ করিতে ইচ্ছা হয়ই হয়। আমরা ইহা স্বচক্ষে দেখিয়াছি, একজন পরম ধার্ম্মিক বলিয়া প্রসিদ্ধ লোকের আমাদের একটা জমির পার্শ্বে খানিকটা ভূমি আছে। তিনি নিজের ভূমি খণ্ডে সর্ব্ব ভূত হিতার্থে একটি জলাশয় খনন করিতে অভিলাষী হইয়া, আমাদিগকে বলেন, যে ঐ পুষ্করিণী হইতে যে মাটী উঠিবে তাহা তোমাদিগের ভূমিতে নিঃক্ষেপ করিলে, তোমাদিগের ভূমির উৎপাদনী শক্তির বৃদ্ধি হইবে ; আমরা তাহাতে সম্মত হইলাম এবং ঐ কার্য্যের সুবিধার জন্য উভয় ভূমির মধ্যস্থিত বেড়া উঠান আবশ্যক হওয়ায় তাহাও উঠান হইল। তিনিও কিছু মাটী ফেলিলেন বটে, তাহা আবার নিজের প্রয়োজন বশত উঠাইয়া লওয়াও হইল; তবে উভয় জমীর সীমা নির্দ্দেশ চিহ্ন গুলি একেবারে বিলুপ্ত রহিল। কাযেই মধ্যস্থিত বেড়া, যাহা তিনি নিজেই দিয়া ছিলেন পুনর্ব্বার দেওয়া হইল, তখন আমরা স্পষ্টই বুঝিলাম যেন উহা ঠিক্ মধ্যস্থলে দেওয়া হইল না, ৩,৪ অঙ্গুলি আমাদের স্কন্ধে চাপিল। আমরা বিশ্বাস করি, তিনি স্তেয় করিবার লোক নন এবং ইচ্ছা পূর্ব্বক যে আমাদের ঐ ৪ অঙ্গুলি জমী অপহরণ করিয়াছেন, তাহাও নহে, তবে প্রবল বিষয় তৃষ্ণার অনুরোধে এইরূপ ভ্রম ঘটিয়াছে। বিষয় তৃষ্ণা থাকিতে স্তেয়ের হাত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া দুষ্কর। স্তেয়ের নিবৃত্তি হইলে বিষয় তৃষ্ণারও নিবৃত্তি হয়। তৃষ্ণা নিবৃত্তি হইলে সন্তোষ। সকল দিক্ হইতে সকল প্রকার রত্ন সর্ব্বদা হস্তে আসিলে, যেরূপ আনন্দ, তৃষ্ণা নিবৃত্তি জন্য সন্তুষ্ট চিত্তের বরং তদপেক্ষা অধিক আনন্দ। তাই সূত্রকার এখানে রূপক করিয়া বলিলেন, অস্তেয়ের স্থিরতা হইলে, সকল দিক্ হইতে রত্নের উপস্থিতি হয়। এই সূত্রের এইরূপ অভিপ্রায়ও প্রকাশ করা যাইতে পারে, যে যাহারা স্তেয় হইতে একেবারে নিবৃত্ত, তাহাদের দ্বারা আর প্রবঞ্চনা বা প্রতারণা হইবার ভয় নাই। তাহারা সকলের বিশ্বাস পাত্র হয়, সকলেই সকল প্রকার ধন তাহাদের নিকট গচ্ছিত রাখে। এরূপ নানাবিধ ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। যাহা হৌক রূপক অর্থ যে সর্ব্বাপেক্ষা রুচি কর এবং যুক্তি সঙ্গত সে বিষয় কোন সন্দেহ নাই। কারণ স্তেয় পরায়ণ প্রবল তৃষ্ণায় অভিভূত হইয়া সর্ব্বদা সকল দিক্ হইতে সকল প্রকার উপায় দ্বারা সর্ব্ববিধ

বস্তু আত্মসাৎ করিতে কামনা করিতে ছিল। তাহার সঙ্কল্প পৃথিবীর যাবতীয় বস্তু আত্মসাৎ করিতে পারিলেই সুখ লাভ হইবে। স্তেয় হইতে একেবারে নিবৃত্তি হইলে, তাহার সেই কামনানল একেবারে নির্ব্বাপিত হয়, সকল দিক্ হইতে সকল প্রকার রত্নের যুগপৎ সমাগম হইলে, যে আনন্দ হইত, কামনার নিবৃত্তিতে ও সেই রূপ আনন্দ হয়।

ব্রহ্মচর্য্য প্রতিষ্ঠায়াং বীর্য্যলাভঃ। ৩৮॥

পদচ্ছেদঃ। ব্রহ্মচর্য্য প্রতিষ্ঠায়াং, বীর্য্য লাভঃ।

পদার্থঃ। উক্ত রূপচ ব্রহ্মচর্য্যাচ প্রতিষ্ঠায়াং স্থৈর্য্যে সতি বীর্য্যশ্চ সামর্থ্যশ্চ তয়োলাভঃ প্রাপ্তিঃ।

অন্বয়ঃ। ভবতীতি শেষঃ।

ভাবার্থঃ। যঃ কিল ব্রহ্মচর্য্যং অভ্যস্যতি তস্য তৎ প্রকর্ষান্নিরতিশয়ং বীর্য্যং শক্তি বিশেষঃ আবির্ভবতি। ইতি ভাবঃ

অনুবাদ। ব্রহ্মচর্য্যের স্থিরতা হইলে বীর্য্যোৎকর্ষ উৎপন্ন হয়।

সমালোচন। ব্রহ্মচর্য্য পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। যে কার্য্যে বীর্য্য ক্ষয়ের অবরোধ হয়, তাহার নাম ব্রহ্মচর্য্য। বীর্য্যই মনুষ্যের মনুষ্যত্ব সম্পাদক। বীর্য্যই শারীরিক শক্তির পুষ্টি করে এবং মানসিক জ্ঞানের উন্নতি করে। এই জন্য ভাষ্যকার বলেন, ব্রহ্মচর্য্য স্থির হইলে বীর্য্য লাভ হয়। ঐ বীর্য্য আমাদের জ্ঞান ও ক্রিয়া শক্তির উৎকর্ষ সাধন করে। ব্রহ্মচারী যে নিজেই জ্ঞানী হন এমন নহে, তিনি নিজের দৃষ্টান্তে অপরকেও জ্ঞানী করেন। এ কথা সহৃদয় মাত্রেই জ্ঞাত আছেন সুতরাং অধিক আলোচনার আবশ্যক নাই। তবে এই টুকু বলা আবশ্যক ব্রহ্মচারী বলিতে হঠাৎ যে কষায় বস্ত্র পরিধানে দাড়ি গোঁপধারী, রুক্ষ কেশ, খড়ম পেয়ে, চিমটা হস্তে এইরূপ একটা বিকটাকার মানুষ মনে হইতে পারে, এখানে তাহাদের কথা বলা হয় নাই। এখানে বাহ্যাড়ম্বর শূন্য, বিনম্র, বিনয়ী ও জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিকে ব্রহ্মচারী বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

অপরিগ্রহ স্থৈর্য্যে জন্ম কথন্তাসম্বোধঃ। ৩৯॥

পদচ্ছেদঃ। অপরিগ্রহ-স্থৈর্য্যে, জন্মকথন্তা-সম্বোধঃ।

পদার্থঃ। উক্ত পূর্ব্বস্য অপরিগ্রহস্য স্থৈর্য্যে স্থিরতায়াং সত্যাং কথমিত্যস্যভাবঃ কথন্তা, জন্মনঃ পূর্ব্বজন্মনঃ কথন্তা তস্যাঃ সম্বোধঃ সম্যগ্ জ্ঞানং।

অন্বয়ঃ। ভবতীতি।

ভাবার্থঃ। অপরিগ্রহাভ্যাসবন্তো জন্মান্তরে কোঽমাসং কীদৃশঃ ইত্যাদি জিজ্ঞসায়াং সর্ব্বমেব প্রতিভাতং ভবতি। ইতিভাবঃ।

অনুবাদ। অপরিগ্রহের স্থিরতা হইলে পূর্ব্ব জন্মের অবস্থাদির বিষয় সম্যক্ উদ্বোধ হয়।

সমালোচন। ভাষ্যকার বলেন অপরিগ্রহের স্থিরতা হইলে, কেবল পূর্ব্ব জন্মে আমি কিরূপ ছিলাম, কেনইবা ছিলাম, সেইরূপ জ্ঞান হয় এমন নহে, বর্ত্তমান জন্মে কি হইয়াছি এবং কেনইবা এরূপ হইয়াছি, ভবিষ্যতে কি হইব কেনই বা সেরূপ হইব, এসকল বিষয়েরও সম্যক্ জ্ঞান হয়। কেন যে ওরূপ হয়, সে কথা তিনিও বলেন নাই, আমরাও বুঝি নাই সুতরাং এ সূত্রের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায় আমরা অপারগ হইলাম। তবে বিজ্ঞান ভিক্ষু বলেন চিত্ত যদিও স্বভাবত সর্ব্বার্থগ্রহণে সমর্থ, তথাপি পরিগ্রহ সঙ্গবশত উহার সে শক্তি থাকেনা। পরিগ্রহের নিবৃত্তি হইলে পুনর্ব্বার সেই শক্তির যোগ হয়। ফল যাচ্ঞা করিয়া হউক, অমনিই হউক, দান গ্রহণ করিলে চিত্তের যে কিয়ৎপরিমাণে সঙ্কোচ হয়, ইহা আমরা বুঝিতে পারি, দান গ্রহণ না করিলে চিত্তের যে স্ফূর্ত্তি থাকে, তাহাও বুঝিতে পারি, এতদ্ভিন্ন আমরা আর কিছুই বুঝিতে পারি না।

যমের কথা বলা হইল এক্ষণে নিয়মের কথা বলিতেছেন।

শৌচাৎ স্বাঙ্গজুগুপ্সা পরৈর সংসর্গঃ। ৪০॥

পদচ্ছেদঃ। শৌচাৎ, স্ব-অঙ্গ-জুগুপ্সা, পরৈঃ, অসংসর্গঃ।

পদার্থঃ। শৌচাৎ পূর্ব্বোক্তরূপাৎ স্বস্ব অঙ্গেষু অবয়বেষু জুগুপ্সা ঘৃণা তথা পরৈঃ অন্যৈশ্চ কায়বদ্ভিঃ অসংসর্গঃ সম্পর্কাভাবঃ সংসর্গপরিবর্জ্জনমিতিযাবৎ।

অন্বয়ঃ। ভবতীতি শেষঃ।

ভাবার্থঃ। যঃ কিলশৌচং অভ্যস্যতি স স্বমেবকায়ং জুগুপ্সতে তদ্বদবদ্য দর্শনাৎ পরকীয়ৈস্তমাভূতৈঃ কায়ৈঃ সংসর্গমনুভবেৎ, ইতি ভাবঃ!

অনুবাদ। শৌচ অভ্যাস হইলে, আপনার অঙ্গে ঘৃণা হয় এবং পরের সঙ্গে সংসর্গ করিতে ইচ্ছা হয় না।

সমালোচন। সহৃদয়মাত্রেই অনুভব করিয়া থাকেন, যখন আমরা গাত্র মার্জ্জন পূর্ব্বক সমুদয় শারীরিক মল প্রক্ষালন করণান্তর স্নান করিয়া ধৌতবস্ত্র পরিধান করি এবং পবিত্র স্থানে বাস করি, তখন মনে স্ফূর্ত্তি হয়, বিকাশ হয় এবং এক প্রকার অনির্ব্বচনীয় আনন্দের অনুভব হয়। আর যখন আমাদের শরীর মলযুক্ত থাকে, চোখে পিঁচুটি, মুখে লাল, গায়ে ফোঁড়া,তাদিয়ে হয়ত রসগড়ায়, কাল কাপড় পরিধান করিয়া অপবিত্র স্থানে বাস করি, তখন মন স্ফূর্ত্তি হীন, মলিন এবং এক প্রকার দুঃখ অনুভব করে। যে ব্যক্তি সর্ব্বদা শৌচের অভ্যাস করে, তাহার শৌচেই আনন্দ; সে ক্ষণকালের জন্যও অল্পমাত্র অশুচি হইতে বা অশুচি বস্তু দেখিতে ভালবাসে না। সুতরাং তাহার নিজের শরীরের উপর ঘৃণা হয়, কারণ মনুষ্য শরীরের নাম পুদ্গল, উহাকে হাজার ধৌত কর, হাজার পবিত্র কর, ক্ষণকাল অতীত হইতে না হইতে, উহা আপনা হইতেই মলিন হয়; হয় কফ বাহির হইল, নয় গয়ার উঠিল, নয় খানিকটা লাল পড়িল, নয় কোন ঠাঁই দিয়া রস গড়াইল, এতদ্ভিন্ন মল, মূত্র পিঁচুটি নির্গমন ত আছেই। যাহারা শৌচের মর্ম্ম বুঝিয়াছে, শৌচের অনুষ্ঠান করিতে শিখিয়াছে, তাহাদের নিকট এরূপ শরীর কেবল ঘৃণাস্পদ হইবে না ত আর কি হইবে? এক্ষণে দেখ শৌচাভ্যাসী মনুষ্য সর্ব্বদা প্রক্ষালন ও ঘসামাজা করিয়া ও আপনার দেহের স্বাভাবিক অশুচিতা দেখিয়া তাহার উপর ঘৃণা করে ও তখন অপরের দেহ যাহা তাদৃশ নিয়মিত-রূপে মৃষ্ট বা মার্জ্জিত হয় না, তাহা দেখিয়া যে তাহার সঙ্গ হইতে দূরে থাকিতে ইচ্ছা করিবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? আমরা এখানে আর এক কথা বলিব। ভারতবর্ষে বিশেষত বঙ্গদেশে কতগুলি লোক 'শুচিবেয়ে'। তাহা-দিগকে বাস্তবিক শুচি বলিয়া গণনা করা যাইতে পারে না; কারণ তাহারা শুচি হইব এই বাতিক বশত কখন শুচি বস্তুকে অশুচি করে এবং অশুচি বস্তুকেও শুচি বলিয়া বিবেচনা করে; ফল, তাহারা বাস্তবিক শুচি বা

বাস্তবিক অশুচি কাহাকে বলে, তাহা জানে না; কেবল শুচি হইব এইরূপ বাতিক বশে চালিত হয় মাত্র।

শৌচা ভ্যাস করিলে আর আর কি কি হয় তাহা সূত্রকার বলিতেছেন।

সত্ত্বশুদ্ধি সৌমনস্যৈকাগ্রেন্দ্রিয় জয়াত্মদর্শন যোগ্যত্বানি।৪১॥

পদচ্ছেদঃ। সত্ত্ব, শুদ্ধি, সৌমনস্য, ঐকাগ্র্য, ইন্দ্রিয়, জয়, আত্মদর্শন, যোগ্যত্বানি।

পদার্থঃ। সত্ত্বং প্রকাশসুখাদ্যাত্মকং তস্য শুদ্ধিঃ রজস্তমোভ্যামনভিভবঃ। সৌমনস্যং খেদানমুভবেন মানসী প্রীতিঃ। ঐকাগ্র্যং নিয়তেন্দ্রিয়বিষয়ে চেতসঃ স্থৈর্য্যং, ইন্দ্রিয়জয়ঃ বিষয়-পরাঙ্মুখীকৃতানাং ইন্দ্রিয়াণাং স্বাত্মন্যবস্থানং আত্মদর্শনযোগ্যত্বং আত্মদর্শনে বিবেকখ্যাতিরূপে যোগ্যত্বং সত্ত্বশুদ্ধিশ্চ, সৌমনস্যঞ্চ, ঐকাগ্র্যঞ্চ, ইন্দ্রিয়জয়শ্চ, আত্মদর্শনযোগ্যত্বঞ্চেতি দ্বন্দ্বঃ।

অন্বয়ঃ। ক্রমেণ ভবন্তীতি বাক্য শেষঃ।

ভাবার্থঃ। শৌচাভ্যাসবশত এতে সত্ত্বশুদ্ধ্যাদয়ঃ ক্রমেণ প্রাদুর্ভবন্তি। তথাহি শৌচাত্ সত্ত্বশুদ্ধিঃ, সত্ত্বশুদ্ধেঃ সৌমনস্যং, সৌমনস্যাদৈকাগ্রং, ঐকাগ্র্যাদিন্দ্রিয়জয়ঃ ইন্দ্রিয়-জয়াদাত্মদর্শনযোগ্যত্বং ইতি। কচিদৈকাগ্র্য মিত্যত্র একাগ্রতেতি পাঠঃ।

অনুবাদ। শৌচ হইতে যথাক্রমে সত্ত্বশুদ্ধি, সৌমনস্য, ঐকাগ্র্য, ইন্দ্রিয়জয় এবং আত্মদর্শনে যোগ্যত্ব হইয়া থাকে।

সমালোচন। আমরা পূর্ব্বে দুইপ্রকার শৌচ বলিয়াছি, বাহ্য এবং আন্তর; উহাদের মধ্যে বাহ্য শৌচ আন্তর শৌচের উৎকর্ষকারকমাত্র, ঠিক্ সাধক নয়, কারণ বাহ্য শৌচ না থাকিলেও আন্তর শৌচ হইতে পারে। আন্তর শৌচ অভ্যাস করত চিত্তের মালিন্য দূর হইলে প্রথমে সত্ত্বশুদ্ধি হয় অর্থাৎ বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণের উদ্রেক হয়, বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণের উদ্রেক হইলে সৌমনস্য অর্থাৎ প্রীতি স্বাভাবিক একটি সদানন্দত্ব উৎপন্ন হয়; ঐ আনন্দ উৎপন্ন হইলে চিত্তের ঐকাগ্র্য অর্থাৎ একাগ্রতা হয়। আমাদের চিত্ত যে সর্ব্বদা চঞ্চল

তাহার প্রতি কারণ একমাত্র অসন্তোষ। ইহাতে সুখ হইবে, ইহাতে সুখ হইবে, এই ভাবিয়াই চিত্ত সর্ব্বদা এক বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে ভ্রমণ করে কিন্তু সেই অভিলষিত সন্তোষ কোন স্থানে পায় না, কাযেই চিত্তেরও স্থিরতা নাই, কিন্তু সন্তোষ উৎপন্ন হইলে কামনা উন্মূলিত হয় সুতরাং চিত্ত যে কোন এক বিষয়ে স্থির হইয়া থাকে। চিত্তের একাগ্রতা হইলে ইন্দ্রিয় জয় হয়; ইন্দ্রিয় সকল বিষয় হইতে পরাঙ্মুখ হইয়া নিষ্ক্রিয় অবস্থায় স্থিত হয়। ইন্দ্রিয়গণ যে স্ব স্ব বিষয় অভিমুখে ধাবিত হয়, তাহার প্রতি কারণ কামনা বা বিষয়াভিলাষ কর্ত্তৃক প্রেরণ। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি চিত্তের একাগ্রতা হইলে সে কামনা বা বিষয়াভিলাষ উন্মূলিত হয়, ইন্দ্রিয়গণ পরিচালক শূন্য হয় সুতরাং স্থিরভাব আশ্রয় করে। ইন্দ্রিয় জয় হইলে আত্মদর্শনে অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত বিবেকখ্যাতি লাভে যোগ্যতা জন্মায়; জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিই সমাধি প্রভাবে ক্রমশ প্রকৃতি ও পুরুষের স্বরূপ জানিতে সক্ষম হয়।

সন্তোষাদনুত্তমসুখলাভঃ। ৪২ ॥

পদচ্ছেদঃ। সন্তোষাৎ-অনুত্তম-সুখলাভঃ।

পদার্থঃ। সন্তোষাৎ তৃষ্ণাক্ষয়রূপস্য সন্তোষস্য উৎকর্ষাৎ অনুত্তম সুখলাভঃ; নাস্তি উত্তমং সুখং যস্মাৎ তৎ অনুত্তম সুখং তস্য লাভঃ প্রাপ্তিঃ।

অন্বয়ঃ। ভবতীতি শেষঃ।

ভাবার্থঃ। সংতোষাদ্যোগিনস্তথাবিধমান্তরং সুখমাবির্ভবতি যস্য বাহ্যং বিষয় সুখং শতাংশেনাপি সমানংন্যভবতি। তথাহি—

> যচ্চ কাম সুখং লোকে যচ্চদিব্যং মহৎ সুখং।
> তৃষ্ণাক্ষয়সুখস্যৈতে নার্হতঃ ষোড়শীং কলাম্ ॥

অনুবাদ। সন্তোষ হইতে সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম সুখলাভ হয়।

সমালোচন। বিষয় তৃষ্ণার বিরাগের নাম সন্তোষ। এই সন্তোষ উৎপন্ন চিত্তে এমনি একটি অনির্ব্বচনীয় সুখ হয় যে পার্থিব সুখেরত কথাই নাই, স্বর্গীয় সুখও তাহার ষোড়শাংশের তুল্য হয় না। কারণ, কি স্বর্গীয় সুখ, কি পার্থিব সুখ, উভয় সুখই কামনা মূলক সুতরাং তাহারা চরমসীমা প্রাপ্ত হইতে পারে না, কারণ কামনার অন্ত নাই।

কায়েন্দ্রিয়সিদ্ধির শুদ্ধিক্ষয়াৎতপসঃ। ৪৩॥

পদচ্ছেদঃ। কায়-ইন্দ্রিয় সিদ্ধিঃ অশুদ্ধি-ক্ষয়াৎ-তপসঃ।

পদার্থঃ। কায়ঃ শরীরং, ইন্দ্রিয়ং চক্ষুরাদি, কায়শ্চ ইন্দ্রিয়াণিচ তেষাং-সিদ্ধিঃ উৎকর্ষঃ, অশুদ্ধিঃ ক্লেশঃ তস্যাঃ ক্ষয়াৎ হেতোঃ, তপসঃ তপশ্চরণাৎ।

অন্বয়ঃ। তপসঃ অশুদ্ধিক্ষয়াৎ কায়েন্দ্রিয়সিদ্ধিঃ ভবতীতি শেষঃ।

ভাবার্থঃ। চান্দ্রায়ণাদি তপশ্চরণাৎ চিত্তক্লেশক্ষয়ঃ, তৎক্ষয়াদিন্দ্রিয়াণাং সূক্ষ্মব্যবহিতবিপ্রকৃষ্ট দর্শনাদি সামর্থ্যমাবির্ভবতি কায়স্য যথেচ্ছ মণুমহত্ত্বাদীনি।

অনুবাদ। তপস্যা আচরণ দ্বারা অশুদ্ধির ক্ষয় হইলে শরীর এবং ইন্দ্রিয়ের সিদ্ধি হয়।

সমালোচন। আত্মার শক্তি অতি বিস্তৃত এবং জ্ঞানও অসীম; কেবল অজ্ঞানরূপ মলদ্বারা ঐ শক্তি ও জ্ঞান আচ্ছাদিত হইয়া থাকে। চন্দ্রায়ণ প্রভৃতি ব্রতের অনুষ্ঠান আরম্ভ করিয়া ক্রমশ যত কঠোর তপস্যার আচরণ করিতে থাকে, ততই অজ্ঞানরূপ মলের ক্ষয় হইয়া আধ্যাত্মিক শক্তি ও জ্ঞানের বিকাশ হইতে থাকে, এমন কি পরিশেষে আত্মা আপন ইচ্ছামত অতি সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর এবং অতি মহৎ হইতে মহত্তর রূপ ধারণ করিতে পারে। কখন কীটাণু, কখন বা মহাবিরাট মূর্ত্তিধারণ করিতে পারে। ইহার নাম কায় বা শরীর সিদ্ধি। জ্ঞানের বিকাশ হওয়ায় ক্রমশ সর্ব্বজ্ঞত্ব জন্মে। অতি-দূরস্থিত এবং ব্যবহিত বস্তুর দর্শন শ্রবণাদি হইতে ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান যাহা কিছু ঘটিয়াছে, ঘটিবে বা ঘটিতে পারে, তাহা সকলই নখ দর্পণের মত প্রত্যক্ষ হয়; ইহার নাম ইন্দ্রিয় সিদ্ধি।

স্বাধ্যায়দিষ্টদেবতা সম্প্রয়োগঃ। ৪৪॥

পদচ্ছেদঃ। স্বাধ্যায়াৎ ইষ্টদেবতা-সম্প্রয়োগঃ।

পদার্থঃ। অভীষ্ট মন্ত্র জপাদিঃ স্বাধ্যায়ঃ তস্মাৎ তদভ্যাসপ্রকর্ষাৎ ইষ্টা অভিমতা যা দেবতা, তাসাং সম্প্রয়োগঃ সম্যক্ দর্শনাদি সহকারিত্বং।

অন্বয়ঃ। ভবতীতি শেষঃ।

ভাবার্থঃ। স্বাধ্যায় শীলস্য ইষ্টদেবতা দর্শনাদি ভবতীতি ভাবঃ।

অনুবাদ। স্বাধ্যায় অভ্যাস করিলে অভীষ্ট দেবতার সাক্ষাৎকারাদি লাভ হয়।

সমালোচন। স্বাধ্যায় শব্দে মন্ত্রের জপ বা নিয়মিত পাঠ প্রভৃতি অভ্যাস বলে। উহাতে প্রকর্ষ লাভ করিলে, যে দেবতার উদ্দেশে ঐ মন্ত্রের জপ বা নিয়মিত পাঠ করা যায়, তাহার সাক্ষাৎকার ও আপনার অভিমত কার্য্যে সহায়তা লাভ হয়। ভাষ্যকার বলেন দেবতা শব্দের অর্থ এখানে কেবল দেবতা নয় ঋষি, সিদ্ধ পুরুষ প্রভৃতিও বুঝিতে হইবে।

সমাধিসিদ্ধিরীশ্বরপ্রণিধানাৎ। ৪৫ ॥

পদচ্ছেদঃ। সমাধি-সিদ্ধিঃ, ঈশ্বর-প্রণিধানাৎ।

পদার্থঃ। সমাধিঃ উক্তলক্ষণঃ তস্য সিদ্ধিঃ আবির্ভাবঃ, ঈশ্বর প্রণিধানাৎ ঈশ্বরপ্রণিধাণক্তোক্তং।

অন্বয়ঃ। ঈশ্বর প্রণিধানাৎ সমাধিসিদ্ধি র্ভবতি ইতিশেষঃ

ভাবার্থঃ। ঈশ্বর প্রণিধাণং নাম ঈশ্বরে সর্ব্বকর্ম্ম সমর্পণং তস্মাৎ স ভগবান্ ঈশ্বরঃ প্রসন্নঃ সন্ অন্তরায়রূপান্ ক্লেশান্ পরিহৃত্য সমাধিমুদ্বোধয়তি, ইতিভাবঃ।

অনুবাদ। ঈশ্বর প্রণিধান প্রভাবে সমাধি সিদ্ধি হয়।

সমালোচন। ঈশ্বর প্রণিধান শব্দের অর্থ পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। আত্মবিস্মৃত হইয়া পরমেশ্বরে সমুদয় ভাবের সমর্পণের নাম ঈশ্বর প্রণিধান, যে ব্যক্তি এইরূপ করে তাহার উপর ঈশ্বরেরও অনুগ্রহ হয়, সেই ঈশ্বরানুগ্রহ অনায়াসে তাহার সমাধির সিদ্ধির কারণ হয়; ঈশ্বরানুগ্রহে তাহার অজ্ঞান রূপ আবরণ দূর হইয়া যায়, সে অতি দূরস্থিত ধ্যেয় বস্তুর ও প্রকৃত স্বরূপ জানিতে পারে।

প্রথম যম ও নিয়মের বিষয় বলিয়া এক্ষণে আসনের বিষয় বলিতেছেন।

স্থির সুখ মাসনম্। ৪৬ ॥

পদচ্ছেদঃ। স্থিরং সুখং, আসনম্।

পদার্থঃ। স্থিরং নিষ্কম্পং সুখং সুখকরং চ যৎ তৎ আস্যতেহ নেনেতি আসনং।

অন্বয়ঃ। আসনং স্থিরসুখং ভবতীতিশেষঃ।

অনুবাদ। আসন—স্থিরতা সম্পাদক এবং সুখকর।

সমালোচন। আসন বলিতে অবস্থানের প্রকার। ধ্যেয় বস্তুর প্রগাঢ় চিন্তার নাম যোগ। কোন চিন্তাই যাইতে যাইতে হয় না; একস্থানে অবস্থান না করিলে আর কোন বিষয় প্রগাঢ় চিন্তা হয় না; ঐ অবস্থান যতই স্থিরভাবে অর্থাৎ হস্ত পদাদি অঙ্গের বিক্ষেপ শূন্য হইবে এবং কোন পীড়া দায়ক না হইবে, ততই চিন্তার প্রগাঢ়তা বৃদ্ধি পাইবে। যেরূপ অবস্থান করিলে হস্ত পদাদি অঙ্গ ক্রিয়া শূন্য হইয়া স্থিরভাব ধারণ করে এবং কোন রূপে পীড়িত না হয় (হস্ত পদাদি অঙ্গের পীড়া হইলে দুঃখ হয়, অধিক ক্ষণ অবস্থান করা যায় না) অর্থাৎ যেরূপ অবস্থানে শরীর স্থির হয় এবং কোন রূপ ক্লেশের অনুভব হয় না, সেইরূপ অবস্থানের নাম আসন। আসন এই নিমিত্তই যোগের উপযোগী। আসন অনেক প্রকার আছে, তাহার মধ্যে ভাষ্যকার এই গুলির উল্লেখ করিয়াছেন—পদ্মাসন, বীরাসন, ভদ্রাসন, স্বস্তিক, দণ্ডাসন, সোপাশ্রয়, পর্য্যঙ্ক, ক্রৌঞ্চ নিষদন, হস্তিনিষদন, সমসংস্থান, ইত্যাদি। এস্থলে এসমুদয়ের লক্ষণ নির্দ্দেশে গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধিমাত্র হইবে এবং প্রক্রিয়া না দেখিয়া কেবল বাক্য দ্বারা উহাদের স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করা দুঃসাধ্য।

প্রযত্ন শৈথিল্যানন্ত সমাপত্তিভ্যাম্। ৪৭॥

পদচ্ছেদঃ। প্রযত্ন-শৈথিল্য-অনন্ত-সমাপত্তিভ্যাম্।

পদার্থঃ। প্রযত্নো নাম শারীরঃ ব্যাপারঃ তস্য শৈথিল্যং উপরমঃ, অনন্তে সমাপত্তিঃ চেতসস্তাদাত্ম্যতয়া অবধানং তাভ্যাং—

অন্বয়ঃ। আসনং ভবতীতিশেষঃ।

ভাবার্থঃ। যদা যদা আসনং বধ্নামীতি ইচ্ছাং করোতি তদাপ্রযত্নশৈথিল্যে সতি অক্লেশেনৈবাসনং ভবতি তথা আকাশাদিগতে অনন্তে চেৎ চেতসঃ সমাপত্তিঃ অবধানেন তাদাত্ম্যং ক্রিয়তে তদাদেহাহঙ্কারা ভাবাদাসনং দুঃখ জনকংভবতি। ইতি ভাবঃ।

অনুবাদ। শারীরিক ক্রিয়ার উপরম এবং অনন্ত বস্তুতে তদাকারে চিত্তের সন্নিবেশ এই দুইটী ক্রিয়া দ্বারা আসন সিদ্ধ হয়।

সমালোচন। শরীরের কোন রূপ ব্যাপার থাকিলে আসন হয় না, এই নিমিত্ত আসন করিতে হইলে, শরীরের ব্যাপার সকলের একেবারে নিরোধ করা আবশ্যক। শরীরের ব্যাপারের নিরোধ করিলে স্থিরভাবে কিছুকাল অবস্থান করা যায় বটে কিন্তু কিছু কাল সেইরূপে অবস্থান করিলে, হয়ত পা ব্যথা, হাত ব্যথা কি মনে কোনরূপ একটা দুশ্চিন্তা জন্য ক্লেশের অনুভব হইলে আর স্থির হইয়া অবস্থান করা যায় না এই জন্য মনের সহিত শরীরের সম্বন্ধ পরিহার পূর্ব্বক স্থিরতা সম্পাদন করা উচিত; সেইরূপ করিতে হইলে মনকে আকাশাদি কোন অন্য বস্তুতে তদাকারে পরিণত করিয়া সন্নিবেশ করা উচিত। কোন বস্তুতে সেই বস্তুর সহিত একাকার করিয়া মনের সন্নিবেশের নাম সমাপত্তি। অনন্তর, সেই বস্তুতে মনের সমাপত্তি হইলে মনের আর শরীরের সহিত কোন সম্বন্ধ থাকে না এবং স্থিরতা ও হয়, সুতরাং তখন হাত ব্যথা, পা ব্যথা বা অন্য চিন্তা জন্য ক্লেশের অনুভব হয় না; আসনও স্থায়ী হয়।

ততো দ্বন্দ্বানভিঘাতঃ। ৪৮॥

পদচ্ছেদঃ। ততঃ দ্বন্দ্ব-অনভিঘাতঃ।

পদার্থঃ। ততঃ আসন প্রকর্ষাৎ দ্বন্দানি শীতোষ্ণাদীনি তৈঃ অনভিঘাতঃ অবাধম্।

অন্বয়ঃ। ভবতীতি শেষ।

অনুবাদ। আসন অভ্যাস করিলে শীতোষ্ণাদি জন্য ক্লেশের উদ্বোধ হয় না।

সমালোচন। বাহ্যবস্তুজ্ঞান থাকাতেই আমরা শীতোষ্ণাদি জন্য ক্লেশ অনুভব করি। কিন্তু চিত্ত যখন বাহ্য বস্তু, এমন কি আপনার শরীরের সহিত সম্বন্ধ বিস্মৃত হইয়া স্থিরতা প্রাপ্ত হয়, তখন শীত উষ্ণ কি সহস্র বজ্রপাতেও আর ক্লেশের উদ্বোধ হয় না।

তস্মিন্ সতি শ্বাস প্রশ্বাসয়োর্গতিবিচ্ছেদঃ প্রাণায়ামঃ। ৪৯ ॥

পদচ্ছেদঃ। স্পষ্টঃ।

পদার্থঃ। তস্মিন্ আসনে সতি শ্বাসঃ বাহ্যস্য বায়োরাচমনং প্রশ্বাসঃ কৌষ্ঠস্য বায়োর্নিঃসরণং তয়োঃ-গতিঃ প্রবাহঃ তস্যাবিচ্ছেদঃ অভাবঃ প্রাণায়ামঃ তন্নামকযোগাঙ্গবিশেষঃ।

অন্বয়ঃ। কথ্যতে ইতিশেষঃ।

ভাবার্থঃ। আসনে সতি তন্নিমিত্তকঃ প্রাণায়ামো নাম যোগাঙ্গবিশেষো অনুষ্ঠেয়ো ভবতি। স চ শ্বাস-প্রশ্বাসয়োরেচকপূরকদ্বারেণ বাহ্যাভ্যন্তরেষু স্থানেষু গতেঃ প্রবাহস্য বিচ্ছেদঃ অভাবরূপ। ইতিভাবঃ।

অনুবাদ। বদ্ধাসন ব্যক্তি শ্বাস এবং প্রশ্বাসের প্রবাহ রোধ করিয়া প্রাণায়াম করিবে।

সমালোচন। উক্তরূপ আসন্ দ্বারা হস্তপদাদির ক্রিয়া রোধ হয়, শরীরও কিছু পরিমাণে স্থির হয় বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ স্থিরতা লাভ করিতে পারে না; কারণ তখন স্বাভাবিক শ্বাস প্রশ্বাসের প্রবাহ থাকায় হৃদয়াদির কম্পন হয়, আর শরীর সম্পূর্ণ স্থির না হইলে মনও সম্পূর্ণ স্থির হইতে পারে না সুতরাং শরীর সম্পূর্ণ স্থিরতা সম্পাদন করিতে হইলে ঐ শ্বাস এবং প্রশ্বাসের প্রবাহ রোধ করা আবশ্যক। শ্বাস-প্রশ্বাসের প্রবাহ-রোধের নাম প্রাণায়াম। বাহ্য বস্তুর অভ্যন্তরে প্রবেশের নাম শ্বাস, এবং আন্তর বায়ুর বহির্নিঃসারণের নাম প্রশ্বাস। যে ক্রিয়া দ্বারা বাহ্য বায়ুর অন্তরে প্রবেশ রুদ্ধ হয়, তাহার নাম রেচক এবং যে ক্রিয়া দ্বারা আভ্যন্তর বায়ুর বহির্নির্গমন রোধ করা হয় তাহার নাম পূরক; এই উভয় ক্রিয়া রোধ করিয়া অন্তরে বায়ু ধারণের নাম কুম্ভক। রেচক, পূরক, কুম্ভক, এই তিনটিকেই প্রাণায়াম বলে। কেহ কেহ কেবল কুম্ভককেই প্রাণায়াম বলিয়াছেন। এক্ষণে ঐ প্রাণায়াম কত প্রকার হইতে পারে তাহাই বলিতেছেন।

বাহ্যাভ্যন্তরস্তম্ভবৃত্তির্দেশ কাল সংখ্যাভিঃ পরিদৃষ্টোদীর্ঘ সূক্ষ্মঃ। ৫০ ॥

পদচ্ছেদঃ। বাহ্য,অভ্যন্তর, স্তম্ভবৃত্তিঃ, দেশ-কাল-সংখ্যাভিঃ, পরিদৃষ্ট দীর্ঘ-সূক্ষ্মঃ।

পদার্থঃ। বাহ্যাভ্যন্তরস্তম্ভা বৃত্তয়ো যস্য স বাহ্যবৃত্তিঃ, অভ্যন্তরবৃত্তিঃ স্তম্ভবৃত্তিশ্চ। দেশঃ নাসাগ্রাৎ দ্বাদশাঙ্গুলিপর্য্যন্তস্থানবিশেষঃ রেচকস্য; পূরকস্যতু আপাদতলমামস্তকবিষয়ঃ, কুম্ভকস্য তদুভয়াবস্থানং বিষয়ঃ, কালঃ ক্ষণাদিঃ, সংখ্যা একদ্ব্যাদিঃ তাভিঃ পরিদৃষ্টঃ উপলক্ষিতঃ দীর্ঘসূক্ষ্মঃ দীর্ঘসূক্ষ্মসংজ্ঞকঃ।

অন্বয়ঃ। ভবতীতি শেষঃ।

ভাবার্থঃ। প্রাণস্য আয়ামঃ প্রাণায়ামঃ, স চ প্রাণায়ামঃ, প্রথমতস্তাবৎ ত্রিবিধোভবতি বাহ্যবৃত্তিঃ, অভ্যন্তরবৃত্তিঃ, স্তম্ভবৃত্তিশ্চেতি; যত্র প্রাণায়ামে প্রশ্বাসেন রেচকেন গতিবিচ্ছেদো ভবতি স বাহ্যবৃত্তিঃ রেচকোনাম, যত্র শ্বাসেন পূরকেণ গত্যভাবো ভবতি স অভ্যন্তরবৃত্তিঃ পূরকনামা প্রাণায়ামঃ, যত্রোভয়োঃ শ্বাস প্রশ্বাসয়োরভাবঃ স স্তম্ভবৃত্তিঃ কুম্ভকনামা প্রাণায়ামঃ। ইত্যয়ং ত্রিবিধঃ প্রাণায়ামঃ দেশকালসংখ্যাভিঃ পরিদৃষ্টঃ এতাবদ্দেশেন, এতাবতা-কালেন, এতাবত্যা সংখ্যয়া বা ব্যবচ্ছিন্নো ময়া রেচকাদিঃ কর্ত্তব্য ইত্যেবম-ধারিতঃ দেশো যথা নাসাগ্রাৎ প্রাদেশদ্বাদশাঙ্গুল-হস্তাদিপরিমিতো বাহ্য-দেশো রেচকস্য বিষয়ঃ, পূরকস্যাপাদতলমামস্তকমাভ্যন্তরস্থানং বিষয়ঃ কুম্ভকস্য রেচকপূরকয়োঃ বাহ্যান্তরদেশৌ সমুচ্চিতাবেধ বিষয়ঃ। কালঃ ক্ষণঃ তেন পরিদৃষ্টঃ এতাবৎ ক্ষণংরেচকাদিঃ কর্ত্তব্যো ময়েতি নিশ্চিতঃ সংখ্যাভিঃ পরিদৃষ্ট ইয়তো বারান্ কর্ত্তব্য ইতি নিয়মিতঃ সন্ দীর্ঘ, সূক্ষ্মসংজ্ঞকো ভবতীতি ভাবঃ।

অনুবাদ। সেই প্রাণায়াম তিন প্রকার বাহ্যবৃত্তি, অভ্যন্তরবৃত্তি এবং স্তম্ভবৃত্তি—এই তিন প্রকার প্রাণায়াম আবার দেশ, কাল এবং সংখ্যা দ্বারা নিয়মিত হইয়া দীর্ঘসূক্ষ্ম নামে অভিহিত হয়।

সমাঁলোচন। প্রাণায়াম শব্দের সাধারণ লক্ষণ করিলেন "শ্বাস প্রশ্বাসের গতিরোধের'নাম প্রাণায়াম" শ্বাস বলিতে নিশ্বাস টানা, প্রশ্বাস বলিতে নিশ্বাস ফেলা; যখন.আমরা কেবল নিশ্বাস ফেলি, তখন শ্বাসের গতিরোধ হয় নিশ্বাস টানা বন্ধ হয়, আর যখন আমরা কেবল নিশ্বাস টানি তখন প্রশ্বাসের

গতিরোধ অর্থাৎ নিশ্বাস ফেলা বন্ধ হয়। কেবল নিশ্বাস ফেলার নাম রেচক এবং কেবল নিশ্বাস টানার নাম পূরক। এক্ষণে দেখ শ্বাস প্রশ্বাসের গতি-রোধের নাম প্রাণায়াম, এইরূপ লক্ষণ করাতে কেবল শ্বাসের গতিরোধের নাম প্রাণায়াম, কেবল প্রশ্বাসের গতিরোধের নাম প্রাণায়াম অথবা যুগপৎ উভয় গতিরোধের নাম প্রাণায়াম এই তিনের এক একটি অথবা সমুদয় বুঝাইতে পারে এইজন্য প্রাণায়ামশব্দের অর্থ নানা জনে নানা রকম করিয়াছেন। কেহ বলেন ক্রমশ শ্বাস প্রশ্বাসের গতিরোধ করিয়া যুগপৎ উভয়ের গতিরোধ করত অন্তরে বায়ু স্তম্ভন করাকে প্রাণায়াম বলে। যুগপৎ উভয়ের গতি রুদ্ধ করিয়া অন্তরে বায়ু স্তম্ভনের নাম কুম্ভক। তাঁহাদের মতে রেচক পূরক এবং কুম্ভক এই তিনটি মিলিত হইয়া একটি প্রাণায়াম হয়। কেহ বা রেচক পূরককে ত্যাগ করিয়া কেবল কুম্ভক করিয়া থাকার নাম প্রাণায়াম বলেন। আর কেহ কেহ রেচক, পূরক এবং কুম্ভক এই তিনটির প্রত্যেককেই প্রাণায়াম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সূত্রকার পতঞ্জলি এই শেষোক্ত মতের পোষণ করিয়াই আমা-দের আলোচ্য সূত্রের অবতারণা করিয়াছেন। তিনি বলেন প্রাণা-য়াম প্রথমত তিন প্রকার—বাহ্যবৃত্তি, আভ্যন্তর বৃত্তি, এবং স্তম্ভবৃত্তি। যে প্রাণায়ামে রেচক দ্বারা শ্বাসের (নিশ্বাস টানার) গতিরোধ করা হয়, তাহার নাম বাহ্যবৃত্তি বা রেচক প্রাণায়াম বলা যাইতে পারে, যেস্থলে পূরক দ্বারা প্রশ্বাসের (নিশ্বাস ফেলার) গতিরোধ হয় তাহার নাম আন্তরবৃত্তি বা পূরক প্রাণায়াম বলা যাইতে পারে যখন এক প্রযত্নে শ্বাস প্রশ্বাস এই উভয়ের গতিরোধ করিয়া অন্তরে বায়ু ধারণ করা হয়, তাহার নাম স্তম্ভবৃত্তি বা কুম্ভক প্রাণায়াম। একদা উভয় গতির রোধ কিরূপে হয়, তাহা ভাষ্যকার একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইয়াছেন তিনি বলেন যেমন কোন তপ্ত বস্তুতে জলক্ষেপ করিলে, তাহার সমুদয় স্থানে জল একেবারে সঙ্কুচিত হয়, সেইরূপ একদা উভয়ের গতিরোধও সম্ভবপর। উপরে একপ্রযত্ন বলিবার তাৎপর্য্য এই যে পর সূত্রে যে প্রাণায়াম উক্ত হইয়াছে, তাহাতে বহুপ্রযত্ন আবশ্যক, অতএব তাহা হইতে পৃথক্ করিবার জন্য একপ্রযত্ন বলা হইল।

এই ত্রিবিধ প্রাণায়াম দেশ কাল এবং সংখ্যা দ্বারা নিয়মিত হইয়া দীর্ঘ

সূক্ষ্ম নামে অভিহিত হয়। দেশ দ্বারা নিয়মিত,—যেমন আমি এতদূর অবধি রেচক করিব, এতদূর অবধি পূরক করিব, এতদূর রেচক, এতদূর পূরকের পর কুম্ভক করিব; কাল দ্বারা নিয়মিত—যেমন আমি এতক্ষণ রেচক করিব, এতক্ষণ পূরক করিব এবং এতক্ষণ কুম্ভক করিব; সংখ্যা দ্বারা নিয়মিত যথা আমি এতবার রেচক এতবার পূরক এবং এতবার কুম্ভক করিব। রেচ-কের দেশ নাসাগ্র হইতে প্রাদেশ, দ্বাদশাঙ্গুল, অথবা হস্তাদি পরিমিত বাহ্যদেশ কেহ বলিতে পারেন আমি রেচক দ্বারা নাসাগ্র হইতে এক প্রাদেশ দূর পর্য্যন্ত নিশ্বাস ফেলিব, কেহ বা দ্বাদশাঙ্গুল পরিমিত দূর পর্য্যন্ত নিশ্বাস ফেলিব আর কেহ বা একহস্ত পরিমিত দূর পর্য্যন্ত নিশ্বাস ফেলিব এইরূপ নিয়ম কবিতে পারেন। পাদতল হইতে মস্তক পর্য্যন্ত আন্তর প্রদেশ—পুর-কের বিষয়। ইহাতেও কেহ বলিতে পারেন আমি পাদতল হইতে এতটুকু পর্য্যন্ত বায়ু আকর্ষণ দ্বারা পুরিত করিব, কেহ বা তাহা হইতে কিছু অধিক এইরূপে মস্তকাগ্র পর্য্যন্ত বাহ্য বায়ুর আকর্ষণ করিয়া পূরণ হইতে পারে। রেচক ও পূরক এই উভয়ের দেশ কুম্ভকের বিষয় কেহ বলিতে পারেন। এতদূর রেচক করিয়া এতটুকু পর্য্যন্ত পূরণ করিয়া কুম্ভক করিব ইত্যাদি। এতদূর পর্য্যন্ত রেচক করিলাম, ইহার নিশ্চয় তুলার ক্রিয়া দৃষ্টে হইতে পারে অর্থাৎ মনে মনে যতদূর রেচক করিব স্থির করা হইবে, নাসার অগ্র হইতে ততদূরে তুলা রাখিতে হইবে, যদি রেচক করিবার পর ঐ তুলা উড়ে যায়, বা নড়ে উঠে, তাহা হইলে নিশ্চয় হইল যে আমার ততদূর অবধি রেচক হইয়াছে। পূরকের নিশ্চায়ক পিপীলিকা স্পর্শে যেমন শিস্‌সিড়ী হয় সেইরূপ শিস্‌সিড়ী হওয়া অর্থাৎ আমি যতটুকু অবধি পূরক করিব স্থির করিয়াছি আমার পূরক ক্রিয়ার পর যদি পাদতল হইতে ততটুকু অবধি শিস্‌সিড় করিয়া উঠে তাহলে নিশ্চয় হইল, যে আমার পূবক ঠিক হইয়াছে। কুম্ভকে রেচক পূরক এই উভয়ের গতির রোধ হয়; যখন কুম্ভক করিবার পর উক্তরূপ তুলার ক্রিয়া এবং শিস্‌সিড়ী বোধ না হয়, তখন নিশ্চয় করিতে হইবে, যে আমার কুম্ভক ঠিক হইয়াছে।

কালদ্বারা নিয়মিত রেচকাদি, যথা কাল বলিতে—ক্ষণ। চক্ষুর নিমেষ পড়িতে যে সময় লাগে তাহার চারিভাগের একভাগ সময়ের নাম ক্ষণ, আমি

এতক্ষণ অবধি রেচক এতক্ষণ অবধি পূরক এবং এতক্ষণ অবধি কুম্ভক করিব এইরূপ স্থির করার নাম, কাল দ্বারা নিয়মিত। সংখ্যা বলিতে মাত্রার সংখ্যা। একটি লঘু অক্ষর উচ্চারণ করিলে এক মাত্রা হয়। আমি দ্বাদশমাত্রা পর্য্যন্ত রেচক, পূরক বা কুম্ভক করিব ইত্যাদিরূপ স্থির করার নাম সংখ্যা-নিয়মিত। এত মাত্রা পর্য্যন্ত পূরক, এত মাত্রা পর্য্যন্ত কুম্ভক এবং এত মাত্রা পর্য্যন্ত রেচক, এইরূপ। পূরক দ্বারা বায়ুর প্রথম নিরোধ হয়, কুম্ভক দ্বারা দ্বিতীয় এবং রেচক দ্বারা তৃতীয় নিরোধ হয়।

ঐ মাত্রা ভেদে পূরকাদি মৃদু মধ্য এবং তীব্র হইয়া থাকে। এস্থলে ইহাও বক্তব্য যে যদি সূত্রে প্রথমে রেচক, তাহার পর পূরক এবং তাহার পর কুম্ভকের কথা বলা হইল কিন্তু ব্যবহারে প্রথমে পূরক, তাহার পর কুম্ভক এবং তাহার পর রেচক হইয়া থাকে। এই জন্য বিজ্ঞান ভিক্ষু বলিয়াছেন সূত্রে যে প্রাণায়ামের ক্রম বলা হইয়াছে, উহা গ্রহণ করা উচিত নয়, কারণ উহা ব্যবহার এবং পুরাণাদির বিরুদ্ধ; পুরাণাদিতে প্রথমে পূরক তাহার পর কুম্ভক এবং তাহার পর রেচক এইরূপে প্রাণায়ামের ক্রম উক্ত হইয়াছে। এবং ভাষ্যকারও সেই অনুসারে পূরকের সময় বায়ুর প্রথম উদ্ঘাত বা নিরোধ কুম্ভকের সময় দ্বিতীয় উদ্ঘাত বা নিরোধ এবং রেচকের সময় তৃতীয় উদ্ঘাত বা নিরোধ হয় বলিয়াছেন। এইরূপে দেশাদি নিয়মে অভ্যস্ত প্রাণায়াম দীর্ঘ সূক্ষ্ম নামে অভিহিত হয়, দীর্ঘকাল ব্যাপী হওয়ায় দীর্ঘ এবং বায়ু সঞ্চার অতি সূক্ষ্মরূপে হয় বলিয়া সূক্ষ্ম।

বাহ্যাভ্যন্তরবিষয়াক্ষেপী চতুর্থঃ। ৫১ ॥

পদচ্ছেদঃ। বাহ্য-অভ্যন্তর-বিষয়-আক্ষেপী, চতুর্থঃ।

পদার্থঃ। বাহ্যবিষয়ঃ নাসা দ্বাদশাঙ্গুলহস্তাদিঃ অভ্যন্তরো বিষয়ঃ হৃদয় নাভিচক্রাদিঃ তৌ দ্বৌ বিষয়ৌ আক্ষিপতীতি বাহ্যাভ্যন্তরবিষয়াক্ষেপী চতুর্থঃ পূর্ব্বোক্তাৎ তৃতীয়াৎ কুম্ভকাদন্যঃ।

অন্বয়ঃ। বাহ্যাভ্যন্তর বিষয়ৌ আক্ষিপ্য পর্য্যালোচ্য যঃ স্তম্ভরূপো গতিবিচ্ছেদঃ স চতুর্থঃ প্রাণায়ামঃ। তৃতীয়স্মাৎ কুম্ভকাখ্যাদয়মঙ্গবিশেষঃ, স বাহ্যাভ্যন্তর বিষয়াবপর্য্যালোচ্য সহসা তপ্তোপলনিপতিতজল ন্যায়েন যুগপৎ স্তম্ভবৃত্ত্যা নিষ্পদ্যতে অস্য তু বিষয়দ্বয়াক্ষেপকোনিরোধঃ।

অনুবাদ। বাহ্য এবং আভ্যন্তর দেশ পর্য্যালোচনা করিয়া শ্বাস প্রশ্বাসের যে নিরোধ হয়, উহাকে চতুর্থ নিরোধ বলা যায়।

সমালোচন। কুম্ভক দুই প্রকার, প্রথম যাহাতে বাহ্য এবং আভ্যন্তর দেশের আলোচনা থাকে না অর্থাৎ এতদূর রেচক এবং এতটুকু পূরকের পর এই কুম্ভক করিলাম এরূপ আলোচনা থাকে না; একেবারে রেচক এবং পূরকের গতিরোধ করা হয়, দ্বিতীয় যাহাতে বাহ্য এবং আভ্যন্তর বিষয়ের আলোচনা থাকে এতদূর রেচক এতদূর পূরকের পর কুম্ভকের অভ্যাস করা হয়। ইহারা দেশ কাল এবং সংখ্যা দ্বারা নিয়মিত হয়।

ততঃ ক্ষীয়তে প্রকাশাবরণং। ৫২।

পদচ্ছেদঃ। ততঃ, ক্ষীয়তে প্রকাশাবরণং।

পদার্থঃ। ততঃ তস্মাৎ প্রাণায়ামাৎ ক্ষীয়তে ক্ষীণং ভবতি, প্রকাশস্য বিবেকজ্ঞানস্য আবরণং মোহঃ।

অন্বয়ঃ। ততঃ প্রকাশাবরণং ক্ষীয়তে ইত্যন্বয়ঃ।

অনুবাদ। প্রাণায়ামের অভ্যাস বলে প্রকর্ষ হইলে বিবেক জ্ঞানের আবরণ নষ্ট হয়।

সমালোচন। মহামোহ ইন্দ্রজালের মত প্রকাশশীল সত্ত্বগুণকে আচ্ছাদন করিয়া মনুষ্যকে অকার্য্যে নিযুক্ত করে, যাহাতে সাংসারিক কর্ম্ম সকল উৎপন্ন হয় প্রাণায়ামের অভ্যাসদ্বারা ঐ মোহ ক্রমশ দুর্ব্বল হইয়া প্রতিক্ষণে ক্ষীণ হয়।

স্ববিষয়াঽসম্প্রয়োগে চিত্তস্য স্বরূপানুকার ইবেন্দ্রিয়াণাম্ প্রত্যাহারঃ। ৫৩।

পদচ্ছেদঃ। স্ব-বিষয়-অসম্প্রয়োগে চিত্তস্য-স্বরূপ অনুকার ইব ইন্দ্রিয়াণাম্ প্রত্যাহারঃ।

পদার্থঃ। স্বানি ইন্দ্রিয়াণি তেষাং বিষয়ং রূপাদিঃ তেন অসম্প্রয়োগ স্তদাভিমুখ্যেনাপ্রবর্ত্তনং তস্মিন্ চিত্তস্য স্বরূপানুকার ইব ইন্দ্রিয়াণাং চক্ষুরাদীনাং প্রত্যাহারঃ বিষয়েভ্যো নিবর্ত্তনং ভবতি।

অন্বয়ঃ। ভবতীতিশেষঃ

ভাবার্থঃ। স্ববিষয়াসম্প্রয়োগে চিত্তং যথা স্বরূপমাত্রে অবতিষ্ঠতে ইন্দ্রিয়াণ্যপি তথা চিত্তস্যানুকারং কুর্ব্বন্তীব বিষয়েভ্যঃ প্রতিনিবৃত্য স্বরূপমাত্রে তিষ্ঠন্তীতিভাবঃ।

অনুবাদ। আপনার ভোগ্য বস্তু অভিমুখে প্রবৃত্তি না থাকায় যেন চিত্তের স্বরূপ অনুকরণ করিয়া ইন্দ্রিয়গণের বিষয় হইতে যে নিবৃত্তি হয়, তাহার নাম প্রত্যাহার।

সমালোচনা। মধুমক্ষিকাগণ যেমন মধুকর রাজের অনুসরণ করে সেই চিত্ত নিরুদ্ধ হইলে, তাহার সহিত ইন্দ্রিয়গণেরও নিরোধ হয়। ইন্দ্রিয়নিরোধের নাম প্রত্যাহার।

ততঃ পরমাবশ্যতেন্দ্রিয়াণাং। ৫৪॥

পদচ্ছেদঃ। ততঃ পরমা, বশ্যতা, ইন্দ্রিয়াণাম্।

পদার্থ-। ততঃ অনন্তরং পরমা অত্যর্থং বশ্যতা বশীভূততা ইন্দ্রিয়াণাং

অন্বয়ঃ। ততঃ ইন্দ্রিয়াণাং পরমা বশ্যতা ভবতীতিশেষ;।

অনুবাদ। প্রত্যাহারের পর ইন্দ্রিয়দিগের সর্ব্বোতোভাবে পরাজয় হয়। অর্থাৎ তাহাদিগের উপর যথেষ্ট প্রভুতা করা যাইতে পারে। *

পাতঞ্জলযোগ সূত্রের দ্বিতীয় অধ্যায় সম্পূর্ণ হইল।

---

* অনেক পুস্তকে ৫২ সূত্রের পর—ধারণাসুচ যোগ্যতা মনসঃ; এই একটি সূত্র দৃষ্ট হয়; কিন্তু আমাদের আদর্শ পুস্তকে উহা না থাকায় আমরা মূলে উহার উদ্ধার করিলাম না। উহার অর্থ প্রাণায়াম অভ্যাস করিলে মনের ধারণা ক্রিয়ার যোগ্যতা হয় অর্থাৎ ধারণা করিতে সক্ষম হয়।

আমাদিগের জাতীয় চরিত্র।

৪।

জাতীয় চরিত্রের উন্নতি করণ জন্য যে সকল গুণের প্রয়োজন, আমাদিগের বর্ত্তমান বাঙ্গালীদিগের তাহা নাই, ইহাই এখন মিল-মেকলের মন্ত্রশিষ্যদিগের মত। কিন্তু যে জাতির মধ্যে যে বংশে আমাদিগের জন্ম, যে অবিমিশ্র রক্ত স্মরণাতীত কাল হইতে আমাদিগের শিরায় শিরায় প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে, সে রক্ত কখনই প্রতিক্রিয়া হীন হইয়া থাকিতে পারে না। আমি বলিয়াছি;—আমাদিগের সকল গুণই আছে, তবে বিধি বিড়ম্বনায়, অদৃষ্টের দোষে, রজেনৈতিক কারণে সে গুলি ভস্মাচ্ছাদিত অনলের ন্যায় প্রচ্ছন্ন মূর্ত্তিতে বিরাজ করিতেছে। সকলেই জানেন, যে কোন বিষয়ের অভ্যাস এবং চর্চ্চা না রাখিলে, তাহার উৎকর্ষ সাধিত হয় না বা তাহা সমভাবাপন্ন থাকে না। রাজনৈতিক কারণে আমাদিগের জাতীয় সদ্‌গুণগুলির উৎকর্ষসাধারণে বহুবর্ষ ধরিয়া বিষম ব্যাঘাত ঘটিয়া আসিতেছে। কাজেই এখন আমাদের সেই সকল গুণ নাই বলিয়া বোধ হইতেছে। কিন্তু সময় সুযোগ সুবিধা এবং আদর্শ পাইলে, সেই সকল প্রচ্ছন্ন গুণরাশি অবিলম্বে প্রজ্বলিত হইয়া অকস্মাৎ জগৎকে স্তম্ভিত করিবে, তাহার এক একটী প্রমাণও আমরা মধ্যে মধ্যে প্রদর্শন করিয়া আসিতেছি।

আমরা ভীরু কাপুরুষ বলিয়া গণ্য। কিন্তু একমাস পূর্ব্বে কে ভাবিয়াছিল—আমাদের চরিত্রে কলঙ্কদাতাদিগের মধ্যেই বা কে ভাবিয়াছিল যে, সেই ভীরু বাঙ্গালী জাতির একজন ব্রাহ্মণ একাকী বেলুনে উঠিয়া চারি হাজার ফীট উর্দ্ধে শূন্যমার্গে ভ্রমণ করিয়া একাকী নিরাপদে অবতরণ করিবেন? সময় সুযোগ সুবিধা পাইয়াই রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অসম সাহসের পরিচয় দিয়াছেন, কিন্তু আমি বলি, একা রামচন্দ্র নহে, সময় সুযোগ এবং সুবিধা পাইলে এই বাঙ্গালা হইতে সহস্র সহস্র রামচন্দ্র এই

মত নানা বিষয়ে অসম সাহস দেখাইতে প্রস্তুত। আমরা সাহসহীন দুর্ব্বল বলিয়া গণ্য। য়ুরোপ হইতে ভারতে যখন প্রথম জিমন্যাষ্টিক অভিনেতা আগমন করেন, তখন তাঁহাদিগের সেই অভিনয় দেখিয়া, সাহস দেখিয়া, আমরা স্তম্ভিত হইয়াছিলাম; কিন্তু বিংশতি বর্ষ পূর্ব্বে কে ভাবিয়াছিল যে, বঙ্গের নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে পঞ্চমবর্ষীয় বালক পর্য্যন্ত অবিকল সেইমত জিমন্যাষ্টিক বা ব্যায়াম দেখাইয়া সকলকে স্তম্ভিত করিবে? কলিকাতায় যখন ব্যায়াম সারকস্ আসিয়াছিল, তখন আমেরিকান এবং ইংরাজ সারকস অভিনেতাদিগের অশ্বারোহণে ধাবন নর্ত্তন কুন্দন প্রভৃতি দেখিয়া সকলে স্তম্ভিত হইয়া সাহসের উচ্চ প্রশংসা করিতেন, কিন্তু পাঁচ বর্ষ পূর্ব্বে কে ভাবিয়াছিল যে, এই সাহসহীন দুর্ব্বল বাঙ্গালী—কেবল বাঙ্গালী পুরুষ নহে—কোমলাঙ্গ বাঙ্গালী হইতে কোমলাঙ্গিনী বঙ্গ রমণী পর্য্যন্ত অবিকল সেই আমেরিকান এবং ইংরাজদিগের মত অশ্বারোহণে ধাবন, কুন্দন, নর্ত্তন প্রভৃতি করিয়া কেবল ভারত নহে—সুদূর সুমাত্রা, যাবা, পিনাং পর্য্যন্ত গিয়া সকলকে বিস্মিত করিবে? কেবল সংখ্যাবদ্ধ বঙ্গীয় যুবক যুবতী এই সাহসের পরিচয় দিয়তছেন বটে, কিন্তু শিক্ষা সুযোগ সুবিধা পাইলে হাজার হাজার বঙ্গীয় যুবক যুবতী এইমত সাহসের পরিচয় দিতে পারে না কি? কে ভাবিয়াছিল যে, নির্জ্জীব নগণ্য জঘন্য বাঙ্গালী যুবক সাত সমুদ্র তের নদী পারে গমন করিয়া বিজাতীয় লেখাপড়া শিখিয়া, গণ্যমান্য সভ্য ইংরাজদিগকে প্রতিযোগিতা পরীক্ষায় পরাস্ত করিয়া আসিবে? সংখ্যাবদ্ধ বাঙ্গালী সিবিলিয়ান ডাক্তার, বারিষ্টার এবং ইঞ্জিনিয়ার হইয়া আসিয়াছেন বটে, কিন্তু আবার বলি, সুবিধা সুযোগ পাইলে হাজার হাজার বাঙ্গালী ছাত্র ইংলণ্ডে গিয়া, ইংরাজদিগের মাতৃভাষায়, প্রতিযোগিতা পরীক্ষায়, ইংরাজদিগকে পরাস্ত করিয়া আসিতে পারে, তাহারা এমত শক্তি রাখে। কে ভাবিয়াছিল, বাঙ্গালী শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া প্রধানতম বিচারালয়ের প্রধান বিচারপতির আসনে বসিয়া আপনার আইনজ্ঞতা এবং বিচারশক্তির চূড়ান্ত প্রমাণ প্রদর্শন করিবে? কে ভাবিয়াছিল যে, ভারতের সকল জাতির অধম বাঙ্গালী জাতি বিজাতীয় ভাষায় শিক্ষা পাইয়া রাজকার্য্যের সকল বিষয়ে সমুচ্চ প্রশংসা পাইবে? কে ভাবিয়াছিল যে, ক্ষীণপ্রাণ বাঙ্গালী জাতি

আবার ভারতের সকল জাতিকে পশ্চাতে রাখিয়া রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নেতৃত্ব করিবে? আমি আবার বলিতেছি, আমাদিগের জাতিগত উন্নতির পক্ষে প্রয়োজনীয় সমস্ত গুণই প্রচ্ছন্নভাবে আছে, কেবলমাত্র সুযোগ সুবিধা পাইলেই, উৎসাহ আদর্শ পাইলেই, সেগুলি বিশেষরূপে প্রকাশিত হইয়া পড়িবে।

মেকলে বলিয়া গিয়াছেন যে, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সমস্ত সেনাদলের মধ্যে একশত জন খাটী বাঙ্গালী আছে কি না সন্দেহ, আর আমি এখন বলিতেছি যে, বর্ত্তমান ব্রিটিস সেনাদলে একটীও বাঙ্গালী সৈন্য নাই। কিন্তু আজি যদি ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট শিক্ষিত বাঙ্গালিদিগকে সেনাদলে গ্রহণ করিবার বিধি করেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই সহস্র সহস্র বাঙ্গালী সেনাদলে প্রবেশ করিয়া যুদ্ধ বিদ্যায় এরূপ পারদর্শিতা দেখাইবে যে, ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট তজ্জন্য আত্মগৌরবানুভব করিবেন। ইহা কেবল মুখের কথা নহে, দম্ভের কথা নহে। পরীক্ষা ভিন্ন যখন ইহার মীমাংসা হইবার উপায় নাই, তখন কেহই এ সম্বন্ধে এখন সন্দেহও করিতে পারেন না। বাঙ্গালী বলণ্টিয়ার হইবার জন্য সর্ব্বাগ্রে অগ্রবর্ত্তী, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট সে কামনা পূর্ণ করিতে নারাজ। কেন নারাজ, তাহা সকলেই জানেন—সেটা জানা অথচ গুপ্ত কথা। বাঙ্গালী দুর্ব্বল সাহসহীন জাতি বলিয়াও গবর্ণমেণ্ট আপত্তি করিতেছেন না, অন্য রাজনৈতিক গুপ্ত কারণ মনে মনে চাপিয়া রাখিয়াছেন। কিন্তু সে কারণটীও ভাল। ইংরাজ রাজপুরুষদিগের ভয় যে, শিক্ষিত বাঙ্গালী বলণ্টিয়ার হইয়া, যুদ্ধ বিদ্যা শিখিয়া, ভারতে বিদ্রোহানল জ্বালাইবে,—ইংরাজকে তাড়াইবে! কিন্তু ইংরাজ জানিবেন যে, বাঙ্গালী জাতি ইংরাজি মতলবে ইংরাজ জাতির অনুগ্রহে স্বজাতির উন্নতিসাধন করিতে যতদূর যত্নবান, অন্য কোন জাতি সেরূপ যত্নবান নহেন। ইংরাজ যতদিন থাকিবেন, বাঙ্গালীর অভ্যোৎকর্ষ সাধনের ততই সুবিধা হইবে। এমন অবস্থায় ইংরাজের অবস্থিতি বাঙ্গালীর পক্ষে মঙ্গলজনক এবং প্রার্থনীয় নয় কি? ইংরাজকে ভারত হইতে তাড়ান বাঙ্গালী জাতির প্রার্থনীয় হইতে পারে কি?

আবার বলি, আমাদিগের আছে সকলই, কিন্তু প্রচ্ছন্নভাবে; অযত্ন

রক্ষিত অব্যবহৃত পদার্থের ন্যায় সেগুলি পড়িয়া আছে। এখন সুযোগ সুবিধা উৎসাহের প্রয়োজন। কতকগুলি বিষয়ে আমরা গবর্ণমেণ্টের নিকট সুযোগ সুবিধা উৎসাহের জন্য দাবি করিবার অধিকারী, আবার কতকগুলি বিষয়ে আমরা পরস্পরে সুযোগ সুবিধা উৎসাহ দান করিতে বাধ্য। একপক্ষে গবর্ণমেণ্ট যেমন সকল বিষয়ে সুযোগ সুবিধা উৎসাহ দান করিতে ক্ষান্ত, দুঃখের বিষয় যে, আমরা নিজেও আবার সেইমত পরস্পরের সুযোগ সুবিধা উৎসাহ দানে উপযুক্ত পরিমাণে অগ্রসর নই। সেইটীই আমাদিগের বর্ত্তমানের কলঙ্কের কথা। এ কলঙ্ক মোচন সর্ব্বাদৌ প্রার্থনীয়। আমরা যে সন্ধি স্থলে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি, তাহাতে পরস্পরের হাত ধরিয়া একভাবে আমাদিগকে অগ্রসর হইতে হইবে। পরস্পরের হাত ধরাধরি ভিন্ন সহজে এ সন্ধিস্থল পার হইবার উপায় নাই।

এখন এখানে আমাদিগের দুই একটা দোষের কথা না বলা, ভাল দেখায় না। দয়া মনুষ্য শরীরের একটা প্রধান বৃত্তি। দয়ার সঙ্গে ক্ষমার বিশেষ সম্বন্ধ আছে। মনুষ্য সমাজে বাস করিতে হইলে দয়ার বিশেষ প্রয়োজন। কিন্তু আমরা কিছু অতিরিক্ত দয়াশীল, অতিরিক্ত ক্ষমাশীল, হইয়া পড়িয়াছি। দয়ার পাত্রকে দয়া কর, তাহাতে দোষ নাই, কিন্তু অপাত্রে দয়া বিতরণ করিও না, সংসারে যদি বাস করিতে হয়, তাহা হইলে দয়া এবং ক্ষমার দিকে অধিক ঝোঁক দিলে, অনেক সময় অনেক স্থলে নিজের স্বার্থ ক্ষতি হয়। স্বার্থ ক্ষতির সঙ্গে সঙ্গে কুফলও দেখা দেয়। স্বার্থ ত্রিবিধ—ব্যক্তিগত, জাতিগত এবং সমাজগত। যেখানে তোমার ব্যক্তিগত স্বার্থ লইয়া টানা-টানি, সেখানে তুমি দয়ার বশীভূত হইয়া ক্ষমার সহিত সে স্বার্থ ত্যাগ করিতে পার বটে, কিন্তু যেখানে জাতিগত এবং সমাজগত স্বার্থ লইয়া কথা, সেখানে তুমি সমাজ এবং জাতির এক অংশ স্বরূপে আপন ইচ্ছায়, দয়ার বশে, সে স্বার্থ ত্যাগ করিতে পার না। তোমার জাতিগত রাজনৈতিক স্বার্থ বা স্বত্বটুকু অপরে জোর করিয়া দখল করিয়া রাখিবে, আর তুমি দয়ার বশে দখলকারীর উপর ক্ষমা করিয়া থাকিবে, তোমার সে অধিকার নাই। কিন্তু আমাদিগের যে সেই অধিকার নাই, তাহা এখন ভুলিয়া গিয়াছি। আবার এই অতিরিক্ত দয়ার জন্যই আমরা অলক্ষ্যে সমাজেরও অনিষ্ট

করিয়া থাকি। একজন ইংরাজের একজন চাকর একটা পয়সা চুরি করিলে সে ইংরাজ তদ্দণ্ডেই তাহাকে পুলিশে দিবে। নিজের সমস্ত ক্ষতি স্বীকার করিয়া সমস্ত দিন আদালতে বসিয়া, চোরকে দণ্ড দেওয়াইবে, কিন্তু আমাদের কোন ভৃত্য এক পয়সার স্থলে পাঁচ টাকা চুরি করিলেও আমরা তাহাকে সহজে পুলিশে দিতে চাই না। হয়ত ঘা কতক মারিয়া ছাড়িয়া দিই। এখানে ইংরাজকে নির্দয় এবং আমাদিগকে সদয় বলিয়া বোধ হয় বটে, কিন্তু ইংরাজ চোরের দণ্ড দিয়া সমাজের উপকার করিতেছেন, আমরা অলক্ষ্যে সমাজের অপকার করিতেছি। অতিরিক্ত দয়ার বশে এখানে আমরা সমাজের মঙ্গল ভুলিয়া যাই। কেবল চুরি নহে, অনেক বিষয়েই আমরা অতিরিক্ত দয়া প্রকাশ করি, এবং সেই সূত্রে আমাদিগের সমাজগত এবং জাতিগত অনেকটা অমঙ্গল হয়। দয়ার পাত্রকে দয়া কর, অপাত্রে করিও না।

ইংরাজি শিক্ষার গুণে, ইংরাজের বিধান বলে, আমরা এখন ব্যক্তিগত স্বত্ব স্বাধীনতা বেশ বুঝিয়াছি। এটা সুখের কথা। এই ব্যক্তিগত স্বত্ব স্বাধীনতা হইতেই আবার জাতিগত স্বত্ব স্বাধীনতা চিনিতে পারা যায়। কিন্তু আমরা ব্যক্তিগত সাম্য স্বাধীনতা বুঝিতে গিয়া একটা বড় ভুল করিতেছি। "অমুক একজন প্রধান বাগ্মী, ভাল, তিনি বাগ্মী আছেন, আমার কি?" "অমুক একজন রাজনীতিজ্ঞ, ভাল, তাতে আমার কি?" "অমুক একজন প্রগাঢ় পণ্ডিত, ভাল তাতে আমার কি?" এই রকম একটা অপ্রার্থনীয় ভাব এখন দেখা গিয়াছে। সকলেই স্ব স্ব-প্রধান হইবার চেষ্টা করিতেছে। এ চেষ্টা অবশ্য ভাল, কিন্তু তাহা বলিয়া কাহাকেও না মানিয়া চলাটা কি ভাল? আমরা সকলেই নেতা হইতে চাই, কিন্তু নেতা হইতে চাহিলে, অগ্রে যে, নেতার অধীনে চলিতে হয়, তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। সেই জন্যই শিক্ষিত বাঙ্গালীর মধ্যে প্রকৃত নেতা হইবার সর্ব্বাংশে যোগ্য লোক থাকিলেও আমরা নেতার অনুসরণ করিতে শিখিতেছি না। সকলেই নেতা হইবার উপযুক্ত গুণ সংগ্রহ জন্য চেষ্টা কর, সেই সঙ্গে সঙ্গে একজন নেতার অনুসরণ করিতে থাক। নেতা ভিন্ন এবং সকলের সেই নেতার অনুসরণ ভিন্ন, কোন জাতিই কোন কাজ করিতে

পারে না। সেনাপতি ভিন্ন যেমন যুদ্ধ চলে না, নেতা ভিন্ন সেইমত জাতির কাজ চলে না। আবার প্রত্যেক সৈন্য যেমন সেনাপতির প্রত্যেক আজ্ঞা পালন করিতে বাধ্য, জাতির প্রত্যেক ব্যক্তিও সেইমত নেতার আজ্ঞামত চলিতে বাধ্য!

আমাদিগের ধর্ম্মরাজ্যে বড়ই বিপ্লব উপস্থিত। শিক্ষিতগণ আপনাদিগকে হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিলেও মূল হিন্দুধর্ম্মের সহিত, ক্রিয়া কর্ম্মের সহিত, তাঁহাদিগের সম্বন্ধ বড়ই কম, একথাটা বোধ হয় মিথ্যা নয়। আমরা হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিই, আমাদিগের মধ্যে অনেকেই হিন্দুধর্ম্মের কিছুই জানি না! যে কয়টী প্রতিমা পূজা হয়, তাহাদিগের নাম জানি, কিন্তু সে গুলির উৎপত্তির কারণ জানি না! আমরা অনেকেই বেদবেদান্ত উপনিষদ পদার্থটা কি তাহা জানি না, পুরাণ গুলির মর্ম্ম জানি না, পাঠও করি না, সমাজ সম্বন্ধীয় বিধি গুলির উদ্দেশ্য কি তলিয়া দেখি না। এখন যে ভাবে আমাদিগের প্রাত্যহিক জীবন অতিবাহিত হইতেছে, তাহাতে ধর্ম্মের সঙ্গে আমাদের বড় একটা দেখা শুনা হয় না। আলয়ে বা বিদ্যালয়ে কোথাও দিনের মধ্যে ভ্রমেও একবার ভগবানের নাম করিবার জন্য উপদেশ পাই না! ধর্ম্ম ব্যতীত নৈতিক নির্ম্মলতা এবং পবিত্রতা লাভ করা যায় না। আমরা ধর্ম্মকে বাদ দিয়া কেবল শিক্ষা জ্ঞানের বলে কতকটা নীতিরক্ষা করিয়া চলি মাত্র। ধর্ম্মহীন জীবন অবশ্যই প্রার্থনীয় নহে। শিক্ষাজ্ঞান লাভ করিয়া যদি তোমাদের সাকার মূর্ত্তি পূজা করিতে অভিলাষ না থাকে, যদি নিরাকার সচ্চিদানন্দ হরির আরাধনা করিবার তোমার ক্ষমতা হইয়া থাকে, তাহাই কর, হিন্দুধর্ম্মেও সে ব্যবস্থা আছে, আর্য্য ঋষিগণও তাহাই করিয়া গিয়াছেন। প্রতিমা পূজায় তোমাদের ভক্তি নাই বলিয়া, তুমি হিন্দুধর্ম্ম, হিন্দুসমাজ ছাড়িয়া একটা স্বতন্ত্র দল বাঁধিয়া, স্বতন্ত্র জাতি হইবার চেষ্টা করিও না; সাকার পূজার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইও না। যাহার যাহাতে ভক্তি, তাহার তাহাতেই মুক্তি। তোমার নিরাকারে ভক্তি থাকে, নিরাকারকে চিন্তা করিবার অধিকার হইয়া থাকে, ঘরের ছেলে ঘরে থাকিয়া, সেই নিরাকারের উপাসনা কর; আর যাহাদিগের চিন্তাশক্তি নিরাকার চিন্তা করিতে সক্ষম নহে, তাহাদিগের জন্য সাকার মূর্ত্তির সৃষ্টি হইয়াছে, তাহারা মুক্তির জন্য সেই সাকার মূর্ত্তির উপাসনা করে, করুক না, তাহাতে তোমার ক্ষতি কি?

আমি এমন বলি না যে শিক্ষিত হিন্দু মাত্রেই ধর্ম্ম হীন। অবশ্য হিন্দু শাস্ত্র মত সকল কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকেন এমত শিক্ষিত হিন্দু আছেন বটে, কিন্তু হিন্দু নামে পরিচয় দানকারী অথচ হিন্দুধর্ম্মের সকল মর্ম্ম, সকল বিধি, সকল উপদেশ জানিতে পারেন নাই বলিয়া তাহা মানেন না, এমন শিক্ষিত হিন্দুই অনেক। আবার সকার বা নিরাকার কোন প্রকার মূর্ত্তির উপাসক নহেন, এখন শিক্ষিত হিন্দুও দেখা দিয়াছেন। ধর্ম্ম রাজ্যের এ বিপ্লব অবশ্যই শোচনীয়। এ শোচনীয় অবস্থা থাকিতে দেওয়া কি উচিত?

আমাদিগের পক্ষে এখন কর্ত্তব্য কি? আমরা যে সন্ধির মুখে আসিয়াছি, তাহাতে আমাদিগকে অতীত এবং বর্ত্তমান দুই দিকেই তীব্র দৃষ্টি রাখিতে হইবে। মুনি ঋষিগণ বহুল চিন্তা, বহুল মস্তিষ্ক ক্ষয় করিয়া উন্নতির যে সকল বিধি ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন, তাহার মধ্যে যে গুলি এখনও আমাদিগের সমাজের বর্ত্তমান অবস্থার উপযোগী আছে, সেগুলিকে লইতে হইবেই, আবার পাশ্চাত্য জগত হইতে শিক্ষা বিজ্ঞান সভ্যতার দ্বারা যে গুলি আমদানী হইতেছে, তাহার মধ্যে যে গুলি আমাদিগের পক্ষে উপযোগী, সেইগুলি বাছিয়া লইতে হইবে। ঘরে যাহা আছে, তাহা লইবই, পরে যাহা ভাল অথচ উপকারী ও উপযোগী করিয়া দিবে, তাহা লইব না, এ প্রতিজ্ঞা এখন চলিবে না। সময়ের গতির সঙ্গে দৌড় দিতে হইল, সময়ের উপযোগী সাজে সাজিতে হইবে, নতুবা পশ্চাতে পড়িয়া থাকিবে। তবে পাশ্চাত্য জগৎ হইতে আমদানী করা যাহা কিছু দেখিব, তাহাই লইব, এ প্রতিজ্ঞা ভাল নয়। কারণ ইহাতে আমরা গুণগুলির সঙ্গে সঙ্গে দোষগুলিও লইতে পারি এবং কোন কোন কোন বিষয়ে লইতেওছি। তাহা কি প্রার্থনীয়?

এখন মধুময়ী উষার স্নিগ্ধ সুন্দর জ্যোতি দেখা গিয়াছে। এখন সকলকে জাগাইয়া তুল। বিশ্বজয়ী ব্রিটিস সিংহ পথ প্রদর্শকরূপে অগ্রবর্ত্তী হইয়া যাইতেছে, সম্মুখে কোন ভয় নাই। এখন ঐ প্রভাকরের সঙ্গে সঙ্গে আমাদিগকে গন্তব্য পথে উন্নতির সৌরভময় কুঞ্জবনে প্রবেশ করিতে হইবে; বেলা থাকিতে থাকিতে পৌঁছিতে হইবে; সুতরাং আবার বলি, সকলকে জাগাইয়া

তুল; সচ্চিদানন্দ হরি নামের জয়ধ্বনি করিয়া, পরস্পরে ভাই ভাই হাত ধরাধরি করিয়া, অগ্রসর হও; মাতৃভূমির নামোচ্চারণ করিয়া শুভ যাত্রা কর; আর আমি ব্রাহ্মণ বেদ মন্ত্রে আশীর্ব্বাদ করি—"তোমাদিগের কামনা এক হউক, তোমরা যেন সর্ব্ব প্রকারে সম্যকরূপে একমত হও।"

বোম্বাই পরিদর্শন।

৫।

Parsee Benevolent Institution. আজ কাল ভারতবর্ষে হিন্দু ব্যতীত দেশীয়দিগের মধ্যে পার্শীদের ন্যায় আর দানশীল জাতি নাই। স্যর জেমৃস জি, জি, বাই ও তাঁহার স্ত্রী "আভা" বাই দরিদ্র বালক বালিকা-দিগের শিক্ষার জন্য ও দরিদ্রের ভরণ পোষণের জন্য, বিদ্যালয় ও অতিথি শালা নির্ম্মাণ হেতু (৩০০০০০) তিন লক্ষ টাকা দান করিয়া গিয়াছেন; দাতব্য, পার্শীদের মধ্যে অনেকেরই আছে, কিন্তু সে সকল দাতব্য স্বজাতীয়দিগের জন্য। দাতব্য, হিন্দুর নিকট নূতন কথা নহে। ভারতের যথা তথা হিন্দুর দাতব্য কীর্ত্তি এখন দেদীপ্যমান। হিন্দুর দাতব্যে স্বজাতীয় বিজাতীয় সক-লেই উপকৃত হইয়া থাকে। আজ কাল কিন্তু হিন্দুদিগের এরূপ দাতব্য লোপ পাইতেছে। এটুকু ইংরাজী শিক্ষার একটি কুফল।

Fire Temples অর্থাৎ অগ্নিমন্দির। বোম্বাই সহরে সর্ব্বশুদ্ধ ৩৩টি অগ্নি মন্দির আছে, তন্মধ্যে কতকগুলি গৃহস্থের বাটীতে আছে, সেগুলিতে কেবল মাত্র গৃহস্থের পরিবারবর্গ উপাসনা করিতে পারেন, অন্যের প্রবেশের অধিকার নাই এবং আর কতকগুলি সাধারণের জন্য, সেগুলিতে Zoroastrian ধর্ম্মা-বলম্বী সকলেই প্রবেশ করিতে পারেন। পার্শীদিগের ধর্ম্মশাস্ত্র-প্রয়োজকের নাম Zoroaster; আমাদের যেমন মনু, ইঁহাদেরও তেমনি তিনি ছিলেন।

পার্শীদিগের অগ্নি মন্দির সম্বন্ধে বিশেষ বক্তব্য কিছু নাই, ইঁহাদের পুরোহিতেরা এই সকল মন্দিরের তত্ত্বাবধারণ করেন। তাঁহার নিয়মিত কার্য্য এই, যে তিনি গৃহ মধ্যস্থিত অগ্নিতে সুগন্ধ কাষ্ঠাদি দিয়া অনুক্ষণ প্রজ্বলিত রাখিবেন এবং সেই অগ্নি সমক্ষে উপাসনা আদি করিবেন।

পার্শীদিগের মধ্যে যাঁহারা অশিক্ষিত, তাঁহারা যেমন অগ্নি উপাসনা করেন, তেমনি চন্দ্র সূর্য্য তারা প্রভৃতির উপাসনাও করিয়া থাকেন; কিন্তু শিক্ষিত দল কেবলমাত্র অগ্নি সমক্ষে সর্ব্বশক্তিমান জগদীশ্বরের উপাসনা করেন। ইউরোপীয় কয়েকজন বিখ্যাত পণ্ডিতেরা বলেন, যে পার্শীরা অগ্নি উপাসক নহেন। Dr Hyde তাঁহার পার্শী ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় গ্রন্থে বলিয়াছেন:—"The Persians, from the beginning of their existence as a nation, always believed in only one and the same true and omnipotent God. They believed in all the attributes of the Diety believed by us; and God is called in their own writings, the Doer, the Creator, the Governor, and the Preserver of the world."

শেঠ Dosabhoy Framjee পার্শীদিগের সম্বন্ধে যে গ্রন্থ লিখিয়াছেন তাহাতে তিনি বলিয়াছেন:—"The charge of fire, sun, water and air worship has, however, been brought against the Parsees by those not sufficiently acquainted with the Zoroastrian faith, to form a just opinion. The Parsees themselves repel the charge with indignation. Ask a Parsee whether he is a worshipper of the sun, or fire, and he will emphatically answer—No! This declaration itself, coming from one whose own religion is Zoroastrianism, ought to be sufficient to satisfy the most sceptical. God, according to the Parsee faith, is the emblem of glory, refulgence. and light, and in this view a Parsee, while engaged in prayer, is directed to stand before the fire, or to direct his face towards the sun, as the most proper symbols of the Almighty."

বোম্বাই সহরের পথগুলি সর্ব্বত্রই প্রশস্ত এবং অতি পরিস্কার। রাস্তার দুই ধারে কলিকাতার ন্যায় ফুটপথের উপর গ্যাশের আলো; ট্র্যামওয়ে সর্ব্বদা চলিতেছে, কিন্তু কলিকাতা হইতে বোম্বায়ে ট্র্যামওয়ে অপেক্ষাকৃত অল্প। তাহার কারণ বোম্বাই সহরে পাড়ায় পাড়ায় ট্রেণ চলিতেছে, ট্র্যাম-ওয়ের তত প্রয়োজন নাই; ভাড়াগাড়ি বোম্বায়ে খুব সস্তা। গাড়ীগুলিও ভাল; ৶০, ।০ আনায় বগি, Victoria ফিটন, ব্রুহাম, পাল্কীগাড়ী প্রভৃতি, কলিকাতা অপেক্ষা বিস্তর অল্প মূল্যে, ভাড়া পাওয়া যায়।

বোম্বাই সহরের প্রধান উৎসব এই কয়টি;—দেওয়ালি, নারেল পুনাম (এই উৎসবে হিন্দুরা সমুদ্র গর্ভে নারিকেল উৎসর্গ করেন) জন্ম অষ্টমী, মহরম, এবং পর্টুগিজদিগের খৃষ্টীয় উৎসব। এই সকল উৎসবের মধ্যে দেওয়ালি ও নারেল পুনামের সময় সমারোহ সর্ব্বাধিক হইয়া থাকে।

বোম্বায়ে যাইলেই, Caves of Elephanta যাহাকে দেশীয়েরা "ঘারিপুরী" কহে, তাহা সকলেরই দর্শন করিয়া আসা উচিত। Appollo Bander হইতে বোটে করিয়া অথবা ছোট ছোট steam launch করিয়া অল্প ব্যয়ে ও অনায়াসে এমন কি সদ্যসদ্যই এই গিরিগুহা দেখিয়া আসা যায়। এই গুহা বোম্বায়ের অদূরস্থিত একটি দ্বীপের উপর। এ গুহা নাসীকের পাণ্ডু গুহা হইতে বৃহৎ। ইহার নাম Elephanta Caves হইল, তাহার কারণ, এই দ্বীপের দক্ষিণ দিকে, উপকূল ভাগে, একটি প্রস্তরের হস্তীর মূর্ত্তি ছিল, এক্ষণে সে মূর্ত্তি ভাঙ্গিয়া প্রস্তর স্তূপে পরিণত হইয়াছে। সে প্রস্তর স্তূপ এই দ্বীপ হইতে তুলিয়া আনিয়া, Victoria উদ্যানে স্থাপিত হইয়াছে। এই সকল গুহা কবে ও কাহার দ্বারা সৃজিত, তাহার কোন ইতিহাস পাওয়া যায় না। এইরূপ প্রবাদ আছে যে, এই গিরি গুহার সম্মুখে এক প্রস্তর ফলকে ইহার ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত ক্ষোদিত ছিল, কিন্তু পর্টুগীজেরা, তাহা সে স্থান হইতে তুলিয়া লইয়া গিয়া Lisbon নগরে রাখিয়াছে এবং সম্প্রতি শুনা যাইতেছে যে ভারতবর্ষীয় কোন এক প্রাচীন বৃত্তান্ত ক্ষোদিত, এক প্রস্তর ফলক, Lisbonএ পাওয়া গিয়াছে; সম্ভবত, তাহাই এই ঘারিপুরীর প্রস্তর ফলক। এই সকল গিরিগুহায় হিন্দুদিগের প্রাচীন নিদর্শন বিস্তর আছে, বিস্তারিত করিয়া বলিলাম না, তাহার কারণ, উহাদের প্রকৃত বৃত্তান্ত জানিবার উপায়

নাই। কিন্তু তাহা হইলেও এ গিরিগুহা সকলেরই দেখিয়া আসা উচিত। এখান হইতে বোম্বাই ও সমুদ্রের দৃশ্য অতি সুন্দর। সহর হইতে বিহার হ্রদ ও "কেনেরি গুহা" এক দিনেই দেখিয়া আসা যায়। বিহার হ্রদ ও থানার মধ্যে, স্যালসিটি দ্বীপের উপর এক উচ্চ পর্ব্বতের গিরিগুহার নাম "কেনেরি গুহা।" এখানে প্রায় ১০০টি গুহা আছে। এ গুহা Elephanta হইতে প্রাচীনতর ও বৃহত্তর। এখানকার এক একটি গুহা পর্ব্বতের ভিতর এতদূর চলিয়া গিয়াছে, যে এ পর্য্যন্ত কেহ ভরসা করিয়া তাহার আদ্যোপান্ত দেখিয়া আসিতে পারেন নাই। কেহ কেহ বলেন যে এই পর্ব্বত গুহা বরাবর সুড়ঙ্গের মত, বোম্বায়ের ১০৮ মাইল উত্তরে ডামুয়ান পর্য্যন্ত প্রসারিত। এক-জন পর্টুগিজ, এ গুহা কতদূর গিয়াছে তাহা সন্ধান করিবার জন্য, গুহার মুখে জনকতক লোক সংগ্রহ করিয়া, এক বৃহৎ রজ্জুর এক প্রান্ত তাহাদের হস্তে ও অপর প্রান্ত নিজে ধরিয়া, এমন কি সাত ঘণ্টা গিয়াও শেষ না পাইয়া, নৈরাশ হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। কেনেরি গুহার ভিতর বৌদ্ধ ঋষিদিগের বাস স্থানের বিস্তর নিদর্শন এখনো রহিয়াছে। এখন যে গুহাকে দরবার গুহা বলিয়া লোকে উল্লেখ করে, সে গুহাটি দেখিলে বোধ হয় যে তাহা বৌদ্ধদিগের বিদ্যালয় ছিল। এই গুহার স্থানে স্থানে সিংহ আসনে ও পদ্মাসনে বৌদ্ধের মূর্ত্তি আছে। এখানকার বৃহৎ গুহাটি ৮৮½ ফিট দীর্ঘ এবং ৩৮½ ফিট প্রশস্ত। এই গুহায়, পালী ভাষায় প্রস্তরের উপর বিস্তর লেখা আছে। "কেনেরি গুহা" সম্বন্ধে বলিতে হইলে, বিস্তর বলিবার আছে' কিন্তু সে সকল কথা এখন বলিবার সময় হইবে না। বোম্বাই গিয়া যিনি কেনেরি গুহা না দেখিয়া আসিবেন, তাঁহার বোম্বাই দেখা মঞ্জুর নহে।

Carlee Caves কার্লীগুহা। বৌদ্ধদিগের এইরূপ যত গুহা আছে তন্মধ্যে কার্লীগুহা সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ এবং উহার প্রাচীন নিদর্শনগুলি কিছুমাত্র নষ্ট হয় নাই। শালিবাহনের সময় এই গুহার নির্ম্মাণ হইয়াছিল বলিয়া অনেকেই অনুমান করেন। Heber সাহেব এই গুহা সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে "Altogether,, it would form a very noble temple for any religion." কার্লীগুহা দেখিতে যাইতে হইলে, জি, আই, পি, রেল দিয়া গিয়া "বোরঘাটের" এক শৈল শৃঙ্গের উপর Lanowlee নামক ষ্টেসনে

নামিয়া যাইতে হয়। Lanowlee যাইবার পূর্ব্বে, Khandalaর এষ্টেসন মাষ্টারকে, পরদিন প্রত্যূষে Lanowlee এষ্টেসনে একটি টাটু ঘোড়া রাখিয়া দিবার জন্য লিখিয়া যাইতে হয়; সে রাত্র Lanowlee এষ্টেসনে, বিশ্রাম গৃহে কাটাইয়া, পরদিন প্রত্যূষে সুন্দর সুন্দর প্রার্ব্বত্য প্রদেশের দৃশ্য দেখিতে দেখিতে, পুনার পথে তিন মাইল দূরে কার্লীগুহা দেখিয়া আসা যায়।

বোম্বায়ের ফল মুল সুস্বাদু, মৎস্য মাংস বড় উপাদেয়। সকল মৎস্যেরই স্বাদ একটু তপ্‌সে মাছের স্বাদের ন্যায়। Pumfled মৎস্য অতি উৎকৃষ্ট মৎস্য; দেখিতে পায়রা চাঁদার ন্যায়, কিন্তু তাহা অপেক্ষা অনেক বৃহৎ। বোম্বায়ে আহার্য্য দ্রব্য বড় মহার্ঘ; ৮।১০ টাকা ভাল চালের মন এবং ২॥০ সের করিয়া দুগ্ধ টাকায়।

বোম্বায়ের কলগুলি দর্শন করা নিতান্ত আবশ্যক। আমরা কয়েকটি কল্ দেখিয়াছি। এখানে দেশীয়দিগের প্রায় ৭০।৭৫টি কল্ আছে। আমি এই সকল কল্ দেখিবার সময়, পরিশ্রম ও সময়ের চমৎকার বিভাগ দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলাম। শেঠ প্রেমচাঁদ রায় চাদের পুত্র শেঠ ফকির-চাঁদ সঙ্গে করিয়া আমাদের এই সকল কল্ দেখাইয়াছিলেন। *

---

* (১) আমরা শেঠ প্রেমচাঁদের বাটিতে গিয়াছিলাম, তিনি যে গলিতে থাকেন তাহার নাম Love Lane প্রেম গলি, যে বাটীতে থাকেন তাহার নাম প্রেমোদ্যান এবং তাঁহার নিজেরো নাম প্রেমচাঁদ। এই সকল নামের সাদৃশ্য বড় সুন্দর।

(২) এই সকল কলের কর্ম্মচারী কেবল ইঞ্জিয়ার ব্যতীত আর সকলেই দেশীয়। কোন কোন কলে প্রায় দুই হাজার দেশীয় পুরুষ রমণী, বালক বালিকা প্রতিপালিত হইতেছে। মিলের তত্ত্বাবধারকদিগের বেতন কাহারো ৩০০, কাহারো বা ৪০০, ৫০০, ৬০০; ৭০০, ইহারো অধিক বেতন কাহারো কাহারো আছে। ইঁহাদের কার্য্য অতি গুরুতর। মিলে এত লোক কায করে, ইহাদের মধ্যে বিবাদ বিসম্বাদ মার্ পিট্ সর্ব্বদাই হইয়া থাকে, তত্ত্বাবধারককে সে সকল বিষয়ে দৃষ্টি রাখিয়া, কায চালাইতে হয়। পাঁচ মিনিটের জন্য মিলের কার্য্য বন্ধ হইলে, মহাজনের বিস্তর ক্ষতি হইয়া থাকে। একবার শুনিয়াছিলাম যে, যে নল দিয়া মিলের কলে জল সরবরাহ হইয়া থাকে, সেই নলের মুখে ছিদ্র আছে, তাহাতে কয়েকটি গেঁড়ি বসিয়া ছিল, তখনি মিলের সকল কার্য্য বন্ধ হইয়া গেল। কেন কল্ বন্ধ হইল

দাক্ষিণাত্যে ব্রাহ্মণ।

২।

ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে সারস্বত ও গৌড় ব্রাহ্মণ, পঞ্চ গৌড়ের অন্তর্গত। কিন্তু, যে সকল ব্রাহ্মণ সরস্বতী নদীর তীর হইতে গৌড় প্রদেশে গিয়াছিলেন এবং গৌড় হইতে দাক্ষিণাত্যে আসিয়াছিলেন, সেই সকল ব্রাহ্মণ সারস্বত গৌড় বলিয়া অভিহিত হয়েন। কতকগুলি ব্রাহ্মণ, যে বঙ্গদেশ হইতে দাক্ষিণাত্যে আসিয়াছিলেন, তাহার কোন কোন নিদর্শনও পাওয়া যায়। তাঁহারা মৎস্য ব্যবহার করেন। যে সকল গৌড় ব্রাহ্মণ দ্রাবিড় ব্রাহ্মণদের নিকটে থাকেন, তাঁহারা প্রকাশ্যে মৎস্য ব্যবহার করেন না বটে, কিন্তু যাঁহারা গোমন্তকে অবস্থিতি করেন, তাঁহাদের মধ্যে মৎস্য ব্যবহার, প্রচলিত আছে। আমরা একদা এখানকার একটী ভোজন গৃহে উপস্থিত হইয়াছিলাম। তথায় মৎস্য দিয়া ব্যঞ্জন প্রস্তুত হইয়া থাকে এবং অভ্যাগতদিগের মধ্যে যাঁহারা ইচ্ছা করেন, তাঁহারা তাহা ভোজন করিতে পারেন। এখানকার বড় লোককে বাব বলিয়া সম্বোধন করা হয়। ইহা বাবু শব্দের অপভ্রংশ এরূপ অনুমিত হইতে পারে।

কতকগুলি ব্রাহ্মণ ত্রিহোত্র (তিরহুত) হইতে আসিয়া এতৎপ্রদেশে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। তাঁহারা ত্রিহোত্র ব্রাহ্মণ নামে অভিহিত। কিন্তু তাঁহাদের সংখ্যা অতি অল্প। দাক্ষিণাত্যে দেশস্থ এবং কোকনস্থ সম্প্রদায় প্রবল। ইঁহারা গৌড় ব্রাহ্মণদিগকে ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকেন। মৎস্য

কেহই সন্ধান করিয়া উঠিতে পারেন না। মহাজনের বিস্তর ক্ষতি হইতে লাগিল, শেষে ইঞ্জিনিয়র আসিয়া, অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া, জলে নামিয়া নলের মুখে হাত দিবামাত্র সকল কল চলিতে লাগিল। যাঁহারা কারণ বুঝিলেন না, তাঁহারা হয়ত ইঞ্জিনিয়ারকে অবতার বিশেষ ভাবিতে লাগিলেন। এই সকল মিলের কার্য্য প্রণালী দেখিলে, ইচ্ছা করে, আমাদের পরিশ্রম ওসময় এইরূপে বিভাগ করিয়া লই।

আহার করেন বলিয়া গৌড় ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদের কাছে অবজ্ঞার পাত্র। ঘৃণা-ব্যঞ্জক শেণুই শব্দে গৌড় ব্রাহ্মণগণ অভিহিত হয়েন। কিন্তু যদিও শেণুই শব্দ এখন মন্দ ভাবে ব্যবহৃত হয়, ইহার প্রকৃত অর্থ, শ্রেষ্ঠ এবং বিদ্বান্। শেণুই, শর্ম্মণ শব্দের অপভ্রংশ। গৌড় ব্রাহ্মণ ভিন্ন, দাক্ষিণাত্যের কোন কোন স্থানের ব্রাহ্মণগণ মৎস্য ও মাংস ভক্ষণ করেন, কিন্তু শ্রাদ্ধ বিবাহাদি সমারোহে যখন ব্রাহ্মণাদিকে ভোজন করান হয়, সে সময় ইহা ব্যবহৃত হয় না।

শাস্ত্র অনুসারে শ্রাদ্ধ কিম্বা অন্যান্য অনুষ্ঠানে আমিষ ব্যবহার হয়। প্রাচীন কালে ইহা নিবেদিত হইয়া ব্রাহ্মণদের বণ্টন করিয়া দেওয়া হইত। এই ব্যবস্থা অনুসারে, দেশস্থ এবং কোকনস্থ ব্রাহ্মণগণও কখন কখন কার্য্য করিয়া থাকেন। ইংরাজী ১৮৮৪ সালে, আলিবাগ নামক স্থানে, একজন কোকনস্থ ব্রাহ্মণ, একটী যজ্ঞ করিয়া, ২২টী মেষ বলি দিয়াছিলেন এবং যজ্ঞ শেষ হইলে, সেই মেষ মাংস রন্ধন করত ব্রাহ্মণদের ভোজন করাইয়াছিলেন।

দাক্ষিণাত্যের গৌড় ব্রাহ্মণদের অনেক গুলি গোত্র। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটী প্রসিদ্ধ :—

(১) বাৎস্য (২) কৌণ্ডিল্য (৩) কৌশিক (৪) ভরদ্বাজ (৫) বশিষ্ঠ (৬) জামদগ্ন্য (৭) মৌদ্গল্য (৮) অত্রি (৯) কুৎস্য, সাংখ্য এবং সিদ্ধি (১০) গৌতম (১১) আঙ্গিরস (১২) নৈধ্রুব (১৩) কাশ্যপ (১৪) বিশ্বামিত্র (১৫) শাণ্ডিল্য (১৬) ধনঞ্জয় (১৭) সংখ্যায়ণ (১৮) গর্গ। ইঁহাদের মধ্যে বাৎস্য গোত্রের ব্রাহ্মণই অধিক। কৌণ্ডিল্য গোত্র তাহার নিম্ন স্থল অধিকার করিয়াছে। প্রাচীন কালে, ইঁহারা চারি বেদই অধ্যয়ন করিতেন। কিন্তু কালে ইঁহাদের মধ্যে কেবল ঋগ্বেদেরই চর্চ্চা রহিল এবং এই নিমিত্ত ইঁহারা ঋগ্বেদী বলিয়া অভিহিত।

যে সকল ব্রাহ্মণ এতৎপ্রদেশে আগমন করেন, তাঁহারা শাক্ত সম্প্রদায় ভুক্ত ছিলেন। তাঁহারা বঙ্গদেশ হইতে আসিবার সময়ে, তাঁহাদের কুল দেবতা হর পার্ব্বতীকে সঙ্গে লইয়া আসেন। এখানকার ব্রাহ্মণগণ বলেন যে, বাঙ্গালার উত্তর প্রদেশে ভাগীরথী তীরে একটী ক্ষেত্র আছে, তাহার

নাম মাঙ্গিরিশ এবং এই স্থান হইতে হর-পার্ব্বতীর মূর্ত্তি আনীত হইয়াছিল বলিয়া, এতদঞ্চলে, শিবের একটী নাম মাঙ্গিশ বা মঙ্গেশ হইয়াছে। গোমন্তকের অন্তর্গত কব্‌ড়ে নামক একটী ক্ষেত্রে, গৌড় ব্রাহ্মণদিগের গুরুকুলের একটী মঠ আছে। ইহার নাম কৈবল্য মঠ। এই মঠের অধিকারী শ্রীমৎ পরমহংস শ্রীমৎ আত্মানন্দ সরস্বতী স্বামী। এরূপ প্রবাদ যে, উত্তর দেশ হইতে গৌড় পাদাচার্য্য নামক এক ব্যক্তি আসিয়া এই মঠটী স্থাপিত করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহা যে কোন্ সময়ে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহা কাহারও বিদিত নাই। বরদার অধিপতি, এই মঠের ব্যয় নির্ব্বাহ জন্য, মাসে মাসে বৃত্তি দিয়া থাকেন। এই মঠের শাখা চারিদিকে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। তন্মধ্যে, এই কএকটী স্থানের মঠ প্রসিদ্ধ ঃ—কাশী, প্রয়াগ, ব্রহ্মাবর্ত্ত, নাসিক, বালকেশ্বর (বোম্বাই), রামেশ্বর, গোকর্ণ, খানাপুর, সোনৌড়ে এবং বেলগাঁও। এই সকল মঠের কার্য্য নির্ব্বাহ জন্য, নানা স্থানের রাজা ও ধনী ব্যক্তিগণ অর্থের দ্বারা সাহায্য করিয়া থাকেন। প্রায় চারিশত বৎসর পূর্ব্বে, ইঁহাদের মধ্যে কতকগুলি ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব সম্প্রদায় ভুক্ত হয়েন। চৈতন্য দেব, এ প্রদেশে ধর্ম্ম প্রচার করিতে আসিয়াছিলেন এবং তাঁহারই প্রচারের ফলে যে এতদঞ্চলের লোক হরিভক্ত হইয়াছিলেন, তাহাতে আর সন্দেহ করা যায় না। এই বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের দুইটী মঠ আছে ঃ—একটী কাশীতে এবং আর একটী গোকর্ণে।

গৌড় ব্রাহ্মণগণ শাস্ত্র আলোচনায় কাল যাপন করেন। ইঁহাদের মধ্যে যাঁহারা বৈদিক, তাঁহারা শূদ্রের পৌরোহিত্য কিম্বা দান গ্রহণ করেন না। বৈদিকদের মধ্যে, কএক জন উত্তম পণ্ডিত আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে, বেলগাঁয়ের লক্ষ্মণ ভট্ট উপাধ্যায়, কর্ণাটকের বেদমূর্ত্তি নারায়ণ ভট্ট এবং লক্ষ্মণ ভট্ট, বিশেষ প্রসিদ্ধ। গৌড় ব্রাহ্মণদের মধ্যে ভিক্ষুকের সংখ্যা অল্প। ইঁহাদের অনেকেই বৈষয়িক কার্য্যে ব্যাপৃত। অনেকে কারকুণ অর্থাৎ কেরাণী এবং পহোজী অর্থাৎ শিক্ষকের কার্য্য করেন। পহোজী পণ্ডিত শব্দের অপভ্রংশ। গৌড় ব্রাহ্মণদের মধ্যে কেহ কেহ কুলকর্ণী ও দেশপাণ্ডের কার্য্যও করেন। যাঁহারা সমস্ত গ্রামের আয় ব্যয়ের হিসাব রাখেন, তাঁহারা কুলকর্ণী নামে অভিহিত হয়েন এবং যাঁহারা সমুদয়

পরগণার হিসাব রাখেন, তাঁহাদের দেশপাণ্ডে বলে। ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ দেশীয় রাজা ও মোগল অধিপতির অধীনে মন্ত্রী ও অন্যান্য উচ্চপদ লাভ করিয়াছিলেন। কাহার কাহার জায়গীর আছে, এবং কেহ কেহ উত্তম রূপে ব্যবসা চালাইতেছেন। সম্প্রতি ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ ইংরাজী ভাষায় বিশেষরূপ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন। বোম্বাই হাইকোর্টের বিচারপতি খ্যাত নামা কাশীনাথ ত্র্যম্বক তেলাং এবং সুবিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিৎ ও পণ্ডিত রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর—গৌড় ব্রাহ্মণ। এতদ-ঞ্চলের গৌড় ব্রাহ্মণদের ভাষা গোমন্তকী। ইহার সহিত মারহাট্টি ভাষার অনেক সাদৃশ্য আছে। কিন্তু নানা স্থানে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়াতে ইঁহারা ইঁহাদের নিজ ভাষা বড় ব্যবহার করেন না। মহারাষ্ট্র দেশবাসী গৌড় ব্রাহ্মণগণ মারহাট্টা, কর্ণাট বাসীগণ কানাবাড়ি এবং মালবার বাসীগণ, মালবারী ভাষা ব্যবহার করিয়া থাকেন। কিন্তু দেখা গিয়াছে যে, আপন আপন গৃহ মধ্যেও ইঁহারা গোমন্তকী ভাষায় কথাবার্ত্তা কহেন।

গৌড় ব্রাহ্মণগণ যে স্থলে অবস্থিতি করেন, সেই স্থানের আচার ব্যবহার অবলম্বন করিয়া থাকেন। তবে তাঁহাদের মধ্যে যাহা বিশেষ রূপে প্রচলিত তাহা বিবৃত করিতেছি। শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট আট প্রকার বিবাহের মধ্যে, ব্রাহ্ম বিবাহকে তাঁহারা শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করেন। শাস্ত্র অনুসারে ইঁহারা কন্যাকে নানা অলঙ্কারে বিভূষিত করিয়া, তাঁহাকে বিদ্বান ব্যক্তির হস্তে অর্পণ করেন। ইঁহাদের মধ্যে, কন্যা বিক্রয় অতিশয় দূষণীয়। কন্যা বিক্রয়কে ইঁহারা নরমাংস বিক্রয়ের তুল্য হেয় বলিয়া বিবেচনা করেন। ইঁহাদের মধ্যে পাচক ব্রাহ্মণ পাওয়া কঠিন, কারণ ইঁহারা এ কার্য্যটীকে হেয় জ্ঞান করেন। ইঁহারা জাতি নির্ব্বিশেষে, হরিদাস,* পৌরাণিক, সাধু, পণ্ডিত, বিদ্যার্থী এবং ভিক্ষুক প্রভৃতির সাধ্যানুসারে অভাব পূরণ করিয়া

* ইঁহারা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। প্রায়ই হরির কথা কহেন বলিয়া ইঁহাদের নাম হরিদাস। তিন চারি জনে একত্রিত হইয়া কীর্ত্তন হইয়া থাকে। কথক মহাশয় সম্মুখে দাঁড়াইয়া শাস্ত্রের কোন কোন অংশ ব্যাখ্যা দেবতার গুণ কীর্ত্তন এবং কোন কোন সাধুর চরিত্র বর্ণনা করেন। মধ্যে মধ্যে ব্যাখ্যানের কোন কোন ভাব লইয়া সংগীত করেন। তাঁহার পশ্চাতে

থাকেন। পর-উপকার সাধন ইঁহাদের জীবনের একটী ব্রত। এমন দেখা গিয়াছে যে, নিজে ঋণ করিয়াও ইঁহারা অপরের উপকার করেন। ইঁহারা যেমন পর-উপকার করেন, অপর কর্ত্তৃক উপকৃত হইলে, তাঁহার কাছে সেইরূপ বিশেষ রূপে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেন। গৌড় ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদের পূর্ব্ব পুরুষদের গৌরবে আপনাদিগকে গৌরবান্বিত বিবেচনা করেন। তাঁহারা স্বকীয় তেজে তেজীয়ান। কোন ব্যক্তির তোষামোদ করা অতি হেয় জ্ঞান করেন। জাতীয় আচার ব্যবহারের যাহাতে কোন রূপ বৈলক্ষণ্য না হয়, তৎপক্ষে তাঁহারা বিলক্ষণ দৃষ্টি রাখেন। কোন ব্যক্তি বিরুদ্ধ আচরণ করিলে তিনি সমাজ কর্ত্তৃক দণ্ডিত হয়েন। ইঁহারা অল্পেতেই তুষ্ট থাকেন। ইঁহাদের উন্নতি পক্ষে ইহা একটী অন্তরায়। এই নিমিত্তই ইঁহারা অপর স্থানে যাইতে উদ্যোগী হন না। কোন কার্য্যে ব্যাপৃত না থাকিলে, এবং নিজ গ্রামের বাহিরে গিয়া অপর সম্প্রদায়ের আচার ব্যবহার অবগত না হইলে, লোকের মন সংকীর্ণ ভাব ধারণ করে। এই ভাবটী ইঁহাদের মধ্যে লক্ষিত হয়। ইঁহারা পরস্পর পরস্পরের কুৎসা করিয়া থাকেন। চারিশত বৎসর পূর্ব্বে, গৌড় ব্রাহ্মণগণ এক সম্প্রদায় ভুক্ত ছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে দ্বেষভাব প্রবল হওয়াতে, তাঁহারা আর সদ্ভাবে থাকিতে পারিলেন না। ক্রমে তাঁহারা নানা দলে বিভক্ত হইলেন।

গৌরাঙ্গ স্তোত্র।

জয় পুরট-দ্যুতি-হর পীতকলেবর
নদিয়া-নগর-নটবর হে।
জয় উন্নতকন্ধর বাহুবৃহত্তর
ভালবিপুলতর ভাকর হে ॥ ১

একজন তানপুরায় সুর দেয় এবং একজন পাখোয়াজ বাজায়। আজকাল, কোন কোন কথকের সঙ্গে হারমোনিয়ামও থাকে। শ্রোতাদের আমোদের জন্য কথক ঠাকুর কথন কথন হাস্যচ্ছলে গল্পের অবতারণা করেন। দেব মন্দিরে এবং গৃহস্থের বাটীতে কীর্ত্তন হইয়া থাকে।

জয় খণ্ডিতশশধরবদনমনোহর
মোহনগতিরকুঞ্জর হে।
জয় মুণ্ডিতশেখর রক্তাম্বরধর
দণ্ডকলিতকর ভাস্বর হে ॥ ২

জয় করঙ্গ-সুন্দর-বেনু-ধনুঃ-শর-
শোভিতষট্‌কর ভঃহর হে।
জয় পাদসরোবর-পঙ্কজ-সুন্দর
সেব্য-নিরন্তর-সুর-নর হে ॥ ৩

জয় হরিকীর্ত্তন-পর পুলকিত-নিরন্তর
কদম্বকেশর তনুবর হে।
জয় প্রেম-পয়োঝর ঝরিত-মনোহর
নয়নেন্দীবর সুন্দর হে ॥ ৪

জয় পূজিত-শঙ্কর-ব্রহ্ম-পুরন্দর
নামসুধাকর সাগর হে।
জয় নন্দ-গুণাকর-নাম-গণিত-কর
শেষাশ্রম-পর-শেখর হে ॥ ৫

জয় ত্বং বিশ্বম্ভর বিশ্বকলুষহর
লক্ষ্মী-প্রিয়তর সহচর হে।
জয় মনুজ-সুরাসুর মনসগোচর
নিখিল-চরাচর শঙ্কর হে॥ ৬

জয় কৃষ্ণাভ্যন্তর বাহ্যকলেবর,
রাধা-দ্যুতি-ভর ভাস্বর হে।
জয় ভক্ত-হৃদয়-চর ভক্তি-রসাকর
ভক্তি-ভজন-পর তনু-ধর হে ॥ ৭

জয় ত্যক্ত-বিনশ্বর-বিষয়-বিষাকর
ভক্তাকৃতি-ধর ঈশ্বর হে।
জয় কাম-বিজয়-কর, কান্তা-পরিহর,
রক্ষিত-কাতর-কিঙ্কর হে ॥ ৮
জয় দুষ্টোদ্ধৃতি-কর দীন-দয়াপর
ঘোর-তিমির-দর-সংহর হে।
জয় কলি-কলুষাসুর-নিপীড়িতান্তর
শান্তি-সুধাপুর অঘ-হর হে ॥ ৯
জয় ভীম-ভয়ঙ্কর-তরঙ্গ-দুস্তর-
সংসৃতি-সাগর-তরি-বর হে।
জয় বিগ্রহ-মন্দির-ভোগ-গরল-ধর-
দংশন-জর্জ্জর-শীকর হে॥ ১০
জয় তৃষিত-হৃদয়-নর-বাঞ্ছিত-জলধর
প্রেম-সুধাকর-নির্ঝর হে।
জয় প্রেম-বিতর চির-চিহ্নিত-চামর-
তোমর-খর্পর-পদ-বর হে ॥ ১১

কথাটা কি ঠিক ?

এখন বাঙ্গালায় স্বাধীনমতবাদ প্রকাশের যুগ দেখা দিয়াছে। জন ষ্টুয়ার্ট মিলের দোহাই দিয়া এখন সকলেই স্বাধীন মতবাদ প্রকাশ করিবার অধিকার চাহিতেছে। তুমি শুন, আর নাই শুন, কথাটা ঠিক হউক, আর নাই হউক, স্বাধীন ভাবে যে কোন বিষয়ে আমার মতবাদ প্রকাশ করিবার অধিকার আছে, মিলের নজির দেখাইয়া, এখন ইংরাজি শিক্ষিত বা অর্দ্ধ-শিক্ষিত বাবুরা দাবি করিতেছেন। মিলের দোহাই দিলেও বেমিল এবং বেঠিক কথাই অনেক কাণে বাজে। সেই বেসুরা বেতালা কথা গুলায় কাণ ঝালা-

পালা করিলে, আর স্থির থাকিতে পারি না।' বিরক্তি নিজে আসিয়া উত্তেজিত করিয়া তুলে। কাজেই আমার দু কথা বলিতে হয়। আমি বলিলেও তুমি কিছু করিতে পার না, কারণ আমিও মনে করিলে, মিলের দোহাই দিয়া, আমারও স্বাধীন মতবাদ প্রকাশের অধিকার আছে, এমত দাবি করিতে পারি।

এখন অনেক ইংরাজি শিক্ষিত বাবুর মুখে শুনিতে পাই যে, আপনাদিগের দোষেই ব্রাহ্মণেরা এখন অবনতি পাতকূয়ার পচা পাঁকে পড়িয়াছে। কথাটা কি ঠিক? আমি বলি, সম্পূর্ণ বেঠিক—বেমিল—মিথ্যা।

তুমি বলিতেছ, "ব্রাহ্মণেরা আর্য্যজাতির সকল বর্ণকে বলপূর্ব্বক আপনাদিগের অধীনে দাসরূপে রক্ষা করিয়া, সকল বর্ণের উপর আধিপত্য করিত। এখন ব্রাহ্মণেরা নিজের দোষেই তাহার প্রতিফল স্বরূপ সেই প্রভুত্ব হারাইয়াছে। এখন আর ব্রাহ্মণদের কেহ তেমন মান্য করে কি? কখনই না। তবেই বলিতে হয় যে, এখন ব্রাহ্মণদের অধোগতি হইয়াছে।"

আমি বলি বাপু! কথাটা বড়ই ভুল। তোমাদের সংস্কার যে, ব্রাহ্মণেরা বলপূর্ব্বক অন্যান্য জাতির উপর প্রভুত্ব করিতেন! আমি বলি, এ সংস্কারটা মূলেই ভুল। সমস্ত শাস্ত্র, পুরাণ, ইতিহাস খুঁজিয়া দেখ, সমস্ত আপ্তবাক্যের অনুসরণ কর, দেখিতে পাইবে, পাশবিক বল বা অস্ত্রবলের সহিত কোন ব্রাহ্মণেরই কোন সংস্রব ছিলনা। "বলপূর্ব্বক প্রভুত্ব" বলিতে গেলে, সেই পাশবিক বল বা অস্ত্রবলের সহায়তার প্রয়োজন। তুমি সমগ্র সংস্কৃত গ্রন্থ, সমগ্র শাস্ত্রাদি মন্থন করিয়া, এমন একটি নিদর্শন উত্তোলন করিতে পারিবে না, যে, ব্রাহ্মণেরা অমুক স্থানে অস্ত্র প্রয়োগ বা শারীরিক বলপ্রয়োগ করিয়াছিলেন। পরশুরামের কথা বলিতে পার বটে, কিন্তু পরশুরামের প্রতিজ্ঞা এবং জন্মবৃত্তান্তটা পড়িলে, চুপ করিয়া থাকিতে বাধ্য হইবে। যাহা হউক, ব্রাহ্মণেরা যখন পাশবিক বা অস্ত্রবল প্রয়োগ করিতে জানিতেন না এবং করিতেনও না, তখন কিরূপে বলিতে পার যে, ব্রাহ্মণেরা বলপূর্ব্বক আধিপত্য করিতেন? আর একটা কথা—যদিই কেহ বলপূর্ব্বক আধিপত্য করে, সে আধিপত্য কয় দিন থাকে? জগতের ইতিহাস খুলিয়া দেখ, পাশবিক বলের জয় কোথায় চিরস্থায়ী—দীর্ঘস্থায়ী হইয়াছে? বলপূর্ব্বক

আধিপত্য করিতে যাইলেই প্রকৃতি তোমার বিরুদ্ধে দাঁড়াইবে, এবং সময় পাইলেই তোমাকে দু পায়ে মাড়াইবে। ইতিহাসকে জিজ্ঞাসা কর, সে এ কথার সাক্ষ্য দিবে। এক দিন নয়, এক বর্ষ নয়, যুগের পর যুগ, সহস্র বর্ষের পর সহস্র বর্ষ ধরিয়া ব্রাহ্মণেরা যখন আপনাদিগের প্রাধান্য রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন এবং আসিতেছেন, তখন কিরূপে বলিবে যে, ব্রাহ্মণেরা বাহুবল এবং অস্ত্রবলে প্রভুত্ব করিতেন? তাহা কখনই বলিতে পার না।

অবশ্য ব্রাহ্মণেরা অন্যান্য বর্ণের উপর আধিপত্য করিতেন। কিন্তু কিসের গুণে? কেবলমাত্র ধর্ম্ম, বিদ্যা, জ্ঞান, বুদ্ধি, নৈতিক নিৰ্ম্মলতা এবং পবিত্রতার দ্বারা ব্রাহ্মণগণ আধিপত্য করিতেন। ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র বর্ণের বা অন্যান্য (সঙ্কর) বর্ণদিগের সেরূপ ধর্ম্ম, জ্ঞান, বিদ্যা, বুদ্ধি, নৈতিক নিৰ্ম্মলতা এবং পবিত্রতা ছিল কি? কখনই না। থাকিলে, অন্যান্য বর্ণ কখনই ব্রাহ্মণদিগকে শ্রেষ্ঠাসন দিত না। ব্রাহ্মণ বর্ণের যে সকল গুণ ছিল, অন্যান্য বর্ণের তাহা ছিল না; ব্রাহ্মণেরা নিজের চেষ্টায় যেরূপ মনুষ্যত্ব, শেষ দেবত্ব লাভ করেন, অন্যান্য বর্ণ তাহা করিতে পারে নাই। এক দিকে শিক্ষা, আর এক দিকে মূর্খতা, কাজেই প্রকৃতির নিয়মানুসারে শিক্ষারই জয় লাভ হয়। ব্রাহ্মণদিগকে মনুষ্যত্ব এবং দেবত্ব লাভ করিবার সমস্ত গুণ সমন্বিত দেখিয়াই অন্যান্য বর্ণ বিনা বল-প্রয়োগে, "বিনা অনুরোধে, সজ্ঞানে, স্বেচ্ছায় ব্রাহ্মণ বর্ণের চরণে মন প্রাণ দেহ সমর্পণ করিয়া ব্রাহ্মণ বর্ণের জন্য সমাজের জাতির সর্ব্ব শ্রেষ্ঠাসন নির্দ্দেশ করিয়া দেয়।

তোমরা যে বানর বংশ সম্ভূত, ডারউইনের উক্তিমত তাহা তোমরা মানিতে পার, কিন্তু ব্রাহ্মণ বর্ণ যে, সৃষ্টি কর্ত্তার বদন বিবর হইতে শ্রেষ্ঠ বর্ণরূপে সৃষ্ট, ইহা মানিতে চাও না, কারণ দুপাত ইংরাজি পড়িয়া, তোমার ধ্রুবজ্ঞান হইয়াছে যে, ইংরাজ যাহা বলে, তাহা অভ্রান্ত সত্য, আর এ দেশের প্রাচীন গ্রন্থে যাহা লিখিত আছে, তাহা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। তোমার পূর্ব্ব পুরুষগণ বৃক্ষে বৃক্ষে লম্ফে ঝম্ফে ভূকম্পিত করিয়া, কদলী ভক্ষণে কাননে কাননে বিহার করিতেন, তোমাদের এ বিশ্বাস আরও বদ্ধমূল হউক, আমি তাহা ভঙ্গ করিতে চাই না, ব্রাহ্মণ বর্ণ ব্রহ্মার মুখ হইতে উৎপন্ন, বেদের কথা মত তাহাও মানাইতে চাই না, কেবল ইতিহাসের অভ্রান্ত উক্তি ধরিয়াই বলি-

বলিছি যে, ব্রাহ্মণ বর্ণ জগদীশ্বরের দ্বারা বা তুমি যদি নাস্তিক হও, তাহা হইলে, স্বভাবের দ্বারা, অবশ্যই সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ বর্ণ রূপে আদিতে সৃষ্ট হইয়াছিলেন, একথা তুমি অস্বীকার করিতে পার না। অন্যান্য বর্ণ, আপনাদিগকে ধর্ম্ম, শিক্ষা, জ্ঞান, বুদ্ধি, মানসিক উৎকর্ষতা, পবিত্রতা এবং নৈতিক নির্ম্মলতা প্রভৃতি বিষয় ব্রাহ্মণদিগের তুলনায় সম্পূর্ণরূপে হীন দেখিয়াই আপনারা সযত্নে ব্রাহ্মণদিগের জন্য যে শ্রেষ্ঠাসন প্রদান করিয়াছিল, ব্রাহ্মণেরা তদ্বিনিময়ে আপনাদিগের সাংসারিক সমস্ত মানবীয় সুখে জলাঞ্জলি দিয়া, অন্যান্য বর্ণের হিত সাধন, সমাজের মঙ্গল সাধন, স্বধর্ম্মের উন্নতি সাধন এবং স্বদেশের গৌরব বৃদ্ধির জন্য ক্রমাগত মস্তিষ্ক ক্ষয় করিয়া গিয়াছেন। ব্রাহ্মণ বর্ণের নিকট হিন্দু জাতির অন্য সকল বর্ণই অশেষ ঋণে ঋণী—অসীম উপকৃত। উপকৃত বলিয়াই অন্যান্য বর্ণ, সেই ব্রাহ্মণ বর্ণের সবিশেষ আনুগত্য স্বীকার করিতে বাধ্য হয়। উপকৃত না হইলে, অন্যান্য বর্ণ কখনই ব্রাহ্মণ বর্ণকে কেবলমাত্র ধার্ম্মিক, জ্ঞানী, বিদ্বান, সচ্চরিত্র দেখিয়াই শ্রেষ্ঠাসন ছাড়িয়া দিত না। অক্সফোর্ড বিশ্ব বিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এক দল সাহেব-বেশী বাবুকে কোল, ভীল, এবং নাগাদিগের মধ্যে পাঠাইয়া দাও দেখি, তাহারা কি সেই বিদ্বান বাবুদলকে দেখিবামাত্রই মহোচ্চ সম্মান করিবে? কখনই না। তোমার শিক্ষা, জ্ঞান, বুদ্ধি তোমারই আছে, তাহার দ্বারা যদি আমার বা জাতির কোন উপকারই না হইল, তাহা হইলে কেনই বা আমি তোমার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিব? সেই বাবুদল যদি কোল, ভীল নাগাদিগের মঙ্গল সাধন করিতে পারেন, তাহা হইলে, তাহারা সম্মানের পথ ছাড়িয়া দিতে মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব করিবে না। তাই বলি, ব্রাহ্মণেরা বল প্রয়োগ করা দূরে থাক, অন্যান্য বর্ণই ইচ্ছা পূর্ব্বক ব্রাহ্মণ বর্ণকে শ্রেষ্ঠাসন প্রদান করে এবং সেই ব্রাহ্মণ বর্ণ হিন্দু জাতির অসীম মঙ্গল সাধন করেন।

আর একটী কথা—তখন সকল বর্ণই কিছু কোল, ভীল এবং নাগাদিগের মত নিরক্ষর অসভ্য বন্য বর্ব্বর ছিল না। ক্ষত্রিয় বর্ণ শিক্ষা, জ্ঞান ধর্ম্ম বলে বিশেষ বলীয়ান এবং তাহার উপর তাহাদের বাহুবল প্রবল ছিল। বৈশ্য বর্ণের শিক্ষা জ্ঞানও অনুন্নত ছিল না। সিংহ বিক্রমী ক্ষত্রিয় বর্ণ যখন